তিন গোয়েন্দা

ভলিউম ৩৬

রকিব হাসান

কিশোর থ্রিলার

সেবা প্রকাশনী

ভলিউম ৩৬

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-1402 2

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
টিপু কিবরিয়া

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
মোবাইল ০১১-৯০-৪৯০০৩০
জি. পি. ও বক্স ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Website: www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Volume-36
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

সেবা প্রকাশনী

পঁয়তাল্লিশ টাকা

টক্কর	৫–৫৬
দক্ষিণ যাত্রা	৫৭–১৩৮
গ্রেট রবিনিয়োসো	১৩৯–২২৪

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ১/১	(তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা)	৫২/-
তি. গো. ভ. ১/২	(ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো)	৫৭/-
তি. গো. ভ. ২/১	(প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগর সৈকত)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ২/২	(জলদস্যুর দ্বীপ-১,২, সবুজ ভূত)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৩/১	(হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩/২	(কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৪/১	(ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪/২	(ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৫	(ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ৬	(মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৭	(পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ৮	(আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ)	৫০/-
তি. গো. ভ. ৯	(পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল)	৫২/-
তি. গো. ভ. ১০	(বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১)	৫২/-
তি. গো. ভ. ১১	(অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ১২	(প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া)	৫৪/-
তি. গো. ভ. ১৩	(ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ১৪	(পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন)	৫৪/-
তি. গো. ভ. ১৫	(পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ১৬	(প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ)	৫৫/-
তি. গো. ভ. ১৭	(ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ)	৫০/-
তি. গো. ভ. ১৮	(খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ১৯	(বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ২০	(খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ২১	(ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার)	৫০/-
তি. গো. ভ. ২২	(চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত)	৪২/-
তি. গো. ভ. ২৩	(পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ২৪	(অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ২৫	(জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ২৬	(ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ২৭	(ঐতিহাসিক দুর্গ, তুষার বন্দি, রাতের আঁধারে)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২৮	(ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ)	৫৪/-
তি. গো. ভ. ২৯	(আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৩০	(নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মুলা)	৪৯/-

তি. গো. ভ. ৩১	(মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩২	(প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর)	৫৪/-
তি. গো. ভ. ৩৩	(শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ৩৪	(যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩৫	(নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩৬	(টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩৭	(ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৮	(উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ৩৯	(বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪০	(অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৪১	(নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪২	(এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৪৩	(আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৪	(প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৪৫	(বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৬	(আমি রবিন বলছি, উল্কির রহস্য, নেকড়ের গুহা)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪৭	(নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৮	(হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ৪৯	(মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫০	(কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৫১	(পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৫২	(উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৩	(মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৪	(গরমের ছুটি, স্বর্গদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৫৫	(রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৫৬	(হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেট্রনিক আতঙ্ক)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৫৭	(ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৫৮	(মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৫৯	(চোরের আস্তানা, মেডেল রহস্য, নিশির ডাক)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬০	(শুঁটকি বাহিনী, ট্রাইম ট্র্যাভেল, শুঁটকি শত্রু)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬১	(চাঁদের অসুখ, ইউএফও রহস্য, মুকুটের খোঁজে তি. গো.)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬২	(যমজ ভূত, ঝড়ের বনে, মোমপিশাচের জাদুঘর)	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৬৩	(ড্রাকুলার রক্ত, সরাইখানায় ষড়যন্ত্র, হানাবাড়িতে তিন গোয়েন্দা)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৬৪	(মায়াপথ, হীরার কার্তুজ, ড্রাকুলা-দুর্গে তিন গোয়েন্দা)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৬৫	(বিড়ালের অপরাধ+রহস্যভেদী তিন গোয়েন্দা+ফেরাউনের কবরে)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৬	(পাথরে বন্দী+গোয়েন্দা রোবট+কালো পিশাচ)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৭	(ভূতের গাড়ি+হারানো কুকুর+গিরিগুহার আতঙ্ক)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৮	(টেরির দানো+বাবলি বাহিনী+শুঁটকি গোয়েন্দা)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৯	(পাগলের গুপ্তধন+দুখী মানুষ+মমির আর্তনাদ)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৭০	(পার্কে বিপদ+বিপদের গন্ধ+ছবির জাদু)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৭১	(পিশাচবাহিনী+রত্নের সন্ধানে+পিশাচের থাবা)	৩৯/-

টক্কর

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

এপ্রিলের এক সন্ধ্যায় উধাও হয়ে গেল টিটু।

বন্ধুদের নিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল কিশোর। কুকুরটাকে রান্নাঘরে রেখে গিয়েছিল মিসেস বারজির দায়িত্বে। মহিলা ওদের হাউজ কীপার। ওরা যখন গ্রীনহিলসে থাকে না তখনও বাড়ির দেখাশোনা করে। মাঝে মাঝে নিজের বোনের মেয়ে ডলিকে এনে রাখে। যাই হোক, টিটুকে রেখে যাওয়ার সময় ওরা দুজনেই ছিল।

সিনেমা থেকে ফিরে এসে একটা গল্পের বই নিয়ে বসল কিশোর। বইটা শেষ করার আগে খেয়াল করল না, ওর বাড়িতে ঢোকার সাড়া পেয়েই ঘেউ ঘেউ করে ছুটে আসেনি টিটু।

দরজার কাছে গিয়ে চিৎকার করে ডাকল কিশোর, 'টিটু? কোথায় তুই?'

সাড়ে দশটা বাজে। মিসেস বারজি আর তার বোনঝি দুজনেই শুয়ে পড়েছে। মেরিচাচীকে নিয়ে পার্টিতে গেছেন রাশেদ চাচা। নীরব হয়ে আছে বাড়িটা।

'টিটু? শুনছিস না?' আবার ডাকল কিশোর।

ওপরতলার একটা ঘর থেকে জবাব দিল ডলি, 'কে, কিশোর? টিটু নেই ওখানে? সাড়ে নটায়ই তো রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমরা তো ভাবলাম তোমার সাড়া পেয়েই গেছে। দেখনি?'

'না তো! এইমাত্র খেয়াল করলাম ওর কোন সাড়াশব্দ নেই। গেল কোথায়?' দরজায় দাঁড়িয়ে টিটু টিটু বলে চিৎকার করতেই থাকল কিশোর।

কিন্তু টিটু এল না। অবাক হলো সে। কোথায় গেল কুকুরটা?

রাত বারোটায় ফিরে এলেন চাচা-চাচী। টিটু ফিরল না।

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল কিশোর।

'অ্যাই, এত রাত,' মেরিচাচী বললেন, 'এখনও ঘুমাতে যাচ্ছিস না কেন?'

'চাচী, টিটুকে দেখেছ?'

'আমি তো এই এলাম···'

'দেখনি! কোথায় গেল?'

'গেছে হয়তো কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। তোর কুকুর তোর মতই বাউণ্ডুলে। দিন নেই রাত নেই, যখন খুশি বেরিয়ে যাওয়া। যাবে আর কোথায়? শুয়ে থাকগে। চলে আসবে।'

চাচীর কথামত গিয়ে শুয়ে পড়া ছাড়া আর কিছু করার নেই এখন। কাপড় বদলে গিয়ে শুয়ে পড়ল কিশোর।

কিন্তু সকালে দরজায় টিটুর ঘুম ভাঙানি ডাক শুনল না। নাস্তার সময়ও ফিরে এল না সে। ওর যে কিছু হয়েছে তাতে আর সন্দেহ রইল না কিশোরের। ওকে খুঁজতে বেরোনো দরকার।

বাগানে বেরিয়েই একটা সূত্র পেয়ে গেল সে। একটা তারে বাঁধা এক টুকরো মাংস।

'ও, এই ব্যাপার!' ভাবল সে। 'মাংসের লোভ দেখিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে টিটুকে।'

কে করল কাজটা?

রাগ করে তার সহ মাংসের টুকরোটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে।

ঘরে ঢুকতেই শুনতে পেল টেলিফোন বাজছে। চাচা রয়েছেন হলঘরে। তিনিই ধরলেন।

'হালো?...হ্যাঁ, রাশেদ পাশা বলছি। আপনি কে?...ও, কনস্টেবল ফগর‍্যাম্পারকট। তো, কি খবর?...পরিষ্কার করে বলুন। বুঝতে পারছি না।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ ওপাশের কথা শুনলেন রাশেদ পাশা। চাচা কি বলে শোনার জন্যে কান খাড়া করে রেখেছে কিশোর।

'বলেন কি! আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না। না না, যা-ই বলুন, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

রিসিভার রেখে কিশোরের দিকে তাকালেন রাশেদ পাশা। 'ফগ বলছে কাল রাতে নাকি মাঠে ভেড়াকে কামড়াতে গিয়েছিল টিটু। হাতেনাতে ধরা পড়েছে।'

'একেবারে মিথ্যে কথা। নিশ্চয় অন্য কোন কুকুর...'

ও বলছে, টিটু। ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে ওর বাড়ির ছাউনিতে। কুকুরের জন্যে এটা বিরাট অপরাধ। গুলি করে মারা হবে ওকে। কাল রাতে কোথায় ছিল, দেখিসনি?'

'কেউ একজন এসে আমাদের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গেছে টিটুকে। এইমাত্র প্রমাণ দেখে এলাম,' গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'ভেড়া তাড়া করার সময় ধরেছে একথা যে বলেছে, সে মিথ্যে কথা বলেছে। ফগও মিথ্যে বলছে।'

'টবি ডাউন নামে একটা ছেলে নাকি ধরেছে,' রাশেদ পাশা বললেন। 'রাতে মাঠের ধারে হাওয়া খেতে গিয়ে দেখে একটা কুকুর ভেড়া তাড়া করে বেড়াচ্ছে। অনেক চেষ্টা করে দড়ির ফাঁস দিয়ে কুকুরটাকে আটকে ফেলে সে। ফগের কাছে নিয়ে যায়। ফগ তার ছাউনিতে তালা দিয়ে রেখেছে। ও বলল আমাদের সঙ্গে কথা বলতে আসবে। কি করবি এখন?'

'ও একটা মিথ্যুক! এমন শিক্ষা দেব আমি এবার ফগকে...কখন আসবে?'

'আধ ঘন্টার মধ্যে। ওর সঙ্গে কথা বলা তো দূরের কথা, দেখা করতেই ইচ্ছে করছে না আমার।'

সরে এল কিশোর। ও নিশ্চিত, কোন ভেড়াকে কামড়াতে যায়নি টিটু। আর ওই শয়তান টবিটা যে-ই হোক, মিথ্যা কথা বলেছে। ফগ সেটা জানে।

জেনেশুনেই টিটুকে গুলি করে মারার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে।

দৌড়ে বাগানের ছাউনিতে ফিরে এল কিশোর। লাল একটা পরচুলা পরল। আসল দাঁতের ওপর লাগাল কয়েকটা নকল প্লাস্টিকের দাঁত। পুরানো শার্ট-প্যান্ট পরে তার ওপর বাঁধল কসাই-বালকের একটা নীল সাদা অ্যাপ্রন। তারপর সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

ফগের বাড়ির সামনে এসে উল্টোদিকের চত্বরে দাঁড়িয়ে শিস দিতে দিতে আপনমনে একটা কমিক পড়ার ভান করতে লাগল। কিন্তু সারাক্ষণ একটা চোখ রাখল দরজার দিকে, ফগ কখন বেরিয়ে আসে দেখার জন্যে।

অবশেষে বেরোল সে। খুব খুশি। গুনগুন করে গান গাইছে। সাইকেল চালিয়ে চলে গেল।

সেদিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করল ছদ্মবেশী কিশোর। কমিকটা ভাঁজ করে পকেটে ভরে সাইকেল ঠেলে নিয়ে এগোল। কোণের মোড়ে ওটা স্ট্যান্ডে তুলে রেখে ঘুরে এসে ঢুকে পড়ল ফগের বাড়ির পেছনের আঙিনায়।

বাগানের ছাউনিটার দিকে তাকাল। ওর সাড়া পেয়েই বোধহয় ভেতর থেকে চেঁচামেচি শুরু করল কুকুরটা। নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর। টিটুই।

পেছনের দরজায় গিয়ে টোকা দিল কিশোর। খুলে দিল এক মহিলা। ক্যাথেলিন ডাউন। চেনে ওকে সে। ওদের বাড়িতে কিছুদিন রান্নার কাজ করেছে। ও, তাহলে এই ব্যাপার। টবি ডাউন নামটা চেনা চেনা লাগছিল এই জন্যেই। ক্যাথেলিনের ছেলে টবি। কিশোরকে দেখতে পারে না, আবার ভয়ও পায়। ক্যাথেলিন অবশ্য কিশোরকে খুব পছন্দ করে।

কিশোরকে চিনতে পারল না ক্যাথেলিন। ভুরু কুঁচকে তাকাল। 'মাংস লাগবে না।'

'মাংস দিতে আসিনি, মিসেস ডাউন। আপনাদের বাড়ি হয়ে আসছি। তাড়াতাড়ি আপনাকে বাড়ি যেতে বলেছে।'

'তাই নাকি? সর্বনাশ! নিশ্চয় মা'র অসুখটা বেড়ে গেছে।...টবি! আমি বাড়ি যাচ্ছি। বাড়ি খালি রেখে কোথাও বেরোবি না। মিস্টার ফগ...থুড়ি, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট এসে খালি দেখলে রাগ করবেন।'

'একা আপনি গিয়ে কদিক সামাল দেবেন? বার্টও যাক না,' দুজনকেই বাড়ি থেকে তাড়ানোর ইচ্ছে কিশোরের।

'না না, আমি থাকি,' তাড়াতাড়ি বাধা দিল টবি। তার মায়ের বানিয়ে রাখা তাজা ফলের সালাদ আর আভন থেকে নামানো গরম গরম বান চুরি করে খাওয়ার এই মোক্ষম সুযোগটা ছাড়তে রাজি নয় সে।

বোঝা গেল কোনমতেই যাবে না টবি। চাপাচাপি করলে সন্দেহ বাড়বে। চুপ হয়ে গেল কিশোর।

তাড়াহুড়ো করে অ্যাপ্রন খুলে রেখে বেরিয়ে গেল মিসেস ক্যারোলিন। সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে মাকে চলে যেতে দেখছে টবি। চট করে রান্নাঘরে ঢুকে একটা আলমারিতে লুকিয়ে পড়ল কিশোর।

ফিরে এল টবি। হলঘরের দরজাটা বন্ধ করল। আপনমনে শিস দিচ্ছে।

পেছন থেকে দৈববাণীর মত ঘোষিত হলো, 'চুরি করা মহাপাপ!'

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল টবি। কাউকে দেখল না। হাতে সালাদের বাটি নিয়ে কাঁপতে শুরু করল সে।

'কাল রাতে কুকুরটাকে কে চুরি করেছে?' প্রশ্নটা রান্নাঘরের দরজার পেছন থেকে এল বলে মনে হলো টবির।

হাত থেকে বাটিটা পড়ে গেল। ককিয়ে উঠল সে, 'আমি চুরি করেছি! আমি! কে কথা বলছ?'

ভয়ঙ্কর এক গর্জন ভেসে এল ঘরের কোণ থেকে। চিৎকার করে উঠল টবি। জন্তুটাকে দেখার জন্যে চতুর্দিকে তাকাতে লাগল। কোথাও দেখতে পেল না। তারপরই শুরু হলো জোরাল কণ্ঠে বেড়ালের ডাক: মিআউ! মিআউ!

কোন বেড়ালকেও দেখা গেল না।

চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল টবি। দুগাল বেয়ে পানি পড়ছে। মাকে ডাকতে লাগল জোরে জোরে।

কিন্তু মা তখন অনেক দূরে। আবার জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'মিথ্যে কথা কে বলেছে? কুকুরটাকে কে চুরি করেছে?'

'আমি বলেছি! আমি! আমি!' হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে জবাব দিল টবি। 'আমি একটা খারাপ ছেলে!'

'ভাগো এখান থেকে!' ভয়ঙ্কর স্বরে ধমক শোনা গেল।

একটা মুহূর্তও দাঁড়াল না টবি। পড়িমড়ি করে দৌড়ে চলে গেল পাশের ঘরে। হল পার হয়ে সামনের দরজা, দরজা দিয়ে বেরিয়ে রাস্তা। কোনও দিকে না তাকিয়ে দে ছুট, দে ছুট।

খুব শিক্ষা হয়েছে। হাসতে হাসতে আলমারি থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। বাগানের ছাউনির দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। তালা দেয়া। সেটা খোলা কোন ব্যাপারই না তার কাছে। তৈরি হয়েই এসেছে। পকেট থেকে একগোছা চাবি বের করল। একটা চাবি লেগে গেল তালায়।

ছাড়া পেয়ে উড়ে এসে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল টিটু। ওকে আদর করতে করতে কিশোরের চোখ পড়ল ফগের মস্ত কালো বেড়ালটার ওপর। দেয়ালে লম্বা হয়ে শুয়ে ঝিমুচ্ছিল। কুকুরের ডাক শুনে আধবোজা চোখে তাকাচ্ছে ওর দিকে। সতর্ক হচ্ছে না। জানে এত ওপরে উঠে ওকে ধরতে পারবে না কুকুরটা।

দুষ্টবুদ্ধি খেলে গেল কিশোরের মনে। বেড়ালটাকে তুলে এনে রেখে দিল ছাউনিতে। কামড়ানোর জন্যে পাগল হয়ে উঠল টিটু। ধমক দিয়ে ওকে সরিয়ে দিল কিশোর।

দরজায় তালা দিয়ে টিটুকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল সে। ওকে সাইকেলের বাস্কেটে তুলে নিয়ে গান গাইতে গাইতে বাড়ি রওনা হলো। মনে মনে বলল, 'মিস্টার ঝামেলা, টিটুকে জড়িয়ে আমাকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলে তুমি। এবার বঝবে মজা। তোমার নাকের জলে চোখের জলে এক না করেছি

তো আমার নাম কিশোর পাশা নয়।'

বাড়ি ফিরে দেখল গেটের ভেতরে ফগের সাইকেলটা। ঘরে না ঢুকে পা টিপে টিপে চলে গেল বাগানের ছাউনিতে। ছদ্মবেশ খুলে রাখল। টিটুকে ওখানে চুপচাপ বসে থাকতে বলে বাইরে থেকে দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল আবার।

দুই

অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে ফগ। ওঠার নামও করছে না। রাশেদ পাশার সঙ্গে কথা বলে খুব মজা পাচ্ছে সে। ভাল করেই জানে, কিশোরের চাচা-চাচী পছন্দ করে না তাকে। কথা বলতে চায় না। কিন্তু আজকে না বলে আর উপায় নেই। বের করে দিতে পারছে না কোনমতে। কারণ টিটু জড়িত।

হাসিমুখে ঘরে ঢুকল কিশোর। ফগের দিকে তাকিয়ে বলল, 'গুডমর্নিং, মিস্টার ফগ।'

'ঝামেলা! ফগর‍্যাম্পারকট,' শুধরে দিল ফগ। হাসি মুছল না তারও। অন্য দিন কিশোর এরকম ইচ্ছে করে নাম ভুল করলে কটমট করে তাকাত।

'সরি, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট। এপ্রিলের এই সকালটা খুব সুন্দর, তাই না? তা আছেন কেমন? নতুন কোন রহস্যের খোঁজ পেলেন বুঝি?'

'তোমার কুত্তাটার ব্যাপারে কথা বলতে এলাম,' ফগের মুখে বিগলিত হাসি। 'ভেড়া তাড়া করেছিল আবার।'

'কি যা-তা বলছেন। টিটু কখনও ভেড়াকে কামড়াতে যায় না।'

'কিন্তু আমার কাছে প্রমাণ আছে,' সামান্য লাল হলো ফগের গাল। 'কুত্তাটা হাতেনাতে ধরা পড়েছে। ছাউনিতে তালা দিয়ে রেখে এসেছি আমি।'

'বিশ্বাস করলাম না আপনার কথা। আগে কুকুরটাকে দেখতে চাই। যদি টিটু হয় তাহলে তো কথাই নেই। যা ইচ্ছে করবেন। অপরাধীর শাস্তি হওয়াই উচিত। তবে আমি শিওর, অন্য কোন জানোয়ারকে আটক করেছেন আপনি।'

অবাক হয়ে কিশোরের দিকে তাকালেন রাশেদ পাশা। অত জোর গলায় বলছে কি করে?

আরও লাল হয়ে গেল ফগ। রাশেদ পাশার দিকে তাকাল, 'আপনি যদি আমার সঙ্গে একবার আসেন, স্যার, এখুনি প্রমাণ করে দিতে পারি আমি। বিশ্বাস না হলে কিশোরও আমাদের সঙ্গে আসতে পারে।'

'চলুন, যাব। চাচা, আসবে?'

'হ্যাঁ। দাঁড়া, গাড়ি বের করি। মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট, আপনি সাইকেল নিয়ে এগোন। আমি আর কিশোর গাড়িতে আসছি।'

বেরিয়ে গেলেন রাশেদ পাশা।

ফগও উঠে দাঁড়াল। মেরিচাচীর দিকে চেয়ে বলল, 'গুড বাই, মিসেস পাশা।'

সৌজন্যের খাতিরে একটা দায়সারা জবাব দিয়ে রান্নাঘরে চলে গেলেন মেরিচাচী।

কিশোর এগিয়ে গেল টেলিফোনের দিকে।

মুসার আম্মা ধরলেন। তাকে বলল কিশোর, 'কে, আন্টি? আমি কিশোর। মুসা কোথায়?'

'ধরো, দিচ্ছি।'

'কে? মুসা? যা বলি শোনো। বুঝিয়ে বলার সময় নেই এখন। একটা কাজ করতে হবে তোমাকে।'

'কোন রহস্য পেয়েছ নাকি?' উত্তেজিত হয়ে উঠল মুসা।

'না। এক কাজ করো,' দরজার দিকে তাকাল কিশোর। বেরিয়ে গেছে ফগ। 'এক্ষুণি আমাদের বাড়ি চলে এসো। আমাকে পাবে না। ছাউনি থেকে টিটুকে বের করে নিয়ে সোজা চলে যাবে ফগের বাড়িতে। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি না বললে ঢুকবে না। ফারিহা আর রবিন যেতে চাইলে সঙ্গে নিতে পারো। তবে যা করার তাড়াতাড়ি করবে।'

'কিন্তু কিশোর...'

রিসিভার রেখে দিল কিশোর। মুসার বিস্মিত চেহারাটা কল্পনা করে মনে মনে হাসল। দরজার দিকে এগোল।

গাড়ি বের করে ফেলেছেন রাশেদ পাশা। চড়ে বসল কিশোর।

গেট দিয়ে রাস্তায় বেরিয়েই আড়চোখে কিশোরের দিকে তাকালেন রাশেদ পাশা। 'কি করেছিস, কিশোর, বল তো? এত খুশি খুশি লাগছে কেন তোকে? টিটু কোথায়?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে জবাব দিল কিশোর, 'ফগ একটা নোংরা চাল চালতে চেয়েছিল, চাচা। ভণ্ডুল করে দিয়েছি আমি।'

আর প্রশ্ন করলেন না রাশেদ পাশা। ভাতিজাকে চেনেন। নিজে থেকে না বললে আর একটা কথাও বের করতে পারবেন না ওর মুখ থেকে।

ওদিকে আগে আগে মহানন্দে সাইকেল চালাচ্ছে ফগ। খানিক পর কি ঘটবে ভেবে ফুর্তিতে আছে সে। ভাবছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে আজকের সকালটা।

কিন্তু বাড়ি পৌঁছে ঘরে কাউকে না দেখে খুবই অবাক হলো সে। টবিও নেই। তার মা-ও নেই। ঘর খালি রেখে গেল কোথায়?

গাড়ি থেকে নেমে সামনের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন রাশেদ পাশা আর কিশোর। এই সময় ছুটতে ছুটতে এল টবি আর তার মা। পেছনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। টবির মুখে আতঙ্কের ছাপ এখনও কাটেনি। তার মায়ের মুখে রাগের চিহ্ন।

ফগকে দেখে ক্যারোলিন বলল, 'সরি, মিস্টার ফগ...'

'ফগর‍্যাম্পারকট!' ধমকে উঠল ফগ।

'সরি, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট, ওই কসাইয়ের ছেলেটা এসে কোত্থেকে কি এক খবর দিল, আমি ভাবলাম মা'র অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছে। দৌড়ে চলে গেলাম দেখতে। টবিকে রেখে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি যাওয়ার কিছুক্ষণ পর সে-ও গিয়ে হাজির। আপনার বাড়িতে নাকি ভূতের উপদ্রব হয়েছে···দাঁড়ান, কসাইদের ওই ছেলেটাকে একবার পেয়ে নিই। ওর শয়তানি আমি বের করে ছাড়ব! আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মারা!'

নাকমুখ কুঁচকে আবার ফোঁপাতে শুরু করল টবি। কঠোর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল ফগ। দেখেই কুঁকড়ে গেল টবি। ফোঁপানো বন্ধ করে দিল।

রাশেদ পাশার দিকে ফিরল ফগ। 'মিস্টার পাশা, এই ছেলেটাই কাল রাতে কুকুরটাকে ভেড়া তাড়া করতে দেখেছিল।'

'না না, আমি দেখিনি!' গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল টবি। 'আমি কিছুই দেখিনি!'

'কি বলছিস, টবি?' অবাক হয়ে গেল ওর মা। 'আজ সকালে তো আমিও শুনলাম মিস্টার ফগকে···সরি, ফগর‍্যাম্পারকটকে বলছিস কাল রাতে ভেড়া তাড়া করেছিল কুকুরটা।'

'না না, আমি বলিনি! বলিনি!'

'ও এখন ভয় পাচ্ছে,' টবির আচরণে ফগও অবাক। 'কুকুরটাকে কাল তুমিই ধরেছিলে, টবি, এটা তো ঠিক? ঝামেলা!'

'না না, আমি না···আমি কিছু করিনি!'

ভীষণ বিরক্ত হয়ে হাত নেড়ে ওকে থামিয়ে দিল ফগ। রাশেদ পাশাকে বলল, 'ভূতের ভয়ে উল্টোপাল্টা বকছে ও। বকুক। কুকুরটা ছাউনিতে আছে। আপনাদের টিটু। দেখলেই চিনতে পারবেন। টবি ধরে এনে ওখানে ভরে রেখেছে।'

'না, আমি কিছু করিনি!' চিৎকার করে আবার সেই একই কথা বলতে লাগল টবি।

ঘুসি মেরে ওর কানটা ফাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করল ফগের। কোনমতে মুখের হাসি বজায় রেখে গটমট করে গিয়ে নামল বাগানে। তালা খুলে টান মেরে দরজাটা হাঁ করে খুলে দিল। আশা করল কিশোরকে দেখে ছুটে বেরিয়ে আসবে টিটু।

কিন্তু কুকুর বেরোল না। অলস ভঙ্গিতে ধীরেসুস্থে বেরিয়ে এল তার হোঁৎকা কালো বিড়ালটা।

দেখে তো ফগের চক্ষু চড়কগাছ।

হা-হা করে হেসে উঠল কিশোর।

ভয়ে চিৎকার শুরু করল টবি। ফগের কাছে এখন যতই অস্বীকার করুক ও কিছু করেনি, কিন্তু ও নিজেই টিটুকে ওই ছাউনিতে ভরে রেখেছিল। এখন কুকুরের বদলে বিড়াল বেরোতে দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। 'আমি কিছু করিনি! আমি কিছু করিনি!' বলে কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে মায়ের অ্যাপ্রনের নিচে মুখ লুকাল।

বোয়াল মাছের মত হাঁ হয়ে গেল ফগের মুখ। ধীরে ধীরে বন্ধ হলো। সামনে বসে ধীরে সুস্থে চেটে চেটে নিজেকে পরিষ্কার করতে লাগল বিড়ালটা।

'আমাদের বিড়াল হারায়নি, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট,' রাশেদ পাশা বললেন। 'দেখুন কুকুরটা আছে কিনা ভেতরে। না থাকলে এখানে শুধু শুধু সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। সত্যি কি কুকুর রেখেছিলেন?'

টিটুকে ফগ নিজে দেখেনি। টবি এসে বলেছিল, কুকুরটাকে ধরে এনেছে। ছাউনিতে আটকে রাখার হুকুম দিয়েছিল ফগ। বুঝতে পারছে না কুকুরের বদলে বিড়ালই ভরে রেখেছিল কিনা। সামনে কেউ এখন না থাকলে বেতিয়ে ওর পিঠের ছাল তুলে দিত।

ফগের চোখে চোখ পড়তেই আবার ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল টবি। পকেট থেকে পাঁচ ডলারের একটা নোট বের করে ফগের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নিন, আপনার টাকা। আমি চাইনে। আমি খারাপ ছেলে। আপনার কথায় খারাপ কাজ করেছি। মিথ্যে বলা মহাপাপ। জীবনে আর কোনদিন আপনার কথায় কোন কুকুর ধরতে যাব না।'

'হুঁ, বুঝলাম,' শীতল কণ্ঠে বললেন রাশেদ পাশা। 'মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট, আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করা উচিত। কিশোর, চল যাই।'

'কিন্তু···আমি···আমি বুঝতে পারছি না,' গোল গোল চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসবে যেন ফগের। 'সকাল বেলাও তো ছাউনির মধ্যে কুকুরের ডাক শুনলাম···ওই যে, ডাকছে! এই ডাকই শুনেছি!'

সত্যি ডাকছে। রাস্তায় টিটুকে নিয়ে পায়চারি করছে মুসা। রাশেদ পাশার গাড়িটাকে চিনতে পেরে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করছে টিটু।

ভেতরে কি হচ্ছে জানার জন্যে উত্তেজনায় ফাটছে মুসা, রবিন আর ফারিহা।

দরজার দিকে এগিয়ে গেল সকলে। টিটুকে দেখে বেহুঁশ হয়ে যাবার অবস্থা হলো ফগের। আর ফগকে দেখে কামড়ানোর জন্যে পাগল হয়ে উঠল টিটু। ওর হাতের চেন ছুটিয়ে ফেলার জন্যে টানাটানি শুরু করল।

'ও, মুসা, তুমি,' অতি সাধারণ গলায় বলল কিশোর, 'বেড়াতে বেরিয়েছ বুঝি? ধরে রেখেছ কেন? ছেড়ে দাও না।'

'না, না, ছেড়ো না!' তাড়াতাড়ি বাধা দিল ফগ। 'আমি আগে ঘরে ঢুকে যাই, তারপর ছাড়ো।'

তীরবেগে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল সে।

চাচার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর।

'কুকুরের জায়গায় বিড়াল ঢুকল কি করে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে,' গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে বললেন রাশেদ পাশা। তাঁর সঙ্গে গাড়িতে উঠল ছেলেমেয়েরা সবাই। টিটুও উঠল। যাকে কেন্দ্র করে এত ঘটনা।

'বাড়ি গিয়ে বলব,' কিশোর বলল। 'বেচারা টবির জন্যে খুব দুঃখ হচ্ছে।

ফগ ওকে একা পেলে কি যে করবে!'

আসলেই বড় দুঃসময় চলছে টবির। ক্যারোলিন কাঁদছে। টবি চেঁচাচ্ছে। আর ফগের ইচ্ছে করছে চিৎকার করে গলা ফাটাতে। উফ্, কি অপমান! নিজেকে একটা রামছাগল···না না, একটা গাধা মনে হচ্ছে। রাশেদ পাশাকে নিয়ে এসেছিল কুকুর দেখাতে, আর বেরোল কিনা বিড়াল। তারই বিড়াল! আহ্, ঝামেলা!

অদ্ভুত এক গল্প শোনাচ্ছে টবি। ওর মা চলে যাওয়ার পর ঘরের নানা কোণ থেকে নানা রকম জন্তু-জানোয়ারের ডাক আর গর্জন শোনা যাচ্ছিল।

ডাক? গর্জন? ঘরের মধ্যে? এদিক ওদিক তাকাতে লাগল ফগ। ভেন্ট্রিলোকুইজমে কিশোরের দক্ষতার কথা মনে পড়ে গেল। তারমানে সে এসে ঢুকে বসেছিল ঘরের মধ্যে? অসম্ভব!

কিন্তু যতই ভাবছে ততই ব্যাপারটা সম্ভব মনে হচ্ছে ওর কাছে। ওই বিচ্ছু কিশোরটা পারে না হেন কাজ নেই। এমন ভঙ্গিতে চোখ গরম করে টবির দিকে তাকাল, টবির মনে হলো মাটির নিচে ঢুকে যায়। নাহ্, এখানে থাকা আর ঠিক হবে না মোটেও। বাড়ি চলে যাওয়াই ভাল। মা চটে গেছে। ফগ চাইছে পিটিয়ে ওকে ভর্তা বানাতে। এত অশান্তির মধ্যে বেঁচে থাকাটাই অর্থহীন লাগছে ওর কাছে। ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে বাড়ির দিকে ছুটল সে।

তিন

রাস্তায় একটা আইসক্রীমের দোকান দেখে নামিয়ে দিতে বলল কিশোর। সবাইকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন রাশেদ পাশা।

দোকানে ঢুকে আইসক্রীম খেতে খেতে সব ঘটনা খুলে বলল কিশোর। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল সবাই। খায় আর কখন। কিছু না বুঝে টিটুও খোক-খোক করতে লাগল।

আইসক্রীমের বিল কিশোরই দিল। দোকান থেকে বেরিয়ে এল ওরা। কথা বলতে বলতে চলেছে। এখনও ফগের হেনস্তার ব্যাপারটা নিয়ে হাসাহাসি করছে ওরা।

একটা গলির ভেতর দিয়ে চলেছে—গলিটার নাম ফিয়ার লেন, এই সময় কানে এল কে যেন পুলিশ পুলিশ বলে চিৎকার করছে।

দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। 'কে?'

আবার শোনা গেল চিৎকার, 'পুলিশ! পুলিশ! পুলিশকে খবর দাও!'

'চলো তো দেখি!'

বাড়িটার দিকে দৌড় দিল ওরা।

দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। ঠেলা দিয়ে দেখল বন্ধ। পাশের জানালাটার দিকে এগোল সে তখন। পেছন পেছন চলল বাকি সবাই।

জানালায় ভারী কাপড়ের সবুজ পর্দা লাগানো, যাতে ঘরের মধ্যে বেশি আলো ঢুকতে না পারে। সামান্য ফাঁক হয়ে আছে পর্দা। সেখান দিয়ে দেখা গেল ছোট আর্মচেয়ারে বসে আছে একজন বুড়ো মানুষ। চেয়ারের হাতলে থাবা মারতে মারতে চিৎকার করছে পুলিশ পুলিশ বলে।

ফিসফিস করে বলল ফারিহা, 'ও পুলিশ ডাকছে কেন?'

ড্রেসিং গাউন আর পাজামা পরেছে বুড়ো। টাক মাথায় নাইট ক্যাপ, একপাশে কাত হয়ে আছে। পাতলা দাড়ি। একটা স্কার্ফ আলগাভাবে জড়ানো রয়েছে গলায়।

স্টোভের কাছে রাখা একটা হুইল চেয়ার। তাতে রাখা কম্বলের অর্ধেকটা পড়ে আছে মাটিতে। বুড়োর হাতের কাছেই তাকে রাখা ছোট একটা রেডিও। জোরে জোরে গান বাজছে।

'চুরি-টুরি গেল নাকি কিছু?' আনমনে বলল কিশোর। 'দরজাটা খোলা দরকার।'

আবার দরজার কাছে ফিরে এল ওরা। হাতল ধরে মোচড় দিল কিশোর। ঘুরে গেল ওটা। তালা নেই। খোলাই ছিল।

ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা। টিটু সহ। বুড়ো ওদের দিকে তাকালও না। থেকে থেকে চেয়ারের হাতলে চাপড় মারছে আর চিৎকার করে উঠছে পুলিশ পুলিশ বলে।

আস্তে করে ওর বাহুতে হাত রাখতে গেল কিশোর। লাফিয়ে উঠল বুড়ো। চিৎকার থামিয়ে চোখ মিটমিট করতে লাগল। ঘোলাটে চোখ। পানি ভর্তি। কিশোরের হাতে হাত বুলিয়ে দেখল।

'কে? পুলিশ? কে তুমি?'

'রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। আপনাকে চিৎকার করতে শুনে ঢুকে দেখতে এলাম।' জোরে জোরে বলল কিশোর। 'কি হয়েছে? আমরা কি আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারি?'

বোঝা গেল বুড়ো চোখে খুব সামান্যই দেখে। সবার দিকে মুখ ঘোরাল। ড্রেসিং গাউনের ঝুলটা ওপরে টেনে তুলল। কাঁপছে রীতিমত।

'শীত লাগছে নাকি আপনার?' বুড়োর একটা হাত ধরে টানল কিশোর। 'চলুন, আপনাকে আগুনের কাছে বসিয়ে দিই। রবিন, রেডিওটা বন্ধ করো তো। অতিরিক্ত আওয়াজ।'

বাধা দিল না বুড়ো। স্টোভের কাছে নিয়ে গিয়ে আগের চেয়ারেই পিঠের নিচে গদি ঠেসেঠুসে দিয়ে আরাম করে বসানো হলো আবার। কম্বলটা টেনে দেয়া হলো পায়ের ওপর। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল বুড়ো। ঘোলাটে চোখে আবার ওদের দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, 'কে তোমরা? পুলিশ?'

'না,' জবাব দিল রবিন। 'কি হয়েছে আপনার?'

'আমার টাকা চুরি হয়ে গেছে!' ককিয়ে উঠল বুড়ো। 'সব নিয়ে গেছে!

একটা টাকাও রেখে যায়নি!'

'কি করে বুঝলেন নিয়ে গেছে?' জানতে চাইল কিশোর। 'ব্যাংকে কিংবা পোস্ট অফিসে রাখেননি কেন?'

'ব্যাংককে বিশ্বাস করি না আমি। নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিলাম। এখন সব গেল! হায় হায়রে!'

'কোথায় রেখেছিলেন?'

'কি? কি বলছ? জোরে বলো না!'

'আমি জিজ্ঞেস করলাম,' বুড়ো কানেও কম শোনে বুঝে জোরে চিৎকার করে বলল কিশোর, 'টাকাগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে নাড়তে বুড়ো বলল, 'ওটা আমার গোপন কথা, তোমাদের বলব না। এমন জায়গায় রেখেছিলাম যাতে কেউ খুঁজে না পায়। কিন্তু তা-ও নিয়ে গেল!'

'কোথায় রেখেছিলেন বলতে অসুবিধে কি?' মুসা বলল, 'তাহলে আমরা একবার খুঁজে দেখতে পারতাম।'

জোরে জোরে মাথা নাড়তে শুরু করল বুড়ো। 'না না, খোঁজার দরকার নেই। পুলিশকে ডেকে আনো। পুলিশ দরকার আমার। পাঁচ হাজার ডলার। সারা জীবনের সঞ্চয়। সব গেল। পুলিশ আসুক। তারাই খুঁজে বের করে দেবে। পুলিশকে ডাকো।'

পুলিশ মানেই ফগর্‍্যাম্পারকট। তাকে ডাকার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই কিশোরের। ও এসে শুধু 'ঝামেলা' করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারবে না।

'টাকাটা কখন খোয়া গেল?'

'তা বলতে পারব না। দশ মিনিট আগে হাত দিয়ে দেখতে গিয়ে দেখি নেই। আমি একজন বুড়ো মানুষ। সারা জীবনের সঞ্চয় গেল! বাঁচব কি করে? পুলিশকে ডাকতে বললাম, ডাকো না!'

'ডাকব। আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো, শেষ কখন দেখেছিলেন টাকাগুলো? মনে আছে?'

'নিশ্চয় আছে!' নাইট ক্যাপটা টেনে সোজা করে বসাল বুড়ো। 'তবে দেখিনি। দেখব কি করে? আমি তো চোখে দেখি না। হাত দিয়ে ছুঁয়ে বুঝেছি। ছিল ওখানেই।'

'কোথায়?'

'বলব না।'

'কখন ছুঁয়েছেন?'

'কাল রাতে। বারোটা নাগাদ। শুয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু টাকার চিন্তায় ঘুম আসছিল না। কেবলই মনে হচ্ছিল, টাকাগুলো আছে তো? না নিয়ে গেছে? একা একা থাকি। মেয়েটাও চলে গেছে। চিন্তা তো হবেই। হবে না? শেষে উঠে দেখতে গেলাম। হাত দিয়ে দেখি আছে। নিশ্চিন্ত হয়ে এসে ঘুমিয়ে পড়লাম।'

'হুঁ.' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর. 'রাত বারোটার পরই কোন

এক সময় চুরি হয়েছে। সেটা সকালেও হতে পারে। আজ সকালে কেউ দেখা করতে এসেছিল আপনার সঙ্গে?'

'এসেছিল তো বটেই। কিন্তু তাদের মধ্যে কে যে কাজটা করল বুঝতে পারছি না। আমার নাতনী এসেছিল। ও একাজ করবে না। ওকে আমি বিশ্বাস করি। মুদি এসেছিল মাল দিয়ে যেতে।...পুলিশকে খবর দাও। ওরা এসে আমার টাকাটা বের করে দিক।'

এক ফোঁটা পানি বুড়োর চোখ থেকে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে শুরু করল।

মায়া লাগল ফারিহার। আহা, বেচারা বুড়ো! তার শেষ সম্বল টাকাগুলো নিয়ে গেল কোন্ দুষ্ট লোক! কিন্তু কোথায় লুকানো ছিল? সত্যি কি চুরি গেছে? নাকি একখানে রেখে ভুলে গিয়ে অন্যখানে খোঁজাখুঁজি করছে বুড়ো? যদি জায়গাটার কথা বলত, ভাল হত!

'ফগকে জানাতেই হবে,' ফিসফিস করে সঙ্গীদের বলল কিশোর। 'আর কোন উপায় নেই। বুড়ো সুযোগ দিলে আমরাই খুঁজে বের করতে পারতাম। এমন কোন কাজ না এটা।'

বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। এগিয়ে এসে থামল দরজার কাছে। টোকার শব্দ হলো। হাতল ঘুরল। ঘরে ঢুকল ছিমছাম পোশাক পরা একজন লোক। অবাক হয়ে তাকাল ছেলেমেয়েদের দিকে। ঘেউ ঘেউ করে উঠল টিটু।

'কে তোমরা?' জানতে চাইল সে। 'চাচা, এরা কে? বিরক্ত করছে নাকি? তুমি কেমন আছো?'

'কে? জেফরি?' ভাতিজাকে ধরার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল বুড়ো। ককিয়ে কেঁদে উঠল, 'জেফরি, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছেরে! টাকাগুলো সব চুরি হয়ে গেছে!'

'কি! চুরি! কে নিল? তখনই বলেছিলাম, এই অবস্থা হবে একদিন! কতবার বলেছি ব্যাংকে রাখতে...আমার কথা তো শুনলে না। তাহলে আর খোয়াতে হতো না টাকাগুলো।'

'এখন আর ওসব বলে আমার জ্বালা বাড়াসনে, জেফরি। কি করে ফেরত পাওয়া যাবে তাই বল।'

'রেখেছিলে কোথায়?' ঘরের চারপাশে একবার চোখ বোলাল জেফরি, যেন তাকালেই দেখতে পাবে। 'আমার মনে হয় টাকাগুলো ঠিকই আছে। কোথায় রেখেছ, তুমি ভুলে গেছ। চিমনির মধ্যে...কিংবা মেঝের কোন তক্তার নিচে...'

'কোথায় রেখেছিলাম এখন আর জেনে কি হবে?' চিৎকার করে উঠল বুড়ো। 'পুলিশকে ডাকতে বলেছি আমি। বলে বলে মুখ দিয়ে ফেনা তুলে ফেলছি। কেউ শুনছে না। তুই যা তো, জেফরি। পুলিশ ডেকে নিয়ে আয়।'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি ফোন করতে,' কিশোর বলল। 'পাশের বাড়িতে টেলিফোনের তার দেখলাম। দেখি, করতে দেয় কিনা।'

'তোমরা এখানে কি করছ?' আচমকা প্রশ্ন করল জেফরি।

'কিছু না,' জবাব দিল কিশোর। 'রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে আপনার চাচার চিৎকার শুনলাম। এসে দেখি পুলিশের জন্যে চিৎকার করে গলা ফাটাচ্ছেন উনি।...ফোন করতে যাচ্ছি আমি। কয়েক মিনিটের মধ্যে পুলিশ এসে যাবে আশা করি।'

কপালে চাপড় মেরে কাঁদতে কাঁদতে বলল বুড়ো, 'আমি এখন কি করব? আমার সমস্ত টাকা গেল! সব আশা-ভরসা শেষ...কপাল মন্দ...'

বুড়োর বিলাপ শোনার জন্যে আর ওখানে দাঁড়াল না কিশোর। সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে এল। পাশের বাড়ির গেটের কাছে এসে দাঁড়াল। নেমপ্লেটে নাম লেখা রয়েছে: হোয়াইট হেভেন। মানে শ্বেত স্বর্গ। কিন্তু বাড়ির দেয়ালের সাদা রঙটাও নেই, ময়লা, হলদেটে হয়ে গেছে; বাগানের অবস্থাও সুবিধের না। মনে হয় না খুব একটা যত্ন-আত্তি করা হয়। যাই হোক, বুড়োর মত অতটা দরিদ্র নয় এরা। ফোন আছে।

দরজা খুলে দিল হাসিখুশি চেহারার একজন মোটাসোটা প্রৌঢ়া ইনডিয়ান মহিলা।

'এক্সকিউজ মি,' খুব ভদ্রভাবে বিনীত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'টেলিফোনটা কি ব্যবহার করা যাবে? আপনাদের পাশের বাড়ির বুড়ো ভদ্রলোকের টাকা চুরি হয়েছে। পুলিশকে খবর দেব।'

অবাক হলো মহিলা। 'চুরি? পাশের বাড়িতে? আহারে, বুড়ো মানুষটা! এসো, এসো।'

ভাল ইংরেজি বলতে পারে সে, তবে কথার ইনডিয়ান টান মুছে ফেলতে পারেনি। হলঘরে নিয়ে এল ওদের। জানালার কাছে কাউচে আধশোয়া হয়ে আছে আরেকজন বুড়ো মানুষ। কাশতে কাশতে ফিরে তাকাল।

মহিলা পরিচয় করিয়ে দিল, তার ভাই। হপ্তাখানেক হলো বেড়াতে এসেছে। বলল, 'জেফ, এরা একটা ফোন করবে। অসুবিধে হবে না তো তোমার?'

'না না, অসুবিধে কি?' বেদম কাশতে আরম্ভ করল লোকটা। 'আই, এসো, এসো। কার কাছে করবে?'

'পুলিশ,' জানাল কিশোর।

ভুরু কোঁচকাল লোকটা। 'কেন, পুলিশকে কেন? কি হয়েছে?'

'পাশের বাড়ির বুড়ো ভদ্রলোকের টাকা চুরি হয়েছে...'

'আমার কাজ আছে। আমি যাই,' বলে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল মহিলা।

'টাকা চুরি হয়েছে?' কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছে জেফ।

'হ্যাঁ, তাই তো বলছে। ঘরের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে রেখেছিল, এখন আর খুঁজে পাচ্ছে না। তার ধারণা চুরি হয়ে গেছে।'

রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল কিশোর। বোতাম টিপল। 'পুলিশ স্টেশন?'

ভারি, ভোঁতা একটা কণ্ঠ কানে এল, 'ফগর‍্যাম্পারকট বলছি। কে?'

'আমি কিশোর পাশা। একটা রিপোর্ট করতে চাই…'

'ঝামেলা!' ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল ফগ। আছাড় দিয়ে রিসিভার রাখার শব্দ হলো। অবাক হয়ে গেল কিশোর। এমন রাগল কেন ফগ?

কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল মুসা, 'কি হলো?'

রিসিভার কানে ঠেকানো অবস্থায়ই ওর দিকে ঘুরল কিশোর। 'রাগ করে রিসিভার রেখে দিয়েছে ফগ। বোধহয় টিটুকে নিয়ে অপমানের কথাটা ভুলতে পারেনি এখনও।'

'এত সহজে কি আর ভোলা যায়,' হাসতে হাসতে বলল মুসা। 'আবার করো।'

আবার বোতাম টিপল কিশোর। ভেসে এল ফগের গলা। তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, 'দেখুন, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট, ফিয়ার লেনের একটা গলি থেকে কথা বলছি আমি। এখানে একটা ঘটনা ঘটেছে। চুরি।'

'খবরদার!' গর্জে উঠল ফগ। 'আমার সঙ্গে আর কোন রকম শয়তানির চেষ্টা করলে হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করব আমি। কুত্তাটাকে যেখানে ভরেছিলাম, সেখানে এনে ভরব তোমাকেও। মশকরা করার আর জায়গা পাও না!'

'আপনি অযথাই রাগ করছেন, মিস্টার ফগর‍্যা…'

আছাড় দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ হলো আবার। কোন কথাই শুনতে চায় না ফগ। কি আর করবে। কিশোরও রিসিভার নামিয়ে রেখে সঙ্গীদের দিকে তাকাল। 'খেপে বোম হয়ে আছে ফগ। কোন কথাই শুনতে চাইল না। ওর ধারণা, আবার ওকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছি।'

'বোকাটাকে নিয়ে মুশকিল!' মুখ বাঁকাল রবিন। 'কি করা যায়?'

'ক্যাপ্টেন রবার্টসনকে ফোন করো,' বুদ্ধি দিল ফারিহা।

'হ্যাঁ, তাই করব,' তুড়ি বাজাল কিশোর। 'শিক্ষা হবে ফগের।'

চার

পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ফোন করে ক্যাপ্টেন রবার্টসনকে চাইল কিশোর।

'তিনি তো এখন নেই অফিসে। কে বলছ?' জানতে চাইল একটা কণ্ঠ।

'আমার নাম কিশোর পাশা। গ্রীনহিলস থেকে করছি। এখানে একটা চুরির ঘটনা ঘটেছে। ফিয়ার লেনে। কাউকে পাঠানো যাবে?'

'কেন, তোমাদের গ্রীনহিলসের পুলিশ কি হলো?'

'চেষ্টা করেছি। যোগাযোগ করতে পারছি না। দয়া করে আপনারা যদি তাকে বলে দেন তো ভাল হয়।'

'ঠিক আছে, বলছি। ঠিকানা বলো।'

ঠিকানা লিখে নেয়ার পর ডিউটি অফিসার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোন কিশোর পাশা? আমাদের ক্যাপ্টেনের বন্ধু?'

'জ্বী!'

'ও, থ্যাংক ইউ, কিশোর। রিপোর্টটা করে ভাল করেছ। ক্যাপ্টেন এলেই তাঁকে বলব। আর এখন ফগকে বলে দিচ্ছি আমি। পৌছে যাবে।'

কিশোরও অফিসারকে ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার রেখে দিল।

সুতরাং আরেকবার ফোন বেজে উঠল ফগের অফিসে। মেজাজ খারাপ হয়ে আছে তার। ভাবল, আবার তাকে বিরক্ত করার জন্যে ফোন করেছে কিশোর। থাবা দিয়ে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল। গর্জে উঠল, 'হালো? কে?' দেখো, তোমার বাঁদরামি আমি...'

জবাব দিল একটা বিস্মিত কণ্ঠ, 'হেডকোয়ার্টার থেকে বলছি। কি হয়েছে তোমার, ফগর‍্যাম্পারকট?'

'ঝামেলা!'

'কি বললে?' আরও অবাক হলো ডিউটি অফিসার।

'না না, কিছু না!' তাড়াতাড়ি বলল ফগ।

'এইমাত্র ফোন করেছিল কিশোর পাশা...'

'ঝামেলা!'

'আরে কি ঝামেলা ঝামেলা শুরু করলে! শোনো, ও বলল, তোমাদের ওখানে ফিয়ার লেনে নাকি একটা চুরি হয়েছে।'

হাঁ হয়ে গেল ফগের মুখ। তারমানে ওকে খোঁচানোর জন্যে তখন ফোন করেনি কিশোর! সত্যি কথাই বলেছিল। কিন্তু কি করে বুঝবে সে? টিটুকে নিয়ে যে কাণ্ডটা করল।

'ফগ? শুনতে পাচ্ছ?' অন্য পাশ থেকে ভেসে এল ধৈর্যচ্যুত কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ, স্যার, বলুন,' কাগজ-কলম টেনে নিল ফগ। 'ঠিকানা?' খসখস করে লিখে নিয়ে বলল, 'আমি এখুনি চলে যাচ্ছি ওখানে।'

'হ্যাঁ, যাও!'

কেটে গেল লাইন। অফিসারের বলার ভঙ্গিটা ভাল মনে হলো না ফগের। রেগে গেছে নাকি? ওই বিচ্ছু ছেলেটা কি কিছু বলেছে? তাহলে ক্যাপ্টেন আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে লাগাবে। নিশ্চয় তিনি এখন অফিসে নেই। নইলে তিনিই এখন কথা বলতেন ওর সঙ্গে।'

উঠে দাঁড়াল ফগ। গর্জন করে ডাক দিল ক্যারোলিনকে। ও এলে বলল, 'শোনো, জরুরী কাজে বেরোচ্ছি। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ফিরব। তুমি খাবার রেডি করে রাখো।'

দ্রুত সাইকেল চালিয়ে ফিয়ার লেনে রওনা হলো ফগ।

কিশোররা তখনও ওখানেই রয়েছে। গল্প করছে জেফের সঙ্গে।

'এখানে বসে বুড়োর বাড়ির সামনের রাস্তা, গেট সব দেখতে পাই আমি,' জেফ বলছে। 'কাউচটা এখানে দিতে আমিই বলেছি বেনিকে। সব দেখা যায়। রাস্তায় মানুষের আসা, যাওয়া, আরও কত কি...'

সবাই তাকাল জানালাটা দিয়ে। সত্যি অনেক কিছু দেখা যায়।

'তারমানে একটু আগে ওই বাড়িতে আমাদেরও ঢুকতে দেখেছেন আপনি?' কিশোর বলল।

'তা তো বটেই ' জেফ বলল।-'রাস্তা দিয়ে আসতে দেখলাম। তারপর দেখলাম ও বাড়ির গেট দিয়ে ঢুকছ। সামনের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালে। জানালার কাছে গেলে। আবার ফিরে গেলে দরজার কাছে। সব দেখেছি।'

ঘরে ঢুকল জেফের বোন বেনি, সেই মোটাসোটা মহিলা। ওর স্বামী থাকে লস অ্যাঞ্জেলেসে। চাকরি করে। মাসে একবার আসে।

মহিলার হাতে একবাক্স চকলেট। ফারিহার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নাও। ভাল জিনিস। সবাইকেই দাও।'

খুব খুশি হলো ফারিহা। বার বার বেনিকে ধন্যবাদ দিতে লাগল। মোড়ক খুলে চকলেট বের করে সবাইকেই দিল। টিটুও বাদ পড়ল না। বুড়ো জেফকেও দিল।

চকলেট মুখে পুরে জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়েই বলে উঠল মুসা, 'ওই যে, হাজির হয়ে গেছেন আমাদের ঝামেলা।'

হন্তদন্ত হয়ে এসে পাশের বাড়ির গেটের কাছে সাইকেল থেকে নামল ফগ। হ্যান্ডেল ধরে ঠেলে নিয়ে ভেতরে ঢুকল। স্ট্যান্ডে তুলে রেখে গিয়ে সামনের দরজায় থাবা দেবে এই সময় বেরিয়ে এল জেফরি। দুজনে কি যেন কথা হলো। তারপর ভেতরে ঢুকল ফগ।

'যাক, এতক্ষণে খুশি হবে বুড়ো,' রুমালে হাত মুছতে মুছতে কিশোর বলল, 'তার সাধের পুলিশকে পেয়েছে।...আহ্, চকলেটটা কিন্তু দারুণ!'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল মুসা, 'খাইছে! একটা বাজে। ফারিহা, চলো চলো, জলদি। লাঞ্চের দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

বেনি বলল, 'আবার এসো। জেফ একা একা থাকে। বুড়ো মানুষ। শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না। কথা বলার মানুষ খোঁজে। আর কাউকে না পেয়ে আমাকেই আটকে রাখতে চায়। কিন্তু আমার তো কাজকর্ম আছে। বাড়িঘর সামলাতে হয়। ওকে সঙ্গ দিই কি করে?'

আসবে, কথা দিয়ে, দুই ভাই-বোনকে ধন্যবাদ এবং গুড-বাই জানিয়ে দলবল নিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। ফগ কি করছে দেখার ইচ্ছেটা চাপা দিয়ে যার যার বাড়ি রওনা হলো ওরা।

বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে এসে ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে বসল কিশোর। টাকাগুলো কোথায় লুকিয়েছে বললেও পারত বুড়ো। তাহলে একখানে রেখে ভুলে অন্য জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেছে কিনা বোঝা যেত।

ঘরটা এত ছোট, আর আসবাবপত্র এতই কম, লুকানোর জায়গাও তেমন নেই। কোথায় রাখল? কোনও একটা আসবাবের ভেতরে?

সাধারণ টাকা হারানোর ঘটনা বলে ব্যাপারটাকে খুব একটা গুরুত্ব দিল না কিশোর। তেমন কোন রহস্য নয়। শীঘ্রিই মাথা থেকে দূর করে দিল ভাবনাটা। যা করার ফগ করুকগে।

বিকেলে ফগ এল তার সঙ্গে দেখা করতে। খবর নিয়ে এল জেন, 'কিশোর, ওই হোঁৎকা পুলিশটা এসেছে। টিটুকে নিয়ে আবার ঝামেলা পাকাতে চায় নাকি?'

'কি জানি। দেখি তো?'

টিটুকে নিয়ে হলঘরে নেমে এল কিশোর।

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ফগ। ঘুরে তাকাল। চেহারায় রাগ।

ওকে দেখেই গোড়ালি কামড়ানোর জন্যে অস্থির হয়ে উঠল টিটু।

ধমক দিল কিশোর, 'অ্যাই টিটু, চুপ!' ফগকে বলল, 'মিস্টার ফগ, আপনি বসুন।'

কুকুরটার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে থেকে একটা সোফায় বসল ফগ। পকেট থেকে নোটবুক বের করে বলল, 'চুরির ঘটনাটার ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা বলতে এলাম।'

'আমাকে কি চোর ভাবছেন নাকি?'

'না, তা ভাবছি না,' এমন ভঙ্গিতে কিশোরের দিকে তাকাল ফগ, যেন ও চোর হলেই ভাল হত। ধরে নিয়ে গিয়ে ধোলাই দিতে পারত। 'আমি জানতে চাই, বুড়ো হারগ্রিব যখন পুলিশ পুলিশ বলে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করছে, তোমরা ওখানে গিয়ে পড়লে কিভাবে?'

'গিয়ে পড়িনি,' জবাব দিল কিশোর। 'আইসক্রীম খেয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। শর্টকাটে আসার জন্যে ওই গলিতে ঢুকেছিলাম। ব্যাপারটাকে পুরোপুরিই কাকাতালীয় ধরতে পারেন।'

'আশ্চর্য এক ঝামেলা! যতবারই কোন না কোন রহস্য ঘটে এই গাঁয়ে, আগেভাগেই ঠিক গিয়ে হাজির হয়ে যাও তোমরা। গন্ধ পাও নাকি?'

মুচকি হাসল কিশোর, 'বললামই তো ব্যাপারটা কাকতালীয়।'

'কিন্তু কাকতালীয় ঘটনায় জড়িয়ে যে পুলিশের কাজে বাধার সৃষ্টি করো, সেটার কি হবে?'

'বাধা!' অবাক হওয়ার ভান করল কিশোর। 'কই, বাধা কোথায়? বরং সাহায্য করি। আমি তো আরও ভাবছিলাম, একটু পরে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। শহরে গিয়ে ক্যাপ্টেন রবার্টসনের সঙ্গে দেখা করে তাঁর অনুমতি নিয়ে আসব টাকাগুলো খোঁজায় পুলিশকে সাহায্য করার জন্যে।'

ক্যাপ্টেনের নাম শুনেই অকস্মাৎ বদলে গেল ফগের ভাবভঙ্গি। রাগ উধাও। কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'আরে কি বলো! অনুমতির জন্যে আবার তাঁর কাছে যাওয়া লাগবে কেন? আমিই তো দিতে পারি। খারাপ কিছু নিশ্চয় বলে ফেলিনি? আমি শুধু ভেবে অবাক হচ্ছিলাম, রহস্যময় কোন ঘটনা ঘটলেই ঠিক সময়ে গিয়ে তোমরা হাজির হও কি করে সেখানে?'

ফগের তেলানোতে ঠাণ্ডা হলো না কিশোর। 'পুলিশের কাজে নাক গলিয়ে বাধা সৃষ্টি করার অভিযোগ করেছেন আপনি।'

'ঝামেলা! মুখ ফসকে কি বলতে কি বলে ফেলেছি। কাজের চাপ আর নানা ঝামেলায় মাথাটা আসলে খারাপ হয়ে গেছে আমার।' প্রায় তোয়ালের

সমান বড় একটা রুমাল বের করে মুখ আর ঘাড়-মাথা মুছতে শুরু করল ফগ। 'যা বলেছি ভুলে যাও।'

'ঠিক আছে, ভুলে গেলাম। আর কোন প্রশ্ন আছে আপনার?'

সাধারণ কিছু প্রশ্ন করল ফগ: কয়টার সময় কিশোররা ওই গলি দিয়ে আসছিল। তখন আশেপাশে কাউকে দেখেছে কিনা। বুড়োর ঘরে অস্বাভাবিক কোন কিছু চোখে পড়েছে কিনা। বুড়ো ওদের কি কি বলেছে, এসব।

প্রশ্নগুলোর ঠিক ঠিক জবাব দিল কিশোর। অহেতুক আর ফগকে বিরক্ত করতে চাইল না। কেউ 'সরি' বলে ফেলার পর আর কোন কিছু মনে রাখা ঠিক নয়।

সব প্রশ্নের জবাব পাওয়ার পর একটু দ্বিধা করল ফগ। তারপর সরাসরি কিশোরের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'এই কেসটার ব্যাপারে তোমার মতামত কি?'

'মতামত? এখনও কিছু ভাবিনি। তবে মনে হচ্ছে চোরটাকে খুঁজে বের করা খুব একটা কঠিন হবে না। আজ সকালে তার কাছে কারা কারা এসেছিল জানিয়েছে হারগ্রিব। চোর তাদের মধ্যেই কেউ হবে।'

'ও তো সব গুলিয়ে ফেলেছে!' বিরক্ত ভঙ্গিতে নাক কুঁচকাল ফগ। 'গতকাল কারা কারা এসেছে মনে করতে পারা উচিত ছিল ওর। এতই বুড়ো আর ভুলো মন, সব খেয়ে বসে আছে। এক জায়গায় টাকা রেখে অন্য জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে আমার। কি বলো?'

'হুঁ, আমারও সন্দেহ হচ্ছে।'

আর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে উঠে দাঁড়াল ফগ। নোটবুক পকেটে রেখে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজার কাছে গিয়ে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'তাহলে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ না আর?'

'নাহ, আর গিয়ে কি হবে? আপনি তো বলেই গেলেন...'

'থ্যাংক ইউ,' বলে বেরিয়ে গেল ফগ। মুখে ভালমানুষী ভাব দেখালেও মনে তুষের আগুন জ্বলছে ওর। মনে মনে কিশোরের চোদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করছে আর ভাবছে: দাঁড়াও! সুযোগ একদিন আসবেই আমার! তোমার বিচ্ছুগিরি সেদিন বের না করেছি তো আমার নাম ফগর্যাম্পারকট নয়!

পাঁচ

সাড়ে তিনটায় মুসাদের বাড়িতে এসে হাজির হলো কিশোর। কয়েক মিনিট পর এল রবিন। টেবিলে চা দিলেন মুসার আম্মা। ফ্রুটকেক কেটে দিলেন। মুসাকে দিয়ে আনিয়েছেন বেকারি থেকে। এত তাজা, এখনও গরম রয়েছে।

ফগের আসার কথা জানাল কিশোর।

'বুড়োর সঙ্গে দেখা করতে যাবে নাকি আর?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'গিয়ে আর কি করব?'

'কেন, এটা কি রহস্য নয়?' ফারিহার প্রশ্ন।

'রহস্যই। তবে মনে হচ্ছে খুব সাধারণ ব্যাপার। টাকাগুলো হয় ঘরেই কোথাও আছে, বুড়ো মনে করতে পারছে না। নয়তো ওর চেনা কেউ এসে চুরি করে নিয়ে গেছে। তার কোন আত্মীয়ও হতে পারে। যাই হোক, এসব নিয়ে আর ফগের সঙ্গে রেষারেষি করতে ইচ্ছে করছে না আমার।'

'হুঁ,' কিছুটা নিরাশ ভঙ্গিতেই বলল ফারিহা, 'তাহলে এবার আর কোন রহস্য পেলাম না আমরা। ঠিক আছে, তদন্ত নাহয় না-ই করলাম, কেসটা নিয়ে আলোচনা তো করতে পারি আমরা? বুড়ো জেফ সারাক্ষণ জানালার ধারে বসে থাকে। নিশ্চয় দেখেছে আজ সকালে কে কে এসেছিল বুড়ো হারগ্রিবের বাড়িতে।'

'তা তো দেখেছেই,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'সেটা গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারি। কিন্তু যেহেতু কেসটা নিয়ে আর কোন মাথাব্যথা নেই আমার, জিজ্ঞেস করতে যাব না। যা করার ফগই করুকগে।'

'কিন্তু জেফের সঙ্গে কি এমনিতেও দেখা করতে যাব না? তার বোন বেনি এতবার করে বলে দিল···ওরা খুব ভাল।'

'তা যাব। ওদের সঙ্গে কথা বলতে আমারও ভাল লেগেছে।'

ছয়

পরদিন সকালে নাস্তা সেরে মুসাদের বাড়িতে ফোন করল কিশোর। জানা গেল, মুসা বা ফারিহা কেউই বেরোতে পারবে না। বাগান সাফ করার কাজে দুজনকেই লাগিয়ে দিয়েছেন মুসার আম্মা। রবিনকে ফোন করে জানল, ওর বাবা-মা দুজনেই বাইরে বেরিয়েছেন। বাড়ি পাহারা দিতে রেখে গেছেন ওকে। কিছু জরুরী কাজও সারতে দিয়ে গেছেন। শুধু বাড়ি পাহারা দেয়ার জন্যে হলে হয়তো আটকে থাকা লাগত না। যাই হোক, বেরোতে আর পারছে না।

মনটা খারাপ হয়ে গেল কিশোরের। পায়ের কাছে বসে থাকা টিটুর দিকে তাকিয়ে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'ওরা তো কেউ আসতে পারছে না। চল, বসে না থেকে বরং জেফের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে আসি। ইনডিয়ানদের পুরানো আমলের গল্প শুনব। আমাদেরও সময় কাটবে, ওরও ভাল লাগবে।'

কিছুই না বুঝে জবাব দিল টিটু, 'খউ!'

'খউই সই। চল।'

ফিয়ার লেনে এসে সাইকেলটা রাস্তার পাশে স্ট্যান্ডে তুলে প্রথমে বুড়ো হারগ্রিব কেমন আছে দেখতে চলল কিশোর। জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি

দিয়েই চমকে গেল। পাশের বাড়ির জেফের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে ফগ। হারগ্রিবকে দেখা যাচ্ছে না।

আরও অবাক হলো কিশোর, ঘরে কোন আসবাব না দেখে। একেবারে খালি। মেঝেতে কার্পেটটা পর্যন্ত নেই। কেবল জানালার পর্দা বাদে। ওগুলো খুলতে গেলে বাইরে থেকে কেউ দেখে ফেলতে পারে, এই ভয়ে বোধহয় নেয়নি। কিংবা সময় পায়নি।

জানালার কাছ থেকে সরে এল কিশোর। ঘরে ঢোকার জন্যে দরজার দিকে এগোল।

ফগ ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কুঁচকে ফেলল। চিৎকার করে উঠল, 'ঝামেলা! ঠিক এসে হাজির! জানলে কি করে? কেউ তো শোনেনি এখনও।'

'কি হয়েছে?' ঘরে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আজ সকাল সাতটার দিকে...' শুরু করল জেফ।

বলতে দিল না ফগ। হাত নেড়ে থামিয়ে দিল। 'আপনি চুপ করুন!' কিশোরকে কোন তথ্য জানতে দিতে চায় না।

দমল না কিশোর। জেফকে জিজ্ঞেস করল, 'সাতটার পর কি হয়েছে?'

বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না ফগ। ফগের বার বার 'ঝামেলা' বলা, নাক কুঁচকানো আর ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে সব বলে দিল জেফ। সকাল সাতটায় চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে যায় তার। মিস্টার হারগ্রিবের বাড়ির দিক থেকে আসছিল চিৎকারটা। প্রথমে গুরুত্ব দেয়নি জেফ। ঘুমিয়ে পড়ে।

'কিন্তু চেঁচানো আর বন্ধ হয় না,' জেফ বলল। 'কান ঝালাপালা। থামাথামি নেই। শেষে উঠে কাপড় পরে দেখতে বেরোলাম কি হয়েছে।'

'তারপর?' জানতে চাইল কিশোর।

'হারগ্রিব চিৎকার করছে। দরজায় তালা দেয়া। ঢুকব কি করে? অনেক ডাকাডাকি করে দরজা খোলালাম। ভেতরে ঢুকে দেখি সারা ঘর খালি। জানালার পর্দাগুলো ছাড়া ঘরে আর কিচ্ছু নেই। রাতের বেলা সব নিয়ে গেছে চোরে।'

'হুঁ!' মাথা দোলাল কিশোর। আপনমনেই বিড়বিড় করল, 'এবার আর সাধারণ চুরির ঘটনা বলে অবহেলা করা যাচ্ছে না এটাকে। জমাট বাঁধতে আরম্ভ করেছে রহস্য।'

কিশোরের নাক গলানো সহ্য করতে পারছে না ফগ। অহেতুক কাশি দিয়ে সাগরকলার মত মোটা আঙুল নেড়ে বলল, 'যাও তো এখন তুমি। ঝামেলা কোরো না!' মাত্র আগের দিন বিকেলে যে কিশোরদের বাড়ি গিয়ে তার সঙ্গে নরম নরম কথা বলে এসেছে ভুলে গিয়ে আবার আদি অকৃত্রিম ফগর‍্যাম্পারকট হয়ে উঠেছে সে। খসখসে কণ্ঠস্বর। 'এসব পুলিশের কাজ। তোমার মত ছেলেছোকরাদের নয়।'

গেল তো না-ই, মাঝখানের দরজাটা দিয়ে ভেতরের ঘরে উঁকিঝুঁকি মারতে আরম্ভ করল কিশোর।

ভ্রূকুটি করল ফগ। ধমকে উঠল, 'বললাম না এসব পুলিশের কাজ!'

'আমি তো সেটা অস্বীকার করছি না,' নিরীহ্ স্বরে কিশোর বলল। 'পুলিশের কাজে নাক গলাতে আসিনি আমি। কিন্তু মিস্টার হারগ্রিবের সঙ্গে দেখা করায় কি আইনগত কোন বাধা আছে?'

অসহায় ভঙ্গিতে ঘরের চারপাশে চোখ বোলাতে লাগল ফগ। জবাব খুঁজে পেল না। এই সুযোগে ভেতরের ঘরটায় ঢুকে পড়ল কিশোর।

অতি সাধারণ একটা লোহার চারপায়ায় বসে আছে বুড়ো। কিশোরকে দেখে ককিয়ে উঠল, 'প্রথমে গেল আমার টাকা। এখন গেল জিনিসপত্রগুলো। কি করব আমি? আমার সঙ্গে এই শত্রুতা কার?'

'রাতে কোন শব্দ শোনেননি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না, কিচ্ছু না...'

নোটবুক হাতে এসে বাদ সাধল ফগ, যাতে আর কিছু বলতে না পারে হারগ্রিব। শীতল কণ্ঠে বলল, 'আপনার নাতনীর ঠিকানাটা দরকার আমার। ওকে বলব আপনাকে এসে নিয়ে যেতে। এই অবস্থায় এখানে আর একা থাকতে পারবেন না আপনি। বলুন তো, ঠিকানাটা?'

'৭, জুন স্ট্রীট, ডিয়ারভিল।' ঠিকানাটা বলেই চিৎকার করে উঠল বুড়ো, 'কিন্তু আমি ওখানে যাব না। বাচাল বুড়িগুলো সারাক্ষণ ঝগড়া করে। কে সহ্য করবে ওদের চেঁচামেচি আর ঘ্যানর ঘ্যানর! আমি ওখানে যাব না।'

'কিন্তু এ বাড়িতে থাকবেন কি করে?' ধৈর্য হারিয়ে চিৎকার করে বলল ফগ। হারগ্রিব কানে কম শোনে বলে। ধমকের মত শোনাল কথাটা।

হারগ্রিবকে কুঁকড়ে যেতে দেখে কিশোর বলল, 'বুড়ো মানুষটাকে এভাবে ধমকাচ্ছেন কেন? কেউ যদি তার নিজের বাড়ি ছেড়ে যেতে না চায় আপনি জোর করে কোথাও পাঠাতে পারেন না।'

'কিন্তু থাকবে কি করে এখানে? আসবাব নেই, কিছু নেই...'

'সেটা উনি বুঝবেন।'

জ্বলন্ত চোখে কিশোরের দিকে তাকাল ফগ। জবাব খুঁজে পেল না।

জেফ পরামর্শ দিল, 'এক কাজ করা যাক বরং। আমার বোনের বাড়িতে ছোট একটা গেস্ট রুম আছে। মিস্টার হারগ্রিবের নাতনী না আসা পর্যন্ত তিনি ওখানে থাকতে পারেন। বেনিকে আমি বলে দিলে সে না করবে না।'

'তা অবশ্য খারাপ হয় না,' নোটবুক পকেটে ভরল ফগ। 'তবে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দয়া করে দরজায় তালা লাগিয়ে যাবেন। আমি অফিসে যাচ্ছি। আমার বসকে ফোন করে খবরটা জানাব।' আনমনে বিড়বিড় করতে লাগল, 'অদ্ভুত কাণ্ড! কি ছেঁচড়া চোররে বাবা! রাত দুপুরে ভাঙা চেয়ার-টেবিল চুরি করে নিয়ে যায়! ফকিরেরও অধম!' কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকো না। বাড়ি চলে যাও। এখানে থেকে গোল পাকানোর কোন দরকার নেই। আমি বুঝি না, ঠিক সময়মত এসে হাজির হও কি করে! যেখানেই গণ্ডগোল, সেখানেই হাজির! আশ্চর্য ঝামেলা!'

পড়শীদের বাড়ি থাকতে যাওয়ার জন্যে হারগ্রিবকে রাজি করাতে বেশ বেগ পেতে হলো। জেফ গিয়ে তার বোনকে বলে ওদের মালীকে পাঠাল।

কিশোর আর মালী মিলে হারগ্রিবকে প্রায় বয়ে নিয়ে এল বেনিদের বাড়িতে।

বুড়োর জন্যে বিছানা আগেই ঠিকঠাক করে রেখেছে বেনি।

'যদ্দিন খুশি থাকুন এখানে,' বুড়োকে খাতির করে বলল সে। 'কোন অসুবিধে হবে না। যদি মন খারাপ লাগে, বলবেন। দরকার হয় আমি নিজে গাড়িতে করে ডিয়ারভিলে দিয়ে আসব আপনাকে। রাত দুপুরে একজনের বাড়ির চেয়ার-টেবিল নিয়ে যায়! কোন কথা হলো? মানুষের আর মায়াদয়া বলে কিছু রইল না। নিলই বা কিভাবে? একটা শব্দও তো শুনলাম না!'

হারগ্রিবের বাড়িতে ফিরে গেল কিশোর। চারপাশটা ঘুরে ঘুরে দেখল। ফগের মতই অবাক হয়েছে। কোন সন্দেহ নেই, বুড়ো তার টাকাগুলো আসবাবপত্রের মধ্যেই লুকিয়েছিল। ভাগাভাগি করে একাধিক জায়গায়ও হতে পারে। কিন্তু টাকা তো আগেই চুরি হয়ে গিয়েছিল। পরে আসবাব চুরি করতে গেল কেন চোর?

নাহ্, এবারে রহস্যটা আর সাদামাঠা নেই তদন্ত করা দরকার। ভালমত খুঁজলে কোন না কোন সূত্র পাওয়া যাবেই। গতকাল সকালে কে কে এসেছিল হারগ্রিবের সঙ্গে, সেটা জানতে হবে আগে। সন্দেহভাজনদের নামের একটা তালিকা তৈরি করতে হবে।

ঘরে ঢুকে পড়ল কিশোর। অতি সাধারণ লোহার চারপায়া। লোহার স্প্রিং লাগানো। ওটাতে টাকা লুকানো অসম্ভব। কোন জায়গা নেই। ম্যাট্রেসটা একেবারেই পাতলা। হতদরিদ্র অবস্থা। তাতে টাকা হয়তো ভরে রাখা যায়, কিন্তু কেটে ঢোকাতে হবে। তারপর আবার সেলাই করতে হবে। বুড়ো দেখে না চোখে। তার জন্যে সেটা বড়ই কঠিন কাজ। তা ছাড়া নতুন কোন কাটা কিংবা সেলাইও ওতে দেখা গেল না। সেলাইয়ের সুতোগুলো বহু পুরানো। ময়লায় কালো হয়ে আছে।

বালিশও খুব পাতলা আর শক্ত। পুরানো সেলাই। নতুন কাটাকুটি কিংবা সেলাইয়ের চিহ্ন নেই।

মেঝের কাঠের পাটাতনগুলো দেখল। কোনটাই তোলা হয়েছে বলে মনে হলো না। শক্ত করে পেরেক মারা। চিমনির নিচে কোথাও টাকা লুকানোর জায়গা নেই। চিমনির মুখের কাছে কিংবা ওপরের অংশে টাকা রাখাটাও নিরাপদ নয়। পুড়ে যাওয়ার ভয় আছে।

ব্যাপারটা অবাক করার মতই। কোন কারণ না থাকলে টাকা চুরি হয়ে যাওয়ার পর কেন কেউ রাত দুপুরে বাতিল কতগুলো আসবাব চুরির কষ্ট করবে? যদি সে না জানে, নিশ্চিত না হয় টাকাগুলো কোন একটা আসবাবের মধ্যেই আছে? ঘরের মধ্যে বুড়োকে রেখে তল্লাশি চালানোর সাহস নিশ্চয় হয়নি। তাই জিনিসগুলোই তুলে নিয়ে গেছে। পারলে যেন ঘরটাও নিয়ে যেত।

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে চোখ পড়ল টিটুর ওপর। নিজেকে প্রশ্ন করার ছুতোয় কুকুরটাকেই জিজ্ঞেস করল, 'পুরো ব্যাপারটাই তোর কাছে কেমন অবাক লাগছে না টিটু?'

কিছুই না বুঝে মহাপণ্ডিতের মত ঘেউ ঘেউ করে জবাব দিয়ে দিল টিটু। ঘরের মধ্যে থাকতে তার মোটেও ভাল লাগছে না। উত্তেজক কোন গন্ধই নেই এখানে। একটা ইঁদুর পর্যন্ত নেই। কিশোরের প্যান্ট আঁকড়ে ধরে নীরবে মিনতি জানাল বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে।

'দাঁড়া, দাঁড়া, যাচ্ছি। তালা লাগাতে দেরি হবে না। চাবিটা আবার দিয়ে আসতে হবে জেফের হাতে।'

দরজায় তালা দিয়ে গিয়ে আবার জেফের বাড়িতে ঢুকতেই সে বলল, 'বসো, বসো, কফি খেয়ে যাও। আনতে গেছে বেনি।'

'কফি আমার ভাল লাগে না।'

'ঠিক আছে, তাহলে চকলেট দিতে বলব। এখনও কয়েক প্যাকেট আছে বেনির কাছে।'

কিশোরেরও বসার ইচ্ছে। গতকাল সকালে হারগ্রিবের বাড়িতে কে কে এসেছিল জানা দরকার। চোর হয়তো ওদের মধ্যেই কোন একজন।

বলার জন্যে মুখিয়েই আছে জেফ। ব্যাপারটা নিয়ে কিশোরের চেয়ে আগ্রহ কম নয় তার। সুন্দর একটা তালিকা করে রেখেছে। সেটা দেখাল কিশোরকে।

পাঁচজন লোকের নাম এভাবে সাজিয়েছে জেফ:

১। কাগজ ও ম্যাগাজিন সহ মহিলা।

২। মুদির দোকানের ছেলে।

৩। গাড়িতে করে আসা ব্যাগ হাতে ভদ্রলোক। গাড়ির নম্বর,
জি এইচ ১১১।

৪। ভাল পোশাক পরা তরুণ। মাত্র মিনিটখানেক ছিল।

৫। অল্পবয়েসী মেয়ে। অনেকক্ষণ ছিল।

তালিকাটা পড়ে কিশোর বলল, 'হুঁ। অনেকেই এসেছিল দেখা যাচ্ছে। মিস্টার হারগ্রিব কি বলে?'

'ও বলেছে, ওর নাতনী এসেছিল কিছু ঘরের কাজ করে দিতে। কাপড় ধোয়া, বাসন মাজা, এসব,' জেফ বলল। 'অল্পবয়েসী মেয়েটাই নিশ্চয় তার নাতনী। সামান্য সময়ের জন্যে তার ভাইপোও নাকি এসেছিল। কিন্তু গুলিয়ে ফেলেছে বুড়ো। কে কে এসেছিল শিওর হতে পারছে না। তবে আমি তোমাকে কিছু তথ্য দিতে পারি। ভাল পোশাক পরা লোকটা তার ভাইপো। কাগজওয়ালা মহিলার পরনে ছিল লাল কোট। মাথার হ্যাটে একটা লাল কাপড়ের গোলাপ গোঁজা ছিল।'

'হ্যাঁ, এসব তথ্যে কাজ হবে,' কিশোর বলল। 'মুদির দোকানের লোকটা দেখতে কেমন ছিল?'

'লোক নয়, ছেলে। সতেরো আঠারো বছর বয়েস। লাল চুল। সেলসম্যান হবে। মুদির নিজের ছেলেও হতে পারে। এখানকার লোকজন তো চিনি না আমি। তোমরাই ভাল বলতে পারবে। সাইকেলে করে এল।

হ্যান্ডেলে একটা কার্ডবোর্ডে লেখা গ্রীন স্টার। ওদের দোকানের নাম হবে হয়তো।'

'বাহ্,' মাথা দুলিয়ে প্রশংসা করল কিশোর, 'দেখার চোখ তো খুব ভাল আপনার।'

হাসল জেফ, 'এই আর কি। জানালার কাছে বসে থাকা ছাড়া তো আর কোন কাজ নেই। বসে বসে দেখেছি।'

'এই পাঁচজনের ব্যাপারে এখন ভালমত খোঁজ নিতে হবে আমাদের। বুঝতে হবে এদের কোনজন টাকাটা চুরি করেছে। মুদির ছেলেটাকে প্রথমেই বাদ দেয়া যায়। কি বলেন?'

'না না, সেটা উচিত হবে না। ও অনেকক্ষণ ছিল ঘরের ভেতরে।'

'ও। তারমানে এই পাঁচজনের সব কজনকেই সন্দেহের তালিকায় রেখে খোঁজ নিতে হবে। তা নেয়া যাবে। মুসা, রবিন আর ফারিহাকেও কাজে ল্যাগিয়ে দেব।'

আরও কিছুক্ষণ থাকল কিশোর। জেফের সঙ্গে কথা বলল। বেনি এসে হাসিমুখে বলল, 'আমার ভাই এখন বেশ খুশি। আসার পর থেকেই মনমরা হয়ে ছিল। এখন একটা কাজ পেয়েছে। ধাঁধার সমাধান করতে ভাল লাগে ওর।'

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। পাশে পাশে হেঁটে চলল টিটু। রাস্তায় রাখা সাইকেলটার কাছে এগোনোর সময় গাড়ির চাকার দাগ খুঁজতে লাগল কিশোর। আসবাব বয়ে নেয়ার জন্যে নিশ্চয় কোন ধরনের গাড়ি নিয়ে এসেছিল চোর।

রাস্তার পাশের নরম মাটিতে পেয়ে গেল চাকার দাগ। সে যেখানে সাইকেল রেখেছে তার উল্টোদিকে, হারগ্রিবের বাড়ির গেট থেকে সামান্য দূরে। সাধারণ গাড়ির চেয়ে চাকাগুলো কিছুটা চওড়া। ট্রাকের চাকার চেয়ে সরু। ভ্যানগাড়ি। একটা ল্যাম্প পোস্টে ঘষা লাগার দাগও দেখতে পেল। খয়েরি রঙ লেগে আছে। ঘষা খেয়ে গাড়ির গা থেকে লেগেছে। তারমানে আসবাব নিতে আসা গাড়িটার রঙ খয়েরি। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ল্যাম্পপোস্টের গায়ে ঘষা লাগিয়েছে।

আর কোন সূত্র পাওয়া গেল না। টিটুকে সাইকেলের বাস্কেটে তুলে নিয়ে বাড়ি ফিরে চলল কিশোর। মুসাদের খবর দিতে হবে। রহস্য যখন পেয়েই গেছে একটা, জরুরী মীটিঙে বসা দরকার।

সাত

বিকেল তিনটেয় কিশোরদের বাড়ির বাগানের ছাউনিতে বসল গোয়েন্দাদের মীটিং। বাড়ি ফিরেই মুসা আর রবিনকে ফোন করে দিয়েছিল সে। ঠিক সময়ে

চলে এসেছে ওরা। ফারিহাও এসেছে মুসার সঙ্গে। সবাই উত্তেজিত। খবর শোনার জন্যে অস্থির।

'চারদিকে খুব গুজব ছড়াচ্ছে, কিশোর,' রবিন বলল। 'রাত দুপুরে হারগ্রিবের বাড়ি থেকে সমস্ত আসবাব নিয়ে গেছে চোরেরা। বুড়ো হারগ্রিবকে নাকি বাড়ির বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার খাটটাও নিয়ে গেছে। সারারাত বাইরে পড়ে ছিল বুড়ো।'

'কে বলেছে?' জানতে চাইল কিশোর।

'আমাদের ঠিকা কাজ করতে আসে যে মহিলা, মারথা, সে।'

হাসল কিশোর, 'বাড়িয়ে বলেছে। বুড়োর সামনের ঘরের জিনিসপত্রগুলো নিয়েছে। ভেতরের ঘরের কিছু নেয়নি। চুরি হওয়ার সময় বুড়ো তার খাটেই ঘুমাচ্ছিল। কিছুই শুনতে পায়নি।'

'কানে খাটো যে,' মুসা বলল।

'হ্যাঁ, সেজন্যেই। তা ছাড়া নিশ্চয় তেমন শব্দও করেনি চোর। সাবধানে ছিল। পাশের বাড়ির বেনিও নাকি রাতে কোন শব্দ শোনেনি।'

'তাহলে কি ভূতে গাপ করে দিল সব?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'যে গাড়িটাতে করে নিয়েছে, সেটার চাকার দাগ দেখে এলাম রাস্তায়। ল্যাম্পপোস্টে ঘষাও লাগিয়েছে।'

'ওই গাড়িতে করেই নিয়েছে, কি করে বুঝলে?' জানতে চাইল ফারিহা।

'বাড়ির গেটের কাছাকাছি রাস্তার পাশের নরম মাটিতে আর কোন গাড়ির চাকার দাগ দেখিনি। অন্য কোন গাড়ি দাঁড়ায়ওনি। কেবল ওই একটাই।'

'ভাল একটা সূত্র। জানা গেল কোন্ ধরনের গাড়িতে করে মালগুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওই গাড়িটা খুঁজে বের করতে হবে এখন। আর কিছু পেয়েছ?'

'আর? কিছু লোকের নাম জেনেছি। যারা গতকাল সকালে কোন না কোন কারণে হারগ্রিবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। যাই হোক, একটা ব্যাপার পরিষ্কার, টাকাটা ঘরেই রেখেছিল হারগ্রিব। আসবাবের মধ্যে লুকিয়ে। এক জায়গায়, কিংবা ভাগাভাগি করে বিভিন্ন জায়গায়। কাঠের গায়ে পকেট বানিয়ে তাতে ভরে রাখতে পারে।'

'ও, মারথা আরেকটা কথা বলেছে,' রবিন বলল। 'হারগ্রিব নাকি কাঠের মিস্ত্রী ছিল। তারমানে চেয়ার-টেবিল কিংবা সোফার কোনখানে কিভাবে পকেট তৈরি করতে হবে, খুব ভাল জানে সে।'

'হ্যাঁ। মিস্ত্রী হলে তো জানবেই।'

'এটা কি কোন ধরনের সূত্র?' জিজ্ঞেস করল ফারিহা।

'সূত্রই,' একটু চিন্তা করে বলল কিশোর। 'তবে আমার মনে হয় না এ তথ্য দিয়ে বিশেষ কোন কাজ হবে। জানা কথাই, আসবাবে টাকা লুকিয়েছিল বুড়ো। বরং টাকাটা খুঁজে বের করতে হলে আগে জানতে হবে চুরিটা করেছে কে।'

'কাকে সন্দেহ তোমার?'

পকেট থেকে নোটববুক বের করল কিশোর। জেফ যেভাবে তালিকাটা তৈরি করেছিল, সেভাবেই লিখে নিয়ে এসেছে সে। পড়তে দিল সবাইকে। এক এক করে পড়া হয়ে গেলে নোটবুকটা নিজের কোলের ওপর খুলে ফেলে রেখে তালিকায় টোকা দিয়ে বলল, 'এই লোকগুলোর ব্যাপারে খোঁজ নিতে হবে এখন আমাদের। সম্ভব হলে ওদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ফারিহা, তোমার খালা তো গ্রীন স্টোর থেকেই জিনিসপত্র কেনেন। তুমি চেনো দোকানটা। খালার সঙ্গে দোকানে চলে যেতে পারো। মুদির সেলসম্যান ছেলেটার সঙ্গে কথা বলতে পারো। পারবে না?'

মাথা ঝাঁকাল ফারিহা। 'পারব।'

'মুসা, তুমিও সঙ্গে গেলে ভাল হয়। দুজন গেলে বেশি প্রশ্ন করতে পারবে।'

'তা পারব। যেতেও আপত্তি নেই আমার। ম্যাগাজিনওয়ালা মহিলার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে কে?'

'আমি,' কিশোর বলল। 'আমার ধারণা, ওই মহিলা পাদ্রীর বোন। তাহলে মেরিচাচীর সঙ্গে তার খাতির থাকবেই। গিয়ে চাচীর নাম করে প্রথমে আলাপ জমাব। তারপর প্রশ্ন করতে আর কোন অসুবিধে হবে না। তবে তার আগে একবার জেফের সঙ্গে দেখা করতে যাব। সন্দেহভাজনদের নিয়ে কিছু কথা আছে।'

'গেল দুজন,' মুসা বলল। 'এখন আসা যাক গাড়িটার কথায়। জি এইচ একশো এগারো। কি করে খুঁজে বের করব? তরুণ লোকটাই বা কে? আর ওই অল্পবয়েসী মেয়েটা, যে অনেকক্ষণ ধরে থেকেছে বুড়োর ঘরে?'

'ওই মেয়েটা, আমার বিশ্বাস, বুড়োর নাতনী।' নোটবুকটা বন্ধ করে পকেটে ভরল আবার কিশোর। 'কিছু ধোয়ামোছা করে দেয়ার জন্যে এসেছিল।' ফারিহা আর মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাদের যে কাজটা দিলাম, সেটা করো আগে। ফারিহা, তুমি ইচ্ছে করলে টিটুকে নিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে পারো। বাই চান্স যদি গাড়িটা নজরে পড়ে যায়।'

'আর আমি কি করব?' জানতে চাইল রবিন।

'তুমিও সাইকেল নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে পারো। গাড়িটা নজরে পড়লে ওটার পিছু নিয়ে জেনে আসার চেষ্টা করবে কোথায় যায়। গাড়ির সঙ্গে সাইকেল নিয়ে পারা যদিও অসম্ভব। তবু দূরে কোথাও না গেলে জায়গাটা দেখে ফেলতে পারবে আশা করি।'

'দেখব চেষ্টা করে।'

এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকাল কিশোর। 'আর কোন কথা আছে কারও?'

মাথা নাড়ল সবাই।

ঘরের কোণ থেকে খ্যাঁক করে উঠল টিটু। ফিরে তাকাল সবাই। কিন্তু ওদের দিকে নজর নেই তার। কয়েকটা বাক্সের দিকে তাকিয়ে আছে। নিশ্চয় ইঁদুর দেখতে পেয়েছে।

'এখন ওসব ইঁদুর-ফিঁদুর বাদ দে তো, টিটু।' হাত নেড়ে ডাকল কিশোর, 'আয় এদিকে। কাজ আছে।'

আট

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা বেনিদের বাড়িতে চলে এল কিশোর। ভাই-বোন দুজনেই ওকে দেখে খুব খুশি। বিশেষ করে জেফ। কথা বলার মানুষ পেয়ে। তার মতে, ছেলেটা খুব বুদ্ধিমান। ভদ্রতাও জানে। কথা বলে আনন্দ পাওয়া যায়।

'তারপর? কি খবর?' হেসে বলল জেফ।

'ওই পাঁচজন লোকের সম্পর্কে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম,' কিশোর বলল।

'ও। ফগর‍্যাম্পারকটও আমাকে অনেক প্রশ্ন করে গেছে। লোকটা বোকা। তবে প্রশ্নগুলো বুদ্ধিমানের মতই করেছে।'

চুলোয় যাক ফগ। ও বোকা না চালাক এ নিয়ে কথা বলার ইচ্ছে আপাতত নেই কিশোরের। জিজ্ঞেস করল, 'হারগ্রিব কোথায়?'

'ঘুমিয়ে আছে। অনেক কষ্টে ঘুম পাড়ানো হয়েছে। টাকার শোকে চোখের পাতা এক করতে চায় না বুড়ো।'

'সেটাই স্বাভাবিক। আচ্ছা, জেফ, একটা কথা বলুন তো, ওই পাঁচজন লোকের মধ্যে কারা কারা হারগ্রিবের ঘরে ঢুকেছিল?'

'সবাই। দরজার তালা লাগানো ছিল না। সবাইকেই দেখলাম হাতল ঘুরিয়ে পাল্লা খুলে ভেতরে ঢুকতে।'

'প্রথমেই যে মহিলার নাম লিখেছেন, সে পাদ্রীর বোন হতে পারে বলে আমার ধারণা। নিশ্চয় ধর্মীয় পত্র-পত্রিকা আর পুস্তিকা বিলি করার জন্যে হারগ্রিবের ঘরে ঢুকেছিল। আপনার কি মনে হয়?'

'মহিলাকে ওরকমই মনে হয়েছে আমার। তবে ভেতরে ঢুকে বেশিক্ষণ থাকেনি সে।'

'হারগ্রিবের ভাতিজাও তো বেশিক্ষণ থাকেনি বললেন।'

'না, থাকেনি। তোমরা হারগ্রিবের বাড়িতে থাকার সময়ও তো আবার এসেছিল সে। নিশ্চয় দেখেছ। তখনও বেশভূষা ভাল ছিল।'

'তার সঙ্গে দেখা করতে যাব ভাবছি। ঠিকানাটা দরকার…হারগ্রিব জেগে থাকলে ওকে জিজ্ঞেস করতে পারতাম। আচ্ছা, মেয়েটা কে, জানেন নাকি কিছু?'

'মেয়েটা বুড়োর নাতনী। ওর কাপড়-চোপড় কেচে দিয়ে যায়, রান্না করে দিয়ে যায়। এদের মধ্যে কাকে সবচেয়ে বেশি সন্দেহ হয় তোমার?'

'বুঝতে পারছি না এখনও। গাড়িওলা লোকটার ব্যাপারে তো কিছুই

জানি না এখনও। ম্যাগাজিন দিতে আসা মহিলাকেও অত বিশ্বাসের কোন কারণ নেই, পাদ্রীর বোন হলে কি হবে। কথা না বললে শিওর হওয়া যাবে না। ফগ এতক্ষণে দেখা করতে চলে গেছে কিনা কে জানে। তাহলে মহিলার পেট থেকে কথা আদায় করা কঠিন হয়ে যাবে আমার জন্যে। হয়তো ভাল করে কথাই বলতে চাইবে না আর আমার সঙ্গে। পুলিশ একবার গিয়ে কারও সঙ্গে দেখা করে এলে যা হয় আরকি।'

বেনি এসে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি তো চা খেয়ে যাবে, নাকি?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না, সময় নেই। থাকতে পারলে খুবই খুশি হতাম। কিন্তু আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে এখনই। ফগের আগেই তার সঙ্গে দেখা করতে না পারলে মুশকিল হয়ে যাবে।'

জেফ আর বেনি দুজনকেই ধন্যবাদ দিয়ে তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে এল সে। গির্জাটা বেশি দূরে নয়। যেতে বেশিক্ষণ লাগবে না। গিয়ে এখন পাদ্রীর বোনকে পেলেই হয়।

দ্রুত সাইকেল চালিয়ে চলল সে। গির্জার গাড়িবারান্দায় ঢুকে সাইকেলটা স্ট্যান্ডে তুলে রেখে পাশের বসতবাড়িটাতে উঁকি দিল। মেঝেতে ঝুঁকে বসে মাদুর বানাচ্ছে এক মহিলা। পাদ্রীর বোন। যাক, পাওয়া গেছে।

কাশি দিল কিশোর।

শব্দ শুনে ফিরে তাকাল মহিলা। কিশোরকে চিনতে পেরে বলল, 'আরি, তুমি। এসো এসো। চাচী পাঠিয়েছেন বুঝি?'

'না। আমিই আসলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। ওই যে বেচারা বুড়ো মানুষটা, হারগ্রিবের টাকা চুরির ব্যাপারে কথা বলতে। বন্ধুদের সঙ্গে আমি তখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। তার চিৎকার প্রথমে আমরাই শুনতে পাই...'

'হ্যাঁ, খবরটা শুনে খুব খারাপ লেগেছে আমার। সেদিন সকালে গিয়েছিলাম ওদের বাড়িতে। প্যারিশ ম্যাগাজিন দিয়ে এসেছি। ওর নাতনী সেগুলো পড়ে শোনায় ওকে। আমি যখন গেলাম, ও তখন চেয়ারে আরাম করে বসে রেডিও শুনছিল। এত জোরে জোরে বাজাচ্ছিল, আমার নিজের কথাও আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না।'

'সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েছিল আপনার?'

'না। তেমন তো কিছু পড়েনি। ম্যাগাজিন রেখে, দু'চারটে কথা বলে বেরিয়ে এসেছি। এত টাকা আসলে বাড়িতে ওর রাখাই উচিত হয়নি। চোরের নজর কি আর আটকানো যায়?'

'তা ঠিক। চোর তো ধান্দায়ই থাকে কখন কি চুরি করবে। যাই হোক, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। চলি।'

'কিন্তু তুমি কি করে জানলে কাল সকালে আমি ওখানে গিয়েছিলাম?' জানতে চাইল মহিলা।

'শুনেছি। যাই, কাজ আছে,' বলে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। রাস্তায় বেরিয়ে সাইকেল চালাতে চালাতে ভাবল,

তালিকা থেকে একটা নাম কাটা। মহিলা যখন গিয়েছিল, বুড়ো জেগে ছিল তখন। রেডিও শুনছিল। তার অলক্ষে টাকাটা সরানো সম্ভব ছিল না মহিলার পক্ষে। আরও একটা ব্যাপার বোঝা গেল, ফগ এখনও আসেনি মহিলার সঙ্গে দেখা করতে। তাহলে বলত।

সোজা মুসাদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো সে। মুসা আর ফারিহাকে পাওয়া গেল না। মুসার আম্মা বললেন, 'ওরা তো মুদির কাছে গেছে। জোর করে যাদের দোকানে পাঠানো যায় না, তারা আজ চাপাচাপি করে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেল সংসারের জিনিস কিনে আনার জন্যে। আশ্চর্য! ছেলেমেয়েগুলোর মাথায় যে কখন কি ঢোকে, খোদাই জানে!'

'ঠিক আছে, যাই তাহলে,' দরজার দিকে ঘুরতে গেল কিশোর।

'এখন গিয়ে দোকানে না-ও পেতে পারো,' মিসেস আমান বললেন। 'বলল, সময় পেলে আইসক্রীম খেতে যাবে।'

'থ্যাংক ইউ,' বলে দ্রুত দরজার দিকে রওনা হলো কিশোর। প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল। পেছনে তাকালে দেখতে পেত, অবাক হয়ে ওর দিক তাকিয়ে আছেন মিসেস আমান। ও বেরিয়ে আসতেই বিড়বিড় করে বললেন, 'সবগুলো পাগল!'

আইসক্রীমের দোকানটাই প্রথমে পড়ে। মুদির কাছে যাওয়ার আগে মুসা আর ফারিহা ওখানে আছে কিনা, দেখে নিতে ঢুকল কিশোর।

আছে। রবিনও আছে ওদের সঙ্গে। কিশোরকে দেখে হাত তুলে ডাকল।

গিয়ে বসল কিশোর। 'তারপর, কি খবর?'

'তোমার কি খবর?' জানতে চাইল মুসা। 'পাদ্রীর বোনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। কথাও বলেছি। মহিলা তালিকা থেকে বাদ। একজন গেল। তোমাদের সঙ্গে মুদির ছেলের কথা হয়েছে?'

'হয়েছে,' জবাব দিল ফারিহা।

'কি বলল?'

'গিয়ে তো দোকানে পেলাম না। দোকানি জানাল, বাইরে মাল দিতে গেছে। আসতে দেরি হতে পারে। কি আর করব। বসে থাকলাম। শেষে এল সে। বলল, সাইকেলের টায়ার পাংচার হয়ে গিয়েছিল। নইলে এত দেরি হত না।'

'তারপর ওকে জিজ্ঞেস করলে সেদিন সকালে ও হারগ্রিবের বাড়িতে গিয়ে কি কি করেছিল?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল মুসা। 'ওই আলোচনা তুলতেই উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। যা জানে, সব গড়গড় করে বলে দিল। রোজকার মতই সামনের দরজায় গিয়ে থাবা দিয়ে জোরে চিৎকার করে বলেছিল—মুদির দোকান থেকে এসেছি। বুড়ো তাকে ভেতরে যেতে বলল। মাল নিয়ে ভেতরে ঢুকল সে।'

'কে কে ছিল তখন ওঘরে?'

'বুড়ো হারগ্রিব আর একটা অল্পবয়েসী মেয়ে। বুড়োর নাতনী। মুদির ছেলেটা তাকে চেনে। ভলিয়ুম সাংঘাতিক বাড়িয়ে দিয়ে রেডিও শুনছিল বুড়ো। সবুজ রঙের কাপড় দিয়ে কোন কিছু সেলাই করছিল বুড়োর নাতনী। ছেলেটাকে বলল, জিনিসপত্রগুলো সব রান্নাঘরে রেখে দিয়ে আসতে। রেখে এল সে।'

'তারপর?'

'তারপর আর কিছু না। কয়েক মিনিট রেডিও শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে দোকানে ফিরে গেল ছেলেটা।'

'হুঁ, জেফের কথার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। সে বলেছে, মুদির ছেলেটা ঘরে বেশিক্ষণ ছিল না। তারমানে টাকাটা সে চুরি করেনি। করার সুযোগই পায়নি, সারাক্ষণ ওঘরে ছিল বুড়ো আর বুড়োর নাতনী। তালিকা থেকে আরেকটা নাম বাদ।'

'নাতনী নিজে চুরি করেনি তো?' রবিনের প্রশ্ন।

'করতে পারে। কিন্তু সে করলে সকাল বেলা যখন এত মানুষের যাতায়াত তখন কেন করবে?' নিজেকেই যেন প্রশ্নটা করল কিশোর। জবাবটাও নিজেই দিল, 'করবে, যারা আসে তাদের ওপর সন্দেহ ফেলার জন্যে। কিন্তু দাদুর এত দেখাশোনা করে সে, এত কাজ করে দেয়, তারমানে দাদুকে ভালবাসে। তার টাকা সে চুরি করবে, এটা বিশ্বাস করা যায় না। তবু, টাকার ব্যাপার। জোর দিয়ে বলাও যায় না কিছুই।'

'বাকি রইল আর তাহলে তিনজন,' ফারিহা বলল।

নোটবুক বের করে একে একে পাদ্রীর বোন আর মুদির ছেলের নাম কেটে দিল কিশোর। মুখ তুলে বলল, 'হ্যাঁ, তিনজন। গাড়িওয়ালা। সুবেশী যুবক, অর্থাৎ হারগ্রিবের ভাতিজা। আর হারগ্রিবের নাতনী। গাড়িওয়ালাকে খুঁজে বের করতে হবে। বুড়োর কাছে তার কি কাজ ছিল, কি সম্পর্ক জানতে হবে। ভাতিজার সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করব, সকালবেলা কিজন্যে চাচার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।'

'ওর ঠিকানা পাবে কোথায়?' জানতে চাইল মুসা।

'ঠিকানা পেয়েছি, জেফের কাছে। বুড়ো হারগ্রিব দিয়েছে। ওর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছিল জেফ। হারগ্রিবের ভাতিজা আর নাতনী একই জায়গায় থাকে—ডিয়ারভিলে। তবে রাস্তা আর বাড়ি আলাদা।'

'কবে যাবে দেখা করতে?' জানতে চাইল ফারিহা। 'আমরা যেতে পারব?'

ভেবে দেখল কিশোর। 'তা যেতে পারো। মন্দ হয় না। অবশ্য বাড়িতে কোন অসুবিধে না থাকলে। ফগ নিশ্চয় এতক্ষণে ওদের সঙ্গে দেখা করে ফেলেছে। আমিও যদি গিয়ে একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকি, সন্দেহ জাগবে ওদের। জবাব না-ও দিতে পারে। কিন্তু সবাই একসঙ্গে গিয়ে যদি কিছু জিজ্ঞেস করি, ভাববে ছেলেমানুষী কৌতূহল। সেজন্যে সবাই যাওয়াই ভাল।'

'কিন্তু লাঞ্চের আগে তো যেতে পারব না,' রবিন বলল। 'আমার এক

আন্টি আসার কথা। একসঙ্গে বসে খেতে হবে, মা বলে দিয়েছে। তিনটার দিকে অবশ্য বেরোতে পারব।'

'ঠিক আছে। তাহলে তিনটায়ই রওনা হব।' মুসা আর ফারিহার দিকে তাকাল কিশোর, 'তোমাদের কোন অসুবিধে নেই তো?'

'না। নেই। খাওয়ার পর বেরোব, অসুবিধে আর কি?'

'বেশ। তাহলে ওই কথাই রইল।'

'কিন্তু দুপুরের তো অনেক দেরি,' ফারিহা বলল। 'এতক্ষণ করবটা কি?'

'চলো, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি। গাড়িটাকে খুঁজি।'

আইসক্রীমের দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তার একপাশ ধরে হাঁটতে লাগল ওরা। যে গাড়িই আসে, নম্বর প্লেটের দিকে তাকায়। কিন্তু ১১১ নম্বর আর মেলে না। শেষে একটা কার পার্কে ঢুকল। প্রতিটা গাড়ির নম্বর দেখতে লাগল নিচু হয়ে হয়ে। সন্দেহ হলো অ্যাটেনডেনটের। জিজ্ঞেস করল, 'এই, কি দেখছ তোমরা?'

'একটা গাড়ি খুঁজছি,' কিশোর বলল। 'একশো এগারো নম্বর।'

'কেন?'

'কাজ আছে।'

সন্দিহান চোখে ওদের দেখতে লাগল লোকটা। বের করে দিতে পারলে খুশি হত। কিন্তু বেআইনী কিছু করছে না ওরা। ঢুকেছেও পাবলিক প্লেসে। কিছুই করতে পারল না সে।

ওখানে নেই গাড়িটা। পার্কিং প্লেস থেকে বেরোতে যাবে ওরা, এই সময় রবিনের চোখে পড়ল ফগকে। 'ওই দেখো কে আসছে।'

মুসা বলল, 'ঝামেলা!'

ঘেউ ঘেউ করে ছুটে গেল টিটু। ফগের গোড়ালি কামড়ানোর জন্যে লাফিয়ে উঠল। ঝট করে পা'টা উঁচু করে ফেলল ফগ। 'ঝামেলা! এই কুত্তা, সর! সর!' থামার ইচ্ছে থাকলেও থামতে সাহস পেল না সে। টিটুর দিকে বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে দ্রুত সাইকেল চালিয়ে চলে গেল।

ফারিহা বলল, 'ঝামেলাও কি গাড়ি খুঁজতে এসেছিল নাকি?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না। পুলিশকে ওভাবে কষ্ট করে গাড়ি খুঁজে বেড়াতে হয় না। লাইসেন্স নম্বর নিয়ে গিয়ে ট্রাফিক অফিসে খোঁজ করলেই মালিক কে, সেটা জেনে যায়। মালিকের নাম জানলে ঠিকানাও পাওয়া যায়। সব কিছু লেখা থাকে রেজিস্টারে।'

পাওয়া গেল না গাড়িটা। কিছুটা হতাশ হয়েই যার যার বাড়ি ফিরে চলল গোয়েন্দারা।

নিজেদের বাড়িতে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল রবিন। গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে একটা গাড়ি। দূর থেকেও দেখতে পেল নম্বরটা। জি এইচ ১১১। অবাক কাণ্ড! যে গাড়িকে সারা গাঁয়ে খুঁজে এসেছে, সেটা এসে বসে আছে ওদেরই বাড়ির মধ্যে। কাকতালীয় ঘটনা আর কাকে বলে!

ব্যাগ হাতে ঘর থেকে বেরোলেন একজন টাকমাথা লোক। হাতে

ডাক্তারি ব্যাগ। ও, তাহলে এই ব্যাপার। ডাক্তার! কল পেয়ে হারগ্রিবকেও দেখতে গিয়েছিলেন নিশ্চয়।

কিন্তু ওদের বাড়িতে আবার কার অসুখ হলো? মা'র না তো? শঙ্কিত হয়ে তাড়াতাড়ি এসে ঘরে ঢুকল রবিন। না, মা ভালই আছেন। অসুখ হয়েছে মারথার। হঠাৎ করে তীব্র পেটব্যথা শুরু হয়েছে। এতটাই বেশি, ডাক্তারকে ফোন করতে হয়েছে। অ্যাপেনডিক্স সন্দেহ করছেন তিনি।

গাড়িতে করে আসা ব্যাগহাতে ভদ্রলোক। আরেকজন সন্দেহভাজনের নাম হারগ্রিবের টাকা-চোরের তালিকা থেকে বাদ পড়ল।

নয়

ঠিক তিনটায় কিশোরদের বাড়ির গেট থেকে যাত্রা করল ওরা। গ্রীনহিলস থেকে ডিয়ারভিল তিন মাইল দূরে। এপ্রিলের সুন্দর বিকেল। খুব ভাল লাগল সাইকেলে করে যেতে।

ডিয়ারভিলে পৌঁছে জুন স্ট্রীটের খোঁজ করল। পেতে দেরি হলো না। নদীর দিকে চলে গেছে রাস্তাটা। জেফরির বাড়িটা ৪১ নম্বর। রাস্তার শেষ মাথায়। লন ঢালু হয়ে নেমে গেছে নদীতে।

বাড়ির সীমানার বাইরে দেয়ালে নিজের সাইকেলটা ঠেস দিয়ে রেখে কিশোর বলল, 'সাইকেল এখানেই থাক। একটু উঁকিঝুঁকি মেরে দেখি জেফরিকে দেখা যায় কিনা।'

দেয়ালের ধার ঘেঁষে এগোল ওরা। সরু একটা রাস্তা পাওয়া গেল, নদীতে নেমে গেছে। সেটা দিয়ে নামতে নামতে চোখে পড়ল তীরে বাঁধা একটা নৌকায় শুয়ে বই পড়ছে হারগ্রিবের ভাতিজা। হলুদ গেঞ্জি আর বাদামী রঙের প্যান্ট পরেছে।

'ওই যে,' নিচু গলায় বলল কিশোর। 'চলো, হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ দেখে ফেলার ভান করি। জিজ্ঞেস করলে বলব, এখানকার নদী নাকি সুন্দর। দেখতে এসেছি।'

ওরা ভান করার আগেই ওদের দেখে ফেলল জেফরি। চিৎকার করে ডাকল। উঠে বসে জিজ্ঞেস করল, 'চাচার বাড়িতে যেদিন সকালে চুরি হলো, তোমাদেরকে দেখেছিলাম না?'

'ও, আপনি,' কিশোর বলল। 'মিস্টার হারগ্রিবের ভাতিজা। বাহ্, চমৎকার জায়গায় শুয়ে বই পড়ছেন তো। দিনটা কিন্তু খুব সুন্দর। সেজন্যেই এতদূরে বেড়াতে চলে এলাম।'

'কোন দিক দিয়ে এসেছ? ওই হাঁদা পুলিশটার সঙ্গে দেখা হয়েছে? এসেছিল এখানে। ওর প্রশ্নের ঠেলায় পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম।'

'ফগ? ঠিকই বলেছেন, এক্কেবারে হাঁদা। নইলে কি আর আপনাকে

সন্দেহ করে। বুঝতে পারছি না বেচারা বুড়ো মানুষটার টাকাগুলো কে মেরে দিল।'

'উঁ!'

'কি বললেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'কিছু না। এতই বোকা ওই পুলিশটা, নাকের ডগায় মাছি বসলেও দেখে না। আমি তাকে বললাম, বহুবার আমার চাচাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি, টাকাগুলো ব্যাংকে রাখার জন্যে। এত টাকা বাড়িতে রাখা নিরাপদ না।...আর বললাম, সেদিন সকালে অনেকেই এসেছিল চাচার বাড়িতে। তাদের মধ্যে কেউ চুরি করেছে।'

'তাই হবে। এক সকালেই এত লোকের যাতায়াত...মিস্টার হারগ্রিবের নাতনীই ছিল সবচেয়ে বেশি সময়।'

'পপি? ওর সঙ্গে আমার বনে না। সেজন্যেই চাচার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ওকে যখন দেখলাম, দেরি না করে বেরিয়ে চলে এলাম। তোমরা তখন ছিলে না। চাচা আমাকে বলে কিনা মাঝেসাঝে পপির কাজে সাহায্য করলেও নাকি পারি। আমি করব ওকে ঘর মোছা আর কাপড় ধোয়ায় সাহায্য! আর লোক পেল না, হুঁহ্! চুপ করে রইলাম। তারপর বলল, নতুন পর্দা সেলাই করেছে পপি। সেগুলো লাগানোয় ওকে একটু সাহায্য করতে। করলাম না। মুখের ওপর বলে দিলাম এসব পচা কাজ আমাকে দিয়ে হবে না।'

'মোট পাঁচজন লোক গিয়েছিল সেদিন মিস্টার হারগ্রিবের বাড়িতে, তাই না?'

'আমি কি করে জানব?' অবাক মনে হলো জেফরিকে। 'লিস্ট করে ফেলেছ নাকি তোমরা?'

'তা একটা করেছি। তাদের মধ্যে ডাক্তারকে বাদ দেয়া যায় প্রথমেই। আপনার চাচার চিকিৎসা করতে গিয়েছিলেন। ডাক্তার ব্রাউনের মত একজন লোক অন্যের বাড়িতে কয়েক হাজার ডলার চুরি করতে যাবেন না। পাদ্রীর বোন আর মুদির ছেলেটার সঙ্গেও কথা বলেছি। বাকি রইলেন আপনার দুজন—পপি আর আপনি। পপি আপনাকে সন্দেহভাজনদের তালিকা থেকে মুক্ত করতে পারে। আপনি পারেন ওকে মুক্ত করতে। ফগ নিশ্চয় এতক্ষণে দেখা করে ফেলেছে পপির সঙ্গে।'

'কি করে করবে? কোথায় জানি চলে গেছে পপি আজ। ফগকে বললাম সেকথা।'

'তাই নাকি। ও। আচ্ছা, মিস্টার হারগ্রিব কোথায় টাকা লুকিয়েছিলেন আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারেন?'

রেগে গেল জেফরি, 'না! কখনও বলেনি আমাকে। বললে তাকে না জানিয়েই টাকাগুলো নিয়ে গিয়ে ব্যাংকে রেখে আসতাম। এখন তো আর সুযোগই নেই। গেছে হাতছাড়া হয়ে।'

'কিন্তু নিল কে, বলুন তো?'

দ্বিধা করল জেফরি। 'বলাটা ঠিক হবে না। তোমরা ছেলেমানুষ। মুখ বন্ধ

রাখতে পারবে না।'

ছেলেমানুষ বলাতে রেগে যাওয়ার ভান করল মুসা। 'ইচ্ছে না করলে বলবেন না! কিশোর চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে। বকবক করার চেয়ে ঘুরতে এসেছি, ঘুরি।'

'হ্যাঁ, চলো,' কিশোর বলল।

'আহা, রাগ করছ কেন?' জেফরি বলল। 'শোনো, আমার ধারণা পাদ্রীর বোন, মুদির ছেলে, ডাক্তার—এদের কেউই টাকাগুলো নেয়নি। আমি তো জানিই না কোথায় রেখেছিল চাচা। বাকি রইল কে? বুঝতে পারছ কিছু?'

পপি চোর, এটাই বোঝাতে চাইছে জেফরি। আর কিছু জানার নেই তার কাছে। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে সাইকেলের কাছে ফিরে এল ওরা। সাইকেল চালিয়ে এল একটা ছোট কাফেতে। জায়গাটা ওদের পছন্দ। আগেও এসেছে। কাফেতে ঢোকার আগে আর মুখ খুলল না কেউ।

বিকেলের এসময়টায় ভিড় বিশেষ থাকে না। তাই কথা বলতে অসুবিধে হলো না।

রবিন বলল, 'জেফরি টাকা নেয়নি। পপি ওকে দেখতে পারে না। টাকা বের করতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে বলে দিত বুড়োকে।'

'তারমানে জেফরি চোর নয়,' মুসা বলল। 'তাহলে কে?'

'মনে তো হচ্ছে পপিই নিয়েছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'কিন্তু একটা ধাঁধা কিছুতেই মেলাতে পারছি না। টাকা চুরির পর রাতের বেলা আসবাব চুরি করল কে?'

'আসলেও,' রবিন বলল, 'অত সস্তা জিনিস কেন চুরি করতে গেল, সেটা আমার মাথায়ও ঢুকছে না?'

কোক আর বিস্কুটের অর্ডার দিল কিশোর। খেয়েদেয়ে বেরোল পপির খোঁজ নিতে। ওর বাড়ির ঠিকানাও জানে। ফিরেছে কিনা দেখতে চলল।

গিয়ে দেখা গেল বাড়িটা একটা ছোট বোর্ডিং হাউস। বেল বাজাতে দরজা খুলে দিল একজন মাঝবয়েসী মহিলা।

'পপি আছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'মনে হয় না। তবু আমি দেখে আসি। এসো, বসো তোমরা।'

ড্রইংরুমে ওদের রেখে চলে গেল মহিলা। এক বৃদ্ধা বই পড়ছে ওখানে বসে। ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'কারও সঙ্গে দেখা করতে এলে বুঝি?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কিশোর। 'পপির সঙ্গে।'

'ও, পপি। খুব ভাল মেয়ে। আমার মত একজন বুড়ির সঙ্গেও ভাল ব্যবহার করে। মিষ্টি করে হেসে কথা বলে। আমার খুব ভাল লাগে ওকে।'

'শুনলাম তিন মাইল দূরে গিয়ে গিয়ে দাদার সমস্ত কাজকর্ম করে দিয়ে আসে ও?' পপির ব্যাপারে আরও কিছু জানার জন্যে বলল কিশোর।

'হ্যাঁ। দাদুকে খুব ভালবাসে। তাকে নিয়ে বড়ই চিন্তা মেয়েটার। বুড়ো মানুষ। কানে শোনে না, চোখে দেখে না ঠিকমত। মাঝে মাঝেই ভালমন্দ

এটা-ওটা রান্না করে নিয়ে যায়। ওর কাপড় কেঁচে দেয়, ইস্ত্রি করে দেয়। ঘরের ধোয়ামোছার কাজ সবই করে। আমাকে এসে সব বলে।'

ফারিহা বলল, 'তাহলে তো দাদুকে সত্যি খুব ভালবাসে।'

'দাদুর একা থাকাটা মোটেও পছন্দ নয় ওর। কিন্তু কি করবে? কত বলেছে, আসতে রাজি হয় না বুড়ো।' নড়েচড়ে বসল বৃদ্ধা। 'শুনলাম, বুড়োর জমানো সমস্ত টাকা নাকি চুরি হয়ে গেছে। বেচারা। পপি তো খুব মুষড়ে পড়েছে।'

দরজার দিকে ঘন ঘন তাকাতে লাগল কিশোর। মহিলা আসতে এত দেরি করছে কেন? ওদের কথা কি ভুলে গেল? দেখে আসা দরকার। রবিন আর মুসাকে বসতে ইশারা করে চুপচাপ উঠে রওনা হলো দরজার দিকে। প্যাসেজে বেরোতে কথা কানে এল। কার্পেট বিছানো হলওয়ে ধরে সেদিকে এগিয়ে চলল।

কাঁদো কাঁদো গলায় বলছে এক মহিলা, 'কি করব আমি বুঝতে পারছি না। পপি বাইরে গেছে একথা বলে পুলিশকে তো কোনমতে ভাগালাম। ছেলেমেয়েগুলোকে কি বলব? কোথায় যে গেল মেয়েটা! আমাকে না বলে দুদিন কোথাও গিয়ে থাকে না। সত্যি কি তাহলে টাকা নিয়েই পালাল...'

'কি যে বলো। পপি করবে ওর দাদুর টাকা চুরি। ও ওরকম মেয়েই নয়,' মহিলাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বলল আরেক মহিলা। 'আমার মনে হয় আর একটা দিন দেখে ও যে না বলে উধাও হয়েছে একথা পুলিশকে তোমার জানিয়ে দেয়া উচিত।'

'ওরা কি বিশ্বাস করবে? ভাববে সত্যি সত্যি টাকা চুরি করে পালিয়েছে সে। পত্রিকায় ছেপে দেবে। মান-ইজ্জত সব যাবে।' ফুঁপিয়ে উঠল কণ্ঠটা। 'ওহ্, পপি! এত ভাল থেকেও তোর কেন যে এই দুর্ভাগ্য হলো!'

দ্রুত ড্রইংরুমে ফিরে এল কিশোর। উদ্বিগ্ন। অনেক বেশিই জেনে ফেলেছে। এতটা আশা করেনি। কোথায় গেল পপি? সত্যি টাকা চুরি করে পালিয়েছে? সবাই ভাল বলছে মেয়েটাকে। ও টাকা চুরি করেছে, এটা বিশ্বাস করতে চাইছে না। তাহলে না বলে নিখোঁজ হলো কেন পপি?

ফিসফিস করে রবিনকে বলল কিশোর, 'এখানে আর বসে থাকার দরকার নেই। চলো।' বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা যাই। পপিকে যিনি ডাকতে গেলেন তিনি এলে বলবেন, দেরি করতে পারলাম না। থ্যাংক ইউ।'

মাথা ঝাঁকাল বৃদ্ধা। ছেলেমেয়েগুলোকে খুব পছন্দ হয়েছে তার। এত ভদ্র। এত সৌজন্য জানে। ভাল শিক্ষা দিয়েছে ওদের বাবা-মা। আজকালকার ছেলেমেয়েরা তো ভাল শিক্ষা পায়ই না। বেশির ভাগ বেয়াদব।

বারান্দার থাম থেকে টিটুর শেকলটা খুলে নিল কিশোর। বাঁধা থাকতে একটুও ভাল লাগছিল না ওর। ছাড়া পেয়ে খুশি হলো।

কিশোর এভাবে বেরিয়ে আসাতে সবাই খুব অবাক হয়েছে। জানার জন্যে অস্থির।

নিচু স্বরে সাবধান করল কিশোর, 'চুপ! একটা কথাও নয় এখানে। জরুরী খবর আছে।'

সাইকেলে চাপল ওরা। একটা নির্জন রাস্তায় এসে থামল কিশোর। দেখাদেখি সবাই নামল সাইকেল থেকে। রাস্তার পাশে কাত করে রেখে কিশোরের মুখোমুখি বসল।

'পপি নিখোঁজ,' খবরটা জানাল কিশোর। 'আড়ি পেতে ওর মা আর আরেক মহিলার কথা শুনে এলাম। খুব ভয় পেয়েছে ওরা। বিশ্বাস করতে পারছে না টাকাটা পপি চুরি করেছে। কিন্তু এটাও বুঝতে পারছে না চুরি না করলে পালাল কেন? তোমাদের কি মনে হয়?'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'অবস্থা দেখে তো যে কেউ সন্দেহ করে বসবে পপিই টাকা নিয়ে পালিয়েছে। তার পক্ষে নেয়াটাও খুব সহজ। দাদার সঙ্গে খাতির বেশি, তার কাজ করে দেয়, ঘরে থাকে। টাকাটা কোথায় লুকিয়েছে ওর দাদা জেনে নেয়াটাও কঠিন কিছু নয়।'

'হ্যাঁ। টাকা চুরি করা ছাড়া ওর পালানোর আর কোন যুক্তিও খুঁজে পাচ্ছি না।' ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'ও ফিরে না এলে বেশিদূর আর এগোতে পারব না আমরা। দুটো অতি জরুরী তথ্য জানা নেই আমাদের—কোথায় গেল পপি, এবং কেন গেল? আরও একটা প্রশ্ন, চুরি করা আসবাবগুলোই বা কোথায়? শুরুতে এত হেলাফেলা করলাম কেসটাকে। এখন তো রীতিমত জটিল একটা রহস্য মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

'আর আমার মনে হচ্ছে,' মুসা আরেক ধাপ বাড়িয়ে বলল, 'এই রহস্যের সমাধান কেউ করতে পারবে না। পপি এলে ওর সঙ্গে কথা বলা গেলে তবেই সম্ভব। চলো, বাড়ি ফিরে যাই। আর আমাদের কিছু করার নেই।'

নিরাশ হয়ে গ্রীনহিলসে ফিরে চলল ওরা। পপিই টাকা চুরি করে পালিয়েছে, এই সহজ কথাটা কেউ মানতে পারছে না ওরা। পারত, যদি আসবাবগুলো চুরি না হত। রাত দুপুরে মেয়েমানুষ হয়ে এতগুলো ভারী জিনিস চুরি করা পপির পক্ষে সম্ভব নয়। একা তো কোনমতেই নয়।

'হাজার ডলার বাজি ধরতে রাজি আছি,' যেতে যেতে ফারিহা মন্তব্য করল, 'এই রহস্যের সমাধান করার সাধ্য আমাদের ঝামেলার‍্যাম্পারকটের হবে না!'

দশ

সেদিন বিকেলে খুব চুপচাপ হয়ে রইল কিশোর। ওদের বাড়ির বাগানের ছাউনিতে বসেছে সবাই। টিটুর গলা জড়িয়ে ধরে আনমনে আদর করছে ফারিহা।

'কিশোর, তোমার কি দুশ্চিন্তা হচ্ছে?' জানতে চাইল রবিন।

'দুশ্চিন্তার চেয়ে বেশি লাগছে অবাক। আমিও বিশ্বাস করতে পারছি না দাদার টাকা মেরে নিয়ে পালিয়ে যাবে পপি। জেফরি টাকাগুলো নেয়নি। কোথায় রেখেছিল হারগ্রিব, জানেই না সে। দেখলে না কেমন রেগে উঠল? রাগটা আসল।'

'তাহলে অন্য কোন লোক আছে, ষষ্ঠ কেউ, যে টাকাগুলো চুরি করেছে? যার কথা আমাদের বলতে পারেনি জেফ?'

'হতে পারে। বাংলোর পেছন ঘুরে এমন কোনওখান দিয়ে গেছে সেই লোক, দেখতে পায়নি জেফ। জানালায় বসে সে কেবল সামনের দিকটা দেখে, পেছনে দেখে না।'

'হ্যাঁ, এটা ঠিক,' মাথা দোলাল রবিন। 'তা ছাড়া আরও একটা ব্যাপারে গুরুত্ব দিইনি আমরা—জেফ বুড়ো মানুষ। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা একনাগাড়ে জানালার কাছে বসে থাকতে পারে না সে। কখন কোন ফাঁকে ওর চোখ এড়িয়ে চোরটা হারগ্রিবের বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল কে জানে।'

'কিন্তু বুড়ো হারগ্রিব আর কারও নাম বলেনি। সব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেছে জেফ। ওই পাঁচজন ছাড়া সেদিন সকালে আর কেউ তার ঘরে ঢুকে থাকলে নিশ্চয় বলত জেফকে।'

'ও তো কথা গুলিয়ে ফেলে। মনেই হয়তো নেই। জাহান্নামে যাক বুড়ো আর তার টাকা!' বিরক্ত হয়ে বলল মুসা। 'মাথাটাই গরম হয়ে গেল! চলো, খেলিগে। মাথা ঠাণ্ডা হোক।'

'নাহ্, এত তাড়াতাড়ি হাল ছাড়ছি না আমি,' কিশোর বলল। 'এর একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়ব না। কোথাও কোন একটা সূত্র আছে, যেটা এই রহস্যের চাবিকাঠি। সেটা জানা গেলেই...'

'জানার আর বাকি আছে নাকি কিছু? টাকাগুলোও গেছে। পপিও গেছে। দাদার টাকা নাতনীতে নিয়েছে। আমাদের কি?'

'আচ্ছা,' ফারিহা বলল, 'এমন হতে পারে না, টাকাগুলো এখনও হারগ্রিবের বাড়িতেই আছে, ও খুঁজে পায়নি?'

'সবখানে খুঁজেছি,' কিশোর বলল। 'ছোট্ট বাড়ি। ছোট ছোট ঘর। চিমনি আর মেঝের পাটাতন বাদ দিলে টাকা লুকানোর আর তেমন কোন জায়গাই নেই। আসবাব যা ছিল, তা-ও গেছে। বুড়োর লোহার চারপায়া, একটা চেয়ার, একটা ছোট টেবিল আর টেবিল ল্যাম্পটা ছাড়া আর কিছু নেই। স্টোভের মধ্যেও টাকা লুকানো যাবে না, গরম হলেই পুড়ে শেষ...'

'উনানের ছাই ঘেরা দেয়ার জায়গাটাও আছে,' ব্যঙ্গ করল মুসা। 'ছাইয়ের মধ্যে লুকিয়েছিল হয়তো হাঁদা বুড়ো। কিপটের ধন ওভাবেই যায়। এমন বেকুব এই যুগে কয়টা আছে, যে ব্যাংককে বিশ্বাস করে না!' মাথা নাড়তে লাগল মুসা। হাত নেড়ে যেন ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইল সব, 'দূর, আমার মাথা একেবারে গরম হয়ে গেছে! এসব আলোচনা আর সহ্য করতে পারছি না। দয়া করে বেরোও এখন সবাই খানিকক্ষণ দৌড়াদৌড়ি করি। গা গরম করলে মাথা ঠাণ্ডা হবে।'

'বহুত তো সাইকেল চালিয়ে এলাম,' কিশোর বলল, 'আর কত গরম করব?'

'তাহলে তুমি বসে বসে মাথা গরম করতে থাকো। আমি যাই।'

'ঠিক আছে, চলো,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে দাঁড়াল কিশোর।

বাইরে বেরিয়ে মুসার মতই হাঁপ ছাড়ল টিটু। এমন সুন্দর বিকেলে ঘরে থাকতে কি ভাল লাগে। নেচে নেচে একবার আগে একবার পিছে চলতে লাগল।

সবার আগে আগে হাঁটছে মুসা। মোড় ঘুরতেই ধাক্কা খেল একটা হোঁৎকা দেহের সঙ্গে। খেঁকিয়ে উঠল ফগ, 'আহ্, ঝামেলা! দেখে চলতে পারো না?'

'সরি, মিস্টার ফগ...'

'ফগর‍্যাম্পারকট!...অ্যাই, কুত্তা সামলাও!'

'টিটু, থাম!' ধমক দিল কিশোর। খোশালাপ শুরু করল ফগের সঙ্গে, 'তারপর, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট, হাঁটতে বেরিয়েছেন বুঝি? বৈকালিক ভ্রমণ? চুরির রহস্যটার সমাধান কিছু করতে পারলেন?'

'তা আর পারব না কেন?' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ফগ। 'এটা কোন রহস্যই নয়। অতি সাধারণ ব্যাপার। পপি।'

মাথায় বাজ পড়েছে যেন কিশোরের, এমন ভঙ্গি করে ফেলল মুখের, 'পপি! বলেন কি? ও নিশ্চয় টাকা চুরি করে পালায়নি?'

জাম্বুরার মত গোল মুখখানি বিমল হাসিতে ভরিয়ে তুলে ফগ বলল; 'কাল সকালের কাগজেই সব দেখতে পাবে।'

'টাকাগুলো পাওয়া গেছে?'

'কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করেই দেখো না। নাকি ধৈর্য ধরতে কষ্ট হচ্ছে?' মিটিমিটি হাসছে ফগের গোলআলুর মত চোখ।

এই একটি বার বিচ্ছু ছেলেমেয়েগুলোকে টেক্কা দিতে পেরেছে সে। তার সঙ্গে টক্কর লাগতে এসে হেরে গেছে। এখনও বুঝতেই পারেনি টাকাগুলো কে নিয়েছে। মনের আনন্দে বিশাল গোঁফে চুমরি কাটতে কাটতে হেঁটে চলে গেল সে।

'ও কি সত্যি সত্যি রহস্যটার সমাধান করে ফেলেছে?' বিশ্বাস করতে পারছে না রবিন।

'জানতে হলে কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে আমাদের,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর।

ওর হাত আঁকড়ে ধরল ফারিহা, 'কচু করেছে, তাই না? তুমি যেটা পারোনি, ফগ করবে সেটার সমাধান!'

'কাল সকালেই জানা যাবে,' একই ভঙ্গিতে বলল কিশোর।

এগারো

পরদিন সকালে উঠেই আগে খবরের কাগজে চোখ বোলাল কিশোর। সামনের পাতায় কিছু নেই। তবে ভেতরের পাতায় বেশ বড় করে ছেপেছে খবরটা। তাতে বুড়ো হারগ্রিবের টাকা চুরি এবং রাত দুপুরে আসবাব গায়েব হওয়ার ঘটনা বিস্তারিত লেখা হয়েছে। পপিকে সরাসরি চোর বলা হয়নি। কিন্তু যে কেউ পড়লেই বুঝবে, চোর তাকেই বোঝানো হয়েছে।

'ব্যস, পপির শান্তি শেষ,' আনমনে মাথা দুলিয়ে নিজেই নিজেকে বলল কিশোর, 'শুরু হবে এখন পিছে লাগা। পপিকে খুঁজে বেড়াবে সবাই। সাধারণ লোকে, পুলিশ...'

আচ্ছা, ওর মা কি পুলিশকে বলে দিয়েছে তার মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার কথা? আসল কথাটা মাথায় ঢুকছে না কেন আমার? কোন সূত্রটা মিস করছি? কোনটা?

পত্রিকা নামিয়ে রেখে ভাবতে লাগল সে। আবার একবার যেতে হবে ফিয়ার লেনে। হারগ্রিবের ঘরটা দেখতে। কোন সূত্রটা মিস করেছে, জানতে হবে। কাউকে সঙ্গে নেয়া চলবে না। সবাই মিলে ঢুকতে গেলে ঝামেলা হতে পারে। দল বেঁধে চলতে দেখলে লোকের চোখ পড়ে। একা যাবে। তবে টিটুকে নেয়া যেতে পারে।

নাস্তা সেরেই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। ফিয়ার লেনে এসে জেফের কাছে হারগ্রিবের বাড়ির চাবিটা চাইল।

'বুড়োকে ডিয়ারভিলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে,' জেফ জানাল। 'কাল রাতে ওর আত্মীয়-স্বজনরা এসে জোর করেই ধরে নিয়ে গেছে।'

'পপি যে গায়েব হয়েছে ওদের কাছে শোনেনি? শুনে রাগারাগি করেনি?'

'গোপনে কিছু কথা জানিয়ে গেছে সে আমাকে। তোমাকে বলি। পপি নাকি জানত টাকাগুলো কোথায় লুকানো ছিল। নাতনীকে বলেছিল বুড়ো। কসম কাটিয়ে নিয়েছিল যাতে কখনও কাউকে না বলে।'

গুঙিয়ে উঠল কিশোর। 'পপির জন্যে এটা আরও খারাপ হলো। এখন যে শুনবে সে-ই বলবে পপি নিয়েছে। পুলিশ তো আকারে-ইঙ্গিতে বলেই দিয়েছে, টাকাগুলো সে চুরি করেছে। অবশ্য পুলিশ মানে আমাদের ফগ। ওর কথায় গুরুত্ব দেয়ার কোন কারণ নেই...যাই হোক, দেখি কি করা যায়। দিন চাবিটা। শেষবারের মত দেখে আসি কোন সূত্র পাওয়া যায় কিনা।'

চাবি বের করে দিল জেফ।

হারগ্রিবের বাড়িতে এসে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল কিশোর। জানালার পর্দা টেনে দেয়া। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। সুইচ টিপে আলো জ্বালল সে।

তাতেও অন্ধকার পুরোপুরি না কাটায় সূর্যের আলো ঢোকার জন্যে পর্দা সরিয়ে দিল।

মনে পড়ল, চুরির দিন সকালে পর্দা ইস্ত্রি করছিল পপি। টাকা চুরি করে পালানোর ইচ্ছে থাকলে এসব কাজ করতে যেত না সে। বরং তাড়াতাড়ি টাকাগুলো হাতিয়ে নিয়ে কেটে পড়ার চেষ্টা করত। নাহ্, মাথায় কিছু ঢুকছে না আমার! কিছুই বুঝতে পারছি না!

সবুজ, নতুন পর্দাগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবতে লাগল সে। ঝুল অনেক বেশি দিয়ে অনেক লম্বা করে বানানো হয়েছে। নিচের হেম সেলাইটাও অনেক বেশি চওড়া। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল তার। চোখে উত্তেজনা ফুটল। তাড়াতাড়ি গিয়ে পর্দা তুলে টিপে দেখল হেম সেলাই দেয়া জায়গাটা।

কড়কড়ে কি যেন লাগল।

এই তো! এই তো পাওয়া গেছে!

ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্যে পকেট থেকে পেননাইফ বের করে হেমের সামান্য একটু জায়গা কেটে দেখল। বেরিয়ে পড়ল একশো ডলারের একটা নোটের কোণা। যাতে না ছেঁড়ে সেভাবে সাবধানে ধরে টেনে বের করে আনল নোটটা। হাতে নিয়ে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ওটার দিকে। ধাঁধাটার সমাধান হয়ে গেছে। বুঝতে অসুবিধে হলো না ওর, জেফরির হাত থেকে বাঁচানোর জন্যেই টাকাগুলোকে আগের জায়গা থেকে সরিয়ে ওখানে লুকিয়েছে পপি। নতুন পর্দা সেলাইও করেছে সেজন্যেই।

টাকাগুলো কি বের করে নিয়ে যাবে? না, থাক যেখানে আছে। যে নোটটা বের করেছিল সেটাও আবার ঠেলেঠুলে আগের জায়গায় ভরে রাখল।

ঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় তালা দিল সে। হাতল ঘুরিয়ে দেখল ঠিকমত লেগেছে কিনা তালাটা। জেফকে সব বলে যেতে হবে। বলতে হবে কড়া নজর রাখতে। দেখতে বলবে গোপনে কেউ ঘরে ঢোকার চেষ্টা করে কিনা। করলে একজনই করবে, জেফরি। কোন সন্দেহ নেই আর এখন।

টাকাটা পেয়ে যেতেই অন্য প্রশ্নগুলোর জবাবও পেয়ে গেছে কিশোর। নিশ্চয় ডুপ্লিকেট একটা চাবি আছে জেফরির কাছে। রাতের বেলা সেটা দিয়ে দরজা খুলে খুব সাবধানে চুপি চুপি চুরি করে আসবাবগুলো তুলে নিয়ে গেছে টাকা কোনখানে লুকানো আছে দেখার জন্যে। কিন্তু পায়নি। আর পায়নি বলেই পপির ওপর তার এত রাগ।

কিন্তু পপি গেল কোথায়? জেফরি কিছু করল না তো? ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে কোথাও? খুন করে ফেলেনি তো?

আসবাব নেয়ার জন্যে ভ্যান এনেছিল জেফরিই। গ্রীনহিলস কিংবা ডিয়ারভিলের কোথাও লুকিয়ে রেখেছে সেটা। গাড়িটা কার? তার নিজের? কি

করে জানা যাবে?

ভাড়া করে আনলে জানাজানি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকত। ধরে নেয়া যায় ভ্যানটা জেফরির নিজেরই। কিংবা ওদের পরিবারের কারও।

আসবাব বয়ে নেয়ার কথা থেকেই চিন্তাটা মাথায় এল কিশোরের—এমনও হতে পারে, পরিবহন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত জেফরিদের পরিবারের কেউ। তাহলে রাতের বেলা কাউকে না বলে ভ্যান সরানো তার জন্যে সহজ হবে। কোথায় খোঁজ নিলে জানতে পারবে ওদের পরিবারের কারও পরিবহন ব্যবসা আছে কিনা?

পপিকে গ্রেপ্তার হওয়া থেকে বাঁচাতে হলে যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। সময় খুব কম। যদি না ইতিমধ্যে মেয়েটাকে জেফরি···

কিন্তু এত অল্প টাকার জন্যে কি একজন মানুষকে খুন করে ফেলবে জেফরি?

জোর দিয়ে কিছুই বলা যায় না। কার মাথায় কখন যে কি ভূত চাপে···

বারো

বাড়ি ফিরেই টেলিফোন ডিরেক্টরি নিয়ে বসল কিশোর। ডিয়ারহিলের হারগ্রিবদের নাম খুঁজতে শুরু করল। পরিবহন কোম্পানি আছে কিনা কোন হারগ্রিবের নামে, দেখতে লাগল।

কয়েকজন হারগ্রিব পাওয়া গেল—আলেক হারগ্রিব, বারট্রাম হারগ্রিব, ক্লড হারগ্রিব, মিসেস ডরোথি হারগ্রিব···

ডিরেক্টরির পাতায় আঙুল রেখে খুঁজছে কিশোর। নামতে নামতে সারির নিচে চলে এল তার আঙুল। হতাশ হওয়া লাগল প্রচণ্ডভাবে। একজন হারগ্রিবও পাওয়া গেল না যার মাল পরিবহনের ব্যবসা আছে। হারগ্রিব নামে কসাই আছে, রুটিওয়ালা আছে, কিন্তু মালামাল বহনকারী কেউ নেই।

আবার একবার দেখতে শুরু করল সে। খুব সাবধানে দেখে দেখে নিচের দিকে নামাতে লাগল আঙুল। বারট্রাম হারগ্রিব—কসাই, এডওয়ার্ড হারগ্রিব—রুটিওয়ালা, হেনরি হারগ্রিব—স্টেবল···অ্যাঁ! স্টেবল! মানে আস্তাবল? ঘোড়া? ঘোড়া দিয়ে কি করে? গাড়ি টানে। গ্রামের লোকে ঘোড়ার গাড়ি দিয়ে মাল টানার কাজটা পুরোপুরি বাদ দেয়নি আজও। কারণ খারাপ রাস্তায় এঞ্জিনের চেয়ে ঘোড়ার ওপরই বেশি নির্ভর করা যায়। তা ছাড়া এঞ্জিনের গাড়ির চেয়ে ঘোড়ায় টানা গাড়ির দাম অনেক কম। ব্যবসা করার জন্যে বেশি পুঁজির দরকার হয় না।

গুড! পাওয়া গেছে!

তাড়াহুড়ো করে ডিরেক্টরিটা টেবিলে ছুঁড়ে রাখতে গিয়ে নিচে ফেলে দিল

কিশোর। বিশাল বইটা মাটিতে পড়ায় ধুপ করে শব্দ হলো। তুলে রাখল আবার। ঘেউ ঘেউ শুরু করল টিটু। বুঝে গেছে তার মনিব এখন বেজায় উত্তেজিত।

হই-চই শুনে ঘরে ঢুকলেন মেরিচাচী। 'কি হয়েছে তোদের? বাড়ি মাথায় করেছিস কেন?'

'এইমাত্র একটা সাংঘাতিক আবিষ্কার করলাম, চাচী!···অ্যাই টিটু, চুপ! চুপ কর! তোকে কে চেঁচাতে বলল?'

'আবিষ্কার করেছিস ভাল কথা। ছাউনিতে গিয়ে চেঁচালেই পারিস।'

'চল, টিটু।'

'যাচ্ছিস কোথায়?'

'কেন, ছাউনিতে।'

'ভুলে গেছিস, তোর নানা আসবে এগারোটার গাড়িতে? তোকে স্টেশনে গিয়ে তাকে নিয়ে আসার কথা বলেছিলাম না?'

নানা মানে মেরিচাচীর বাবা।

'ওহ্হো, ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু চাচী, আমি তো যেতে পারব না।'

'বলিস কি? বাবা আর কোনদিন আসেনি এখানে। আমার তো রান্নাবান্না আছে। তোর চাচা চলে গেছে কাজে। কে আনতে যাবে, বল? তা ছাড়া এলে বাড়িতে একা একা থাকতে ভালও লাগবে না তোর নানার? কথা বলার জন্যেও তো লোক দরকার একজন। তোকে খুব পছন্দ করে···কিশোর, বাবা, সোনামাণিক আমার। লক্ষ্মী বাপ, নিয়ে আয়গে।'

এভাবে অনুরোধ করার পর আর প্রতিবাদ করা যায় না। ঘড়ি দেখল কিশোর। ট্রেনের সময় হয়ে গেছে। একবার ভাবল মুসা আর রবিনকে বলবে ডিয়ারভিলে গিয়ে ভ্যানটার খোঁজ নিতে। কিন্তু ভরসা করতে পারল না ওদের ওপর। গিয়ে যদি কোন গণ্ডগোল করে ফেলে? তীরে পৌছে তরী ডোবাবে। থাক, যা করার সে নিজেই করবে। সাহায্য করার জন্যে ওদের রাখতে পারে বরং। নানা না যাওয়া পর্যন্ত কিছুই করা সম্ভব হবে না। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে টিটুকে বলল, 'চল, টিটু।'

সারাটা দিন নানাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হলো কিশোরের। তাঁকে সঙ্গ দিতে হলো।

'কিরে কিশোর, এত অস্থির লাগছে কেন তোকে?' বৃদ্ধের চোখে মিটিমিটি হাসি। 'নতুন কোনও রহস্য পেয়েছিস নাকি? মনে তো হচ্ছে ওটার শেষ পর্যায়ে আছিস।'

'তা ঠিকই বলেছ।'

'শেষ করছিস না কেন? বাধাটা কোথায়?'

'পরে বলব তোমাকে, নানা। আগে শেষ করে নিই।'

'কিন্তু আমি তো বিকেলের গাড়িতে চলে যাব।'

মনে মনে খুশি হয়ে বলল কিশোর, 'তাহলে তো বাঁচি।' মুখে বলল,

'তাইলে আর কি করব। পরের বার যখন দেখা হবে, তখনই শুনো।'

'হুঁ, তোর তো আবার এরকম পোয়ারোর স্বভাব, সব শেষ না করে মুখ খুলবি না। ঠিক আছে, পরেই বলিস।'

সন্ধ্যা ছয়টার গাড়িতে নানা চলে গেলেন। একটা মুহূর্তও দেরি না করে মুসাদের বাড়িতে ছুটল কিশোর। ভাগ্যক্রমে রবিনকেও পাওয়া গেল ওখানে।

'আরে কিশোর, কি হয়েছে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'তোমার নানা চলে গেছেন নাকি?'

'হ্যাঁ, এইমাত্র গেল। শোনো, দারুণ খবর আছে।'

সব খুলে বলল কিশোর। সকালে হারগ্রিবের বাড়িতে গিয়েছিল। পর্দার হেমের মধ্যে টাকাগুলো পাওয়া গেছে। তার সন্দেহ হারগ্রিবদের কারও মাল পরিবহনের ব্যবসা আছে। ঘোড়ায় টানা ভ্যান ব্যবহার করে সেই কোম্পানি। ওখান থেকে ভ্যান নিয়ে এসে রাতের বেলা আসবাবগুলো তুলে নিয়ে গেছে জেফরি।

কিশোর সেটা খুঁজতে যাবে শুনে রবিন বলল, 'আমিও যাব।'

'আর আমি?' গলা বাড়িয়ে দিল ফারিহা।

'না, তুমি যাবে না। মেয়েদের কাজ নয় এটা। তা ছাড়া এত রাতে তোমাকে বেরোতেও দেবেন না আন্টি। মুসা আর রবিনকেও হয়তো না বলে গোপনে বেরোতে হতে পারে।' দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল কিশোর, 'কি বলো?'

'তা ঠিক,' মুসা বলল। 'মাকে বিশ্বাস নেই। কখন আটকে দেবে কে জানে।'

সঙ্গে যেতে চাপাচাপি করল না আর ফারিহা। জিজ্ঞেস করল, 'হেমের মধ্যে যে টাকা আছে বুঝলে কি করে?'

'ঘর অন্ধকার ছিল। আলোর জন্যে পর্দা সরালাম। হেমের ওপর চোখ পড়ল। অতিরিক্ত ফোলা মনে হলো ওগুলো। টিপে দেখতেই বুঝে গেলাম কি আছে ভেতরে। পপির ওপর থেকে দোষ কেটে গেল এখন। গোপন জায়গা থেকে টাকাগুলো সরিয়েছে ঠিকই, চুরি করেনি, ঘরের বাইরেও নিয়ে যায়নি। অন্য জায়গায় লুকিয়েছে জেফরির হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে।'

'কাজটা তো ভালই করেছে,' রবিন বলল। 'উধাও হয়ে গেল কেন তাহলে?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না। এই একটা ধাঁধাই মেলাতে পারছি না এখনও। তবে সন্দেহ হচ্ছে, পপির উধাও হওয়ার পেছনে জেফরির হাত আছে।'

রাতে খাওয়ার পর অপেক্ষা করতে লাগল মুসা আর রবিন। বাবা-মা শুয়ে পড়ার পর সাইকেল নিয়ে বেরোল। চলে এল কিশোরদের বাড়িতে। গেটের কাছে অপেক্ষা করছে কিশোর। ওদের দুজনের সাড়া পেয়ে সাইকেলে চেপে

বসল। ডিয়ারভিলে রওনা হলো।

টিটুকে সঙ্গে নেয়নি। ঘরের মধ্যে আটকে রেখে এলে চেঁচিয়ে চাচা-চাচীর ঘুম ভাঙাবে। সেজন্যে ছাউনিতে বেঁধে রেখে এসেছে কিশোর। বেরোনোর জন্যে চেঁচামেচি করছিল। কিন্তু আনেনি। রাতের অভিযানে ওকে নেয়াটা ঝামেলা। চুপ থাকতে পারে না।

সাইকেল চালাতে চালাতে কিশোর বলল, 'আস্তাবলটা কোথায় জেনে নিয়েছি আমি। ফোন করেছিলাম। নদীর দিকে নয়। পাহাড়ে।'

গ্রামের প্রান্তে এসে রাস্তার বাতি শেষ। সাইকেলের বাতি জ্বালতে হলো ওদের। নিঃশব্দে এগিয়ে চলল। ডিয়ারভিলে ঢুকে বাঁয়ে নদীর দিকে না গিয়ে ডানে ঘুরল কিশোর। পাহাড় দেখা যাচ্ছে। খুশি হয়ে বলল, 'গুড। চাঁদ উঠছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার কেটে যাবে অনেকখানি।'

পাহাড়ের গোড়ায় এসে নেমে পড়তে হলো। পাহাড়ী পথে সাইকেল চালিয়ে ওঠা বড় কষ্টকর। নেমে হ্যান্ডেল ধরে ঠেলে নিয়ে এগোল। কিছুদূর উঠে বাঁয়ে চলে গেছে একটা শাখারাস্তা। সেটা দিয়ে চলল ওরা।

সামনে বাড়ি দেখা গেল। একটা ঘোড়া ডেকে উঠল। পাতাবাহারের ঝোপের ধারে সাইকেলগুলো রেখে ঝাড়া হাত-পা হয়ে এগোল ওরা।

'ওটাই আস্তাবল,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'চুপচাপ এগোও। শব্দ করবে না।'

কোন মানুষ বেরোল না। আস্তাবলের দরজাগুলো সব লাগানো। পা ঠুকল একটা ঘোড়া। মৃদু ডাক ছাড়ল আরেকটা। রাতের স্বাভাবিক শব্দ।

'ভ্যানগুলো কোথায় রাখে?' এদিক ওদিকে তাকাতে লাগল কিশোর। 'একটাও তো দেখছি না।'

'ওই যে, আরেকটা রাস্তা,' হাত তুলে দেখাল মুসা। 'ভ্যানগুলো ওদিকে আছে কিনা দেখে আসি চলো।'

যে রাস্তা দিয়ে এসেছে ওরা, তারচেয়ে মুসার দেখানো রাস্তাটা চওড়া। আরও ওপরে উঠেছে চাঁদ। উজ্জ্বল জ্যোৎস্না। সামনে অনেকদূর দেখা যায়।

আগে আগে হাঁটতে হাঁটতে আচমকা দাঁড়িয়ে গেল মুসা। নিচের দিকে চোখ। 'অ্যাই, চাকার দাগ। হারগ্রিবের বাড়ির সামনে এই দাগই ছিল কিনা দেখো তো?'

ভালমত দেখার জন্যে পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বালল কিশোর। 'হ্যাঁ হ্যাঁ,' উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। 'ঠিক পথেই এগোচ্ছি। সামনেই কোথাও ভ্যানটা নিয়ে গিয়ে রেখেছে জেফরি।'

তেরো

চাকার দাগ ধরে ধরে বেশ কিছুদূর হাঁটতে হলো। সামনে একটা মাঠ পড়ল। তাতে ঘোড়া নেই, তবে ঘোড়ায় টানা ভ্যান, লরি, গাড়ি, এসব আছে আট-দশটা। সেগুলোর দিকে এগিয়ে গেল ওরা।

ভ্যান আছে মোট চারটে। সবগুলোই খয়েরি রঙ করা। কিশোর বলল, 'বুড়োর চেয়ার-টেবিলগুলো কোনটাতে আছে দেখতে হবে।'

টর্চ জেলে প্রত্যেকটা ভ্যানের মধ্যে দেখা হলো। কিন্তু কোনটাতেই কোন আসবাব নেই। একটার মেঝেতে কিছু খড় পড়ে আছে।

অবাক হলো কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে ভাবতে লাগল। ভ্যানগুলোর চাকায় আলো ফেলে দেখে বলল, 'সব তো পুরানো। নতুন চাকা কই? মাটিতে যে দাগ দেখেছি তার সঙ্গে এগুলোর টায়ারের খাঁজের ডিজাইনও মিলছে না।'

চাঁদের আলোয় পরস্পরের মুখোমুখি হলো ওরা।

মুসা বলল, 'এবার কি? এগোনোর তো আর কোন উপায় দেখছি না।'

'কিন্তু রাস্তায় পরিচিত চাকার দাগ দেখেছি। নিশ্চয় কোথাও না কোথাও আছেই। খুঁজে দেখো আরও। এমন হতে পারে ওই ভ্যানটা খোলা মাঠে না রেখে অন্য কোথাও লুকিয়ে ফেলেছে জেফরি।'

মাঠের ধারে বনের দিকে ঘুরে গেল ওর চোখ। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সেদিকে। প্রচুর ঝোপঝাড়ের মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া একটা কাঁচা রাস্তা চোখে পড়ল। নরম মাটিতে স্পষ্ট চাকার দাগ। টায়ারের ডিজাইনও মিলে যায়। কোন রকম দ্বিধা না করে সেই রাস্তা ধরে এগোতে লাগল কিশোর। পেছনে চলল দুই সহকারী।

ঝোপঝাড় আর জঙ্গলের পরে পথের মাথায় সামান্য একটু খোলা জায়গা। সেখানে পড়ে থাকতে দেখা গেল একটা ভ্যান। দুরুদুরু বুকে এগিয়ে গেল তিনজনে।

কাছে পৌঁছে ভ্যানের গায়ে টর্চের আলো ফেলল কিশোর। খয়েরি রঙ! ঘষা লেগে ছড়ে গেছে একজায়গায়। নিশ্চয় লাইটপোস্টের গায়েই ঘষাটা লেগেছিল। চাকার খাঁজও মিলে গেল।

দরজা ধরে টান দিল কিশোর। তালা দেয়া। 'জানতাম, দেয়াই থাকবে। রবিন, মুসার কাঁধে উঠে ওপরের ওই জানালাটা দিয়ে ভেতরে দেখো তো চেয়ার-টেবিলগুলো আছে নাকি? থাকবে। জানি। তবু, শিওর হও।'

ওপর দিকে করে আলো ধরে রাখল কিশোর। গাড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়াল মুসা। তার কাঁধে চড়ে দাঁড়াল রবিন। জানালাটার কাঁচ ভাঙা। কিশোরের হাত থেকে টর্চটা নিয়ে ভেতরে আলো ফেলেই চেঁচিয়ে উঠল, 'আছে!

সবগুলো!'

'নেমে এসো...'

কিশোরের কথা শেষ হতে না হতেই শোনা গেল একটা চাপা চিৎকার। এতটাই চমকে গেল, গাড়ির কাছ থেকে লাফ দিয়ে সরে গেল মুসা। তাল সামলাতে না পেরে তার কাঁধের ওপর থেকে মাটিতে পড়ে গেল রবিন।

আবার শোনা গেল চিৎকার, 'বাঁচাও! বাঁচাও!'

চারপাশে তাকিয়ে কোথাও কাউকে না দেখে ভয় পেয়ে গেল মুসা। ভাবল রাতদুপুরে বনের মধ্যে ভূতে চিৎকার করছে। কাঁপা গলায় বলল, 'ভ্যান তো পাওয়া গেল, কিশোর। চলো, চলে যাই!'

'কে চিৎকার করছে না দেখেই?' কিশোর বলল, 'আমি জানি কে করছে। পপি। কোথায় আছে তা-ও জানি।' ভ্যানের দরজায় থাবা দিয়ে বলল সে, 'ভয় পাবেন না। বলুন, কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি আমরা?'

এক মুহূর্ত নীরবতা। তারপর কাঁপা কাঁপা একটা মেয়েলী কণ্ঠ বলল, 'কে তুমি?'

'আমি কিশোর পাশা। আপনি কি পপি?'

'হ্যাঁ। তুমি জানলে কি করে? মনে হচ্ছে সৃষ্টির সেই শুরু থেকে বন্দি হয়ে আছি এখানে! জেফরি আমাকে তালা দিয়ে রেখে গেছে। জানোয়ার! বের করতে পারবে?'

'দেখি, তালা ভাঙতে পারি নাকি। জানালা দিয়ে বেরোনোর চেষ্টা করলেন না কেন?'

'করেছি। পারিনি। এত ছোট, বেরোনো যায় না। কাঁচ ভেঙে চিৎকার, ডাকাডাকি সবই করেছি, যদি কেউ শুনতে পায় এই আশায়। চেঁচাতে চেঁচাতে গলা ব্যথাই সার হয়েছে, কেউ আসেনি। নিশ্চয় এমন জায়গায় গাড়িটা রেখে গেছে জানোয়ারটা, যেখানে কোন মানুষ আসে না।'

'দাঁড়ান, এখনই বের করছি আপনাকে।' কোমরে ঝোলানো চামড়ার ছোট ব্যাগ থেকে একটা যন্ত্র বের করল কিশোর। ভ্যানের তালা খোলার জন্যে তৈরি হয়েই বেরিয়েছে সে। সরু মাথাটা ঢুকিয়ে দিল তালার ফুটোয়। কয়েক মিনিট নাড়াচাড়া করতেই খুলে গেল তালাটা। হাতল ঘুরিয়ে খুলে ফেলল দরজা।

গাড়ি থেকে নেমে এল পপি। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। মুক্তির আনন্দে চোখে পানি এসে গেছে। 'থ্যাংক ইউ! বাঁচালে আমাকে! কিন্তু রাতের বেলা এই জঙ্গলে ঢুকতে গেলে কেন তোমরা?'

'সে এক লম্বা কাহিনী। এখন যাবেন কোথায়? আপনার আম্মা আপনার জন্যে কেঁদেকেটে অস্থির হচ্ছেন। ওখানেই যাবেন নাকি? খেয়েছেন কিছু?'

'হ্যাঁ, খাবার আর পানি রেখে গেছে জেফরি।'

'টাকাগুলো কোথায় আছে জানার জন্যে চাপাচাপি করেনি?'

'করেনি আবার।...কিন্তু তুমি এতসব কি করে জানলে? জুয়া খেলার বদভ্যাস আছে ওর। খেলে খেলে সর্বস্বান্ত হয়ে শেষে নিজের বাড়িটাও বন্ধক রেখেছে। আর কোন উপায় না দেখে শেষে টাকা ধার চাইতে গিয়েছিল দাদার কাছে। দেয়নি। তাতে রেগে গিয়ে চুরি করে নেয়ার ফন্দি আঁটে সে। টাকাগুলো দাদা কোথায় লুকিয়েছে, জানতে চেয়েছিল আমার কাছে।'

'আপনি তো জানতেন।'

'হ্যাঁ, জানতাম। তবে কাউকে কোনদিন বলিনি।'

'পর্দার মধ্যে লুকালেন কেন?'

চমকে গেল পপি। 'ও, তা-ও জানো!...যখন বুঝলাম, জেফরি টাকাগুলো চুরি করবেই, সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলাম। ও আন্দাজ করেছিল, আসবাবপত্রের মধ্যেই কোথাও টাকা লুকিয়েছে দাদা। আসলেও লুকিয়েছিল। ওখান থেকে খুঁজে বের করে ফেলবে সন্দেহ করে এমন জায়গায় সরানোর বুদ্ধি করলাম, যাতে জেফরি কল্পনাও না করে ওখানে আছে। দাদা চোখে দেখে না। সেলাই করে যে টাকা লুকাতে পারবে না, ভাল করেই জানে জেফরি। আসবাবের মধ্যে না পেলে ভাববে আমি চুরি করেছি। কিংবা সরিয়ে ফেলেছি। বড়জোর জানার জন্যে আমাকে চাপাচাপি করবে। পর্দার মধ্যে খুঁজতে যাবে না। ও যে রাতের বেলা আসবাব চুরি করবে, আমাকেও ধরে নিয়ে আসার দুঃসাহস দেখাবে, এতটা অবশ্য ভাবিনি। তাহলে আরও সাবধান হতাম। প্রথমে আসবাব চুরি করল। ওগুলোর মধ্যে খুঁজে না পেয়ে শেষে আমাকে ধরে এনে আটকে রাখল এখানে।...কিন্তু এখন বলো, তুমি জানলে কি করে এতসব? এই রাতের বেলা তোমরা জঙ্গলেই বা এলে কেন?'

'চলুন, যেতে যেতে বলছি।'

চোদ্দ

পরদিন সকাল দশটায় ফিয়ার লেনে হারগ্রিবের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর, মুসা, রবিন, ফারিহা আর টিটু। পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খুলল কিশোর।

বেনির বাড়ির জানালায় বসে ওদের দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল জেফ। কিশোরকে ডাক দিল। সে কাছে যেতে বলল, 'তুমি চাবিটা ফেরত দিয়ে যাওনি। ওদিকে হারগ্রিবের ভাতিজা জেফরি এসে চাবি দেয়ার জন্যে চাপাচাপি শুরু করল আমাকে। ঘরের মধ্যে কি নাকি ফেলে গেছে। নিতে হবে। ওর নিজের কাছে যেটা আছে, ডুপ্লিকেট, সেটা ভুলে ফেলে এসেছে বাড়িতে। আমি তো দিতে পারলাম না। রেগেমেগে ডিয়ারভিলে চলে

গেছে ডুপ্লিকেট চাবি আনতে। বলে গেছে শীঘ্রি ফিরে আসবে।'

'তাই, না?' হেসে বলল কিশোর। 'চাবি আনতে গেছে আরেকবার ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখতে, টাকাগুলো কোথাও পাওয়া যায় কিনা।'

'তা তোমরা আবার ঘরে ঢুকছ কেন?'

'ইচ্ছে করলে আপনিও আসতে পারেন, মিস্টার জেফ। চমৎকার একটা নাটক হতে যাচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই।'

'তাই নাকি? তাহলে তো আসতেই হয়। কি নাটক?'

'এলেই দেখতে পাবেন।'

'যাও। আসছি।'

সহকারীদের নিয়ে হারগ্রিবের ঘরে ঢুকল কিশোর।

কয়েক মিনিট পর এল পপি। রাতের চেয়ে অনেকটা সুস্থ লাগছে ওকে। ঘুম ওর চেহারার ফ্যাকাসে ভাবটাও দূর করে দিয়েছে।

'জিনিসপত্র ছাড়া ঘরটা কেমন দেখাচ্ছে, তাই না?' পপি বলল। নজর চলে গেল পর্দার হেমের দিকে। উঁচু হয়ে ফুলে থাকতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর, 'হেম সেলাইগুলো খুব ভালই করেছেন। এখানে তো বসার জায়গা নেই। ভেতরের ঘরে চলে যান। যা-ই ঘটুক, আমি না ডাকলে আর আসবেন না। দয়া করে আমার নাটকটা নষ্ট করবেন না।'

ভেতরের ঘরে চলে গেল পপি।

জানালার পর্দা ফাঁক করে দিল কিশোর। রাস্তার দিকে চোখ পড়তেই হাসি ছড়িয়ে গেল মুখে। ফগ আসছে। গেটের ভেতরে এসে সাইকেলটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে খোলা দরজায় পা রাখল। ছেলেমেয়েদের দেখে অবাক হলো।

'আসুন মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট,' স্বাগত জানাল কিশোর।

ভ্রূকুটি করল ফগ, 'ঝামেলা! তোমরা এখানে কি করছ? জলদি ভাগো। ক্যাপ্টেন আসবেন এখন। সকালেই আমাকে ফোন করে বলেছেন ঠিক সাড়ে দশটায় যেন হাজির থাকি।...আহ্, কুত্তাটাকে সরাও না আমার পায়ের কাছ থেকে!'

'এই টিটু, যা, ওখানে গিয়ে চুপ করে বোস!' ধমক দিল কিশোর। ফগের দিকে ফিরল। 'রহস্যটার সমাধান করে ফেলেছেন মনে হচ্ছে?'

'এর মধ্যে রহস্য দেখলে কোথায়? মেয়েটা টাকা আর আসবাবগুলো নিয়ে ভেগেছে। যাবে কোথায়? ধরা ওকে পড়তেই হবে। ও এখন কোথায়, জেনে ফেলেছি।'

'তাই নাকি? এই গাঁয়েই আছে? নাকি অন্য কোথাও?'

ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বলল ফগ, 'বহুদূরে। তোমাদের সেকথা বলতে যাচ্ছি না। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে। ঝামেলা না করে এখন

ভাগো তো।'

রাস্তায় গাড়ি থামার শব্দ হলো। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কিশোর বলল, 'ওই যে, এসে গেছেন ক্যাপ্টেন।'

বসকে এগিয়ে আনার জন্যে বিশাল বপু নিয়ে থপ থপ করতে করতে দৌড়ে বেরোল ফগ। কালো চকচকে গাড়িটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

নিজেই দরজা খুলে নেমে এলেন ক্যাপ্টেন। অন্যপাশ থেকে নামল সাদা পোশাক পরা পুলিশের আরেকজন লোক।

ছুটে গিয়ে ক্যাপ্টেনকে জড়িয়ে ধরল ফারিহা। চারপাশে ভিড় করে এল কিশোর, মুসা, রবিন। তাঁকে স্বাগত জানাল টিটু।

তাড়াতাড়ি ফগ বলল, 'ভাগানোর অনেক চেষ্টা করেছি, স্যার। গেল না।' গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে ধমকের সুরে বলল, 'এই বিরক্ত কোরো না। বাড়ি যাও এখন।'

'থাক না,' বাধা দিলেন ক্যাপ্টেন। 'ঘরে আসুক আমাদের সঙ্গে। ওরা এমন সব তথ্য জানে, যা আমরা জানি না।'

হাঁ হয়ে গেল ফগ। 'ঝামেলা! নতুন আর কি জানবে ওরা, স্যার? সহজ কেস। মেয়েটা তার দাদুর টাকা চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে। এই বয়েসী মেয়েরা সাধারণত যা করে।'

'কিন্তু আমি তো শুনলাম মেয়েটা খুব ভাল। ও-ই চুরি করেছে তুমি কিভাবে জানলে?'

'পপি চুরি করেনি,' ফগকে অবাক করে দিয়ে বলে উঠল কিশোর। 'কেউ চুরি করেনি ওই টাকা।'

শুনে ফগের তো আক্কেল গুড়ুম। 'ঝামেলা! তুমি আবার এর মধ্যে নাক গলাচ্ছ কেন? টাকাগুলো যদি চুরিই না হয়ে থাকে, গেল কোথায়?'

'পপি লুকিয়ে ফেলেছিল। জেফরির চুরি করে নিয়ে যাওয়ার ভয়ে।'

'হুঁহ্,' গাল বাঁকাল ফগ, 'গাঁজা মারার আর জায়গা পাওনি! বিশ্বাস করব, যদি টাকাগুলো বের করে দেখাতে পারো।' এমন ভঙ্গি করল যেন দীঘির নিচে সিন্দুকের মধ্যে কৌটায় লুকানো দৈত্যের পরাণ ভোমর বের করে আনার মত কঠিন একটা কাজ দিয়ে ফেলেছে।

'বেশ, ঘরে আসুন,' খুব সহজ, সাদামাঠা করে প্রায় তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে জবাব দিল রাজপুত্র, 'দেখাচ্ছি।'

সবাই ঘরে ঢুকলে পর্দার কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। কাঁচি নিয়ে তৈরিই আছে রবিন। তার হাত থেকে কাঁচিটা নিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে পর্দার সেলাই কাটল সে। টেনে বের করে আনল একটা নোট। ফগের দিকে তুলে নাচাতে নাচাতে জিজ্ঞেস করল, 'কি, গাঁজা মনে হচ্ছে এখনও?'

হাঁ হয়ে গেছে ফগ। মুখ বন্ধ করার কথা ভুলে গেছে।

নোটটা ফগের হাতে গুঁজে দিয়ে কিশোর বলল, 'ভাল করে দেখুন তো, আসল না নকল? আরও আছে হেমের মধ্যে। পুরো পাঁচ হাজার। মিস্টার

ফগর‍্যাম্পারকট, আপনার মনে আছে, যেদিন সকালে টাকা চুরি হওয়ায় চেঁচামেচি করছিল মিস্টার হারগ্রিব, সেদিন তার নাতনী নতুন পর্দা লাগিয়ে দিয়ে গেছে? কেন লাগিয়েছে জানেন? সন্দেহ করেছিল, আগের জায়গা থেকে না সরালে...'

'টাকাগুলো চুরি করে নিয়ে যাবে জেফরি, এই তো?' ক্যাপ্টেন বললেন। 'লুকানোর ভাল জায়গা বের করেছিল মেয়েটা। বুদ্ধি আছে।'

ঢোক গিলল ফগ। বলার মত কোন কথা খুঁজে পেল না।

মজা পেয়ে হাসছে জেফ।

কিশোরকে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন, 'আসবাবগুলো কোথায়?'

'ঝামেলা!' নিজের অজান্তেই বেরিয়ে গেল ফগের মুখ দিয়ে।

ওর দিকে ফিরলেন ক্যাপ্টেন, 'তুমি জানো মনে হচ্ছে?'

'না, স্যার, কেউ জানে না!' তাড়াতাড়ি জবাব দিল ফগ। 'কেউ কাউকে ওগুলো নিতে দেখেনি, কেউ জানে না কে নিয়েছে, কেউ জানে না কোথায় নিয়েছে, এই এলাকার কোন জায়গায় খোঁজা আমি বাদ রাখিনি...'

'আরে দম নাও, দম নাও! দম আটকে মরবে তো!' কিশোরের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন, 'তুমি বলতে পারবে নিশ্চয়?'

'পারব, স্যার। জেফরি আর তার এক স্যাঙাৎ মিলে রাতের বেলা এসে চুরি করে নিয়ে গেছে ওগুলো।'

'ঝামেলা!' আবার বলল ফগ। এমনিতেই এটা বলা তার মুদ্রাদোষ। রেগে গেলে কিংবা বেশি উত্তেজিত হলে বলার পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। ঘন ঘন বলতে থাকে তখন। 'মনে হচ্ছে যেন ওই সময় তুমি ছিলে ওখানে!'

'না, ছিলাম না। তবে সূত্র দেখে বুঝেছি ঘোড়ায় টানা ভ্যানে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওগুলো। ভাবলাম, হারগ্রিবদের কারও পরিবহন সংস্থা নেই তো? ডিরেক্টরি দেখে বের করলাম, সত্যি আছে। মুসা আর রবিনকে সঙ্গে নিয়ে রাতের বেলা খোঁজ নিতে গেলাম ডিয়ারভিলে। জঙ্গলের মধ্যে পেয়ে গেলাম ভ্যানটা। তার ভেতরে পেলাম আসবাবগুলো। দেখতে যেতে চাইলে এখনই নিয়ে যেতে পারি।'

'হুঁ! টাকা বের করেছ, আসবাবগুলো খুঁজে পেয়েছ, কিন্তু বাজি ধরে বলতে পারি মেয়েটাকে পাবে না। ও কোথায় আছে জানি আমি।'

অবাক হওয়ার ভান করল কিশোর। 'তাই নাকি! বলুন তো কোথায় আছে?'

'টেক্সাসে চলে গেছে।'

'আহাহা, তাই তো! কি করে জানলেন? আরব্য রজনীর দৈত্য এসে কানে কানে বলে গেছে বুঝি?'

জ্বলে উঠল ফগের চোখ। কিন্তু ক্যাপ্টেনের সামনে কিছু করার সাহস পেল না। 'ইয়ার্কি মারছি ভাবছ?'

'না, তা ভাবছি না। তবে জাদু করে আমি পপিকে এনে দিতে পারি এক্ষুণি। দেখতে চান?' ভেতরের ঘরের দরজার দিকে ফিরে জাদুকরদের ভঙ্গিতে চুটকি বাজিয়ে ডাকল কিশোর, 'পপি, বেরিয়ে আসুন।'

দরজায় এসে দাঁড়াল পপি।

ফগের গোলআলু চোখ কোটর থেকে ছিটকে বেরোনোর জোগাড় হলো। মজা পেয়ে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে জেফের। সাদা পোশাকে আসা অফিসারের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন ক্যাপ্টেন। কিশোরের নাটকীয়তায় তাঁরাও মজা পাচ্ছেন। তবে অবাক হলেন না। আগের রাতে পপিকে খুঁজে পাওয়ার পর বাড়ি ফিরেই ক্যাপ্টেনকে ফোন করেছিল কিশোর। সব জানিয়ে রেখেছে। সকাল সাড়ে দশটায় তাঁকে ফিয়ার লেনে হাজির থাকতে সে-ই অনুরোধ করেছিল।

'কো-কো-কোথায় পেলে ওকে?' তোতলাতে শুরু করল ফগ।

'জা-জা-জ্জাদুর বাক্সে,' হেসে বলল কিশোর। 'ডিয়ারভিলের জঙ্গলে আসবাবগুলোর সঙ্গে তাকেও ভ্যানের মধ্যে আটকে রেখেছিল জেফরি।'

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না ফগ। 'রাতের বেলা তোমরা ওখানে গিয়েছিলে! আমাকে কিছু বললে না কেন?'

'তোমাকে বলে কি হত?' কঠিন হয়ে উঠল ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ। 'তুমি ওদের কথা বিশ্বাসই করতে না। হয়তো উল্টো গিয়ে জেফরিকে জানিয়ে দিতে সব। ও তখন পপিকে অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলত।'

ধসে গেল ফগ। লাল গাল আরও লাল হয়ে গেল। অসহায়ের মত তাকাল জানালার বাইরে। বিচ্ছু ছেলেটা আবার একহাত নিয়েছে তাকে। কি লজ্জা! ক্যাপ্টেনের কাছে লজ্জার আর সীমা নেই!

কিশোরকে বলছেন তখন ক্যাপ্টেন, 'কিশোর, সবই তো করলে। এখন প্রধান আসামী জেফরিকে জোগাড় করে দিতে পারো?'

কিশোর জবাব দেয়ার আগেই দরজার দিকে দৌড় দিল ফগ। কোলাব্যাঙের মত থপ থপ করে বেরিয়ে গেল। অবাক হয়ে তাকাল সবাই। জেফ বলল, 'শক পেয়ে পাগল হয়ে গেল নাকি লোকটা?'

না, পাগল হয়নি। শার্টের কলার চেপে ধরে জেফরিকে টানতে টানতে নিয়ে ঘরে ঢুকল ফগ। ক্যাপ্টেনের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, 'এই যে, স্যার, নিয়ে এলাম!'

তাকে এভাবে টেনে-হিঁচড়ে আনায় প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল জেফরি, কিন্তু পপিকে দেখে থমকে গেল। সাদা হয়ে গেল মুখ। 'তুমি এখানে!'

'কেন, এখনও ভ্যানের মধ্যে আটকে আছি ভেবেছ নাকি?' তিন গোয়েন্দাকে দেখাল পপি। 'কাল রাতেই ওরা আমাকে বের করে নিয়ে এসেছে। পর্দার হেমে সেলাই করে রাখা টাকাগুলোও বের করে দিয়েছে। অতএব দাদুর টাকায় ধার শোধ করা আর তোমার হলো না।'

হঠাৎ ঘুরে দরজার দিকে দৌড় মারল জেফরি। কিন্তু সামনে পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে গেল ফগ। সাদা পোশাক পরা অফিসারও তৈরি ছিল। ধরে

ফেলল। কাঁধ খামচে ধরে ঝাঁকি দিতে দিতে বাঘের মত গর্জে উঠল ফগ, 'যাচ্ছ কোথায়, চাঁদ? অনেক প্রশ্ন আছে আমাদের তোমার কাছে!'

ফগ আর অফিসারকে থাকতে বলে ক্যাপ্টেন বললেন, 'তোমরা প্রশ্ন করতে থাকো। আমি এই ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে একটু ঘুরে আসছি।'

গোয়েন্দাদের নিয়ে বিরাট কালো গাড়িটাতে এসে উঠলেন তিনি। হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন আইসক্রীমের দোকানটাতে যেতে চাও?'

হুল্লোড় করে উঠল ছেলেমেয়েরা।

ফারিহা বলল, 'যে দোকান থেকে বেরিয়ে এসে হারগ্রিবের চিৎকার শুনেছিলাম, সেটাতে।'

'ওখান থেকে বেরিয়ে রহস্যটা পেয়েছিলে বলে?' মিটিমিটি হাসছেন ক্যাপ্টেন। 'দোকানটাকে স্মরণীয় করে রাখতে চাও? তা মন্দ হয় না। তোমার কথাই থাক। চলো, ওখানেই।'

—ঃ শেষ ঃ—

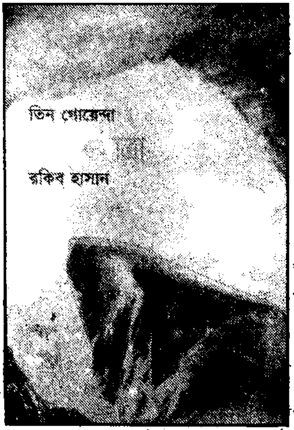

দক্ষিণ যাত্রা

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

'দূর, ওকিমুরো কর্পোরেশন করে লাভ হলো না,' হতাশ কণ্ঠে বলল কিশোর। 'কাজকর্মই যদি পাওয়া না গেল, দরকারটা কি এ সবের?'

বই পড়ছে রবিন, কিশোরের শেষ কথাটা শুধু কানে গেল। 'কি সবের?'

হাই তুলে মুসা বলল, 'তারচেয়ে চলো, ম্যানিলা রিভারে গিয়ে মাছ ধরি। মাছ ধরা, পিকনিক, সময় কাটানো, সবই হবে।'

'কি নিয়ে কথা বলছ তোমরা, তাই তো বুঝতে পারলাম না,' আবার বলল রবিন।

'এই যে, কাজ নেই কর্ম নেই ওকিমুরো কর্পোরেশনের,' জবাব দিল মুসা, 'কিশোর আফসোস করছে...'

'এসে গেছে কাজ,' জানালার কাছ থেকে ঘোষণা করল ওমর। অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। রাস্তায় গাড়ি চলাচল দেখছিল চুপচাপ।

তিনজোড়া চোখ ঘুরে গেল ওর দিকে।

'মানে?' জানতে চাইল কিশোর।

'দুজন লোক ঢুকেছে গেট দিয়ে।'

'ও,' সামান্য উত্তেজনা যা-ও বা তৈরি হয়েছিল, নিমেষে উধাও হয়ে গেল আবার কিশোরের। 'ইয়ার্ডে তো কত লোকই ঢোকে। মাল কিনতে এসেছে। কাস্টোমার।'

'না। বোরিসের সঙ্গে কথা বলল। আমাদের অফিসের দিকে দেখাল বোরিস। সোজা এখন আমাদের অফিসের দিকেই আসছে ওরা। একজন বয়স্ক। চুলের ছাঁট আর পোশাক দেখে নাবিক মনে হচ্ছে। সঙ্গের লোকটা তরুণ। চেনা চেনা লাগছে ওকে। কোথাও দেখেছি।'

'কোথায়?'

'মনে করতে পারছি না। আসুক। তারপর জিজ্ঞেস করব।'

জানালার কাছ থেকে সরে এসে ডেস্কের ওপাশে তার চেয়ারে বসে পড়ল ওমর। হাসিমুখে বলল, 'এসে গেছে আমাদের মক্কেল। কোন সন্দেহ নেই। কোথায় নিয়ে যেতে চায় আমাদের, সেটাই ভাবনার বিষয় এখন।'

'যেখানে খুশি নিক,' মুসা বলল। 'উত্তর মেরু বাদ দিয়ে পৃথিবীর আর যে কোন জায়গায় যেতে রাজি আছি আমি।'

'যদি কুমেরু হয়?' রবিনের প্রশ্ন।

'তাহলে তো আরও বাদ।'
'এই না বললে উত্তর মেরু বাদ দিয়ে পৃথিবীর যে কোন জায়গা।'
'খালি উকালতি প্যাঁচ। আরে ধরে নিলেই তো হয়, উত্তর মেরুতেই যখন যেতে চাচ্ছি না, তারচেয়ে খারাপ কুমেরুতে যাব কেন?'
খোঁচা দিয়ে আরেকটা জবাব দিতে যাচ্ছিল রবিন, টোকা পড়ল দরজায়। ভারী কণ্ঠে জবাব দিল ওমর, 'আসুন।'
ঘরে ঢুকল দুজন লোক। অল্পবয়েসী লোকটা পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা। মোটামুটি সুদর্শন। বয়স্ক লোকটা তার চেয়ে খাটো, পেশীবহুল শরীর, মুখটা কেমন চারকোণা, ঝকঝকে নীল চোখ। গায়ে নীল জ্যাকেট, পিতলের বোতাম, মাথা থেকে খুলে হাতে নিয়েছে রঙচটা পীক্‌ড্ ক্যাপটা।
চেয়ার দেখিয়ে ওমর বলল, 'বসুন। আমার নাম ওমর শরীফ। এরা আমার বন্ধু...কিশোর পাশা...মুসা আমান...রবিন মিলফোর্ড। আমাদের সঙ্গেই দেখা করতে এসেছেন?'
'হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে,' জবাব দিল তরুণ লোকটা। 'আমাকে কি আপনি চিনতে পারছেন, স্যার? আমি রোজার ক্যাম্পবেল। মিডল ইস্টের যুদ্ধে আমি আপনার স্কোয়াড্রনেই ছিলাম, ইরাককে কুয়েত থেকে সরাতে আমরা আমেরিকান এয়ারফোর্সে...মনে নেই?'
চোখ বড় বড় হয়ে গেল ওমরের, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। মরুভূমিতে বিমান নামাতে বাধ্য হয়েছিলাম আমরা। তুমি ছাড়া আরও নয়জন ক্রু ছিল। ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কেন কিছুতেই ধরতে পারছিলাম না। তেলের লাইনের খুঁতটা তুমিই খুঁজে বের করেছিলে...' উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল সে, 'গ্ল্যাড টু মিট ইউ, কর্নওয়েল। চাকরি তো ছেড়ে দিয়েছ নিশ্চয়। সিভিলিয়ান লাইফ কেমন লাগছে?'
'ভাল না, স্যার, বড্ড একঘেয়ে। লস অ্যাঞ্জেলেসে একটা সাইকেলের দোকান দিয়েছি। চলে মন্দ না। কিন্তু এ কাজ কি আর ভাল লাগে? আমার দরকার ইঞ্জিন ঘাঁটাঘাঁটি। কোনমতে সময়গুলো পার করছি আরকি। টিকতে পারব বলে মনে হয় না। অন্য কিছু করতে না পারলে বেচেটেচে দিয়ে আবার হয়তো ফোর্সেই চাকরি নেব ভাবছি।'
'তাই?'
'হ্যাঁ। তবে আপনার কাছে চাকরির জন্যে আসিনি।' সঙ্গের বয়স্ক ভদ্রলোকের দিকে তাকাল রোজার, 'তুমিই বলো না, বাবা।' ওমরের দিকে ফিরল আবার। ভদ্রলোককে দেখিয়ে বলল, 'আমার বাবা, কর্নওয়েল ক্যাম্পবেল।'
তাঁর দিকে তাকাল ওমর, 'আপনি কি নেভিতে নাকি?'
কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন ক্যাম্পবেল, 'ছিলাম। এখনও নাবিকের পেশাটা ছেড়ে দিইনি, তবে বাণিজ্যিক জাহাজ চালাই। লস অ্যাঞ্জেলেসের ওয়াটারফ্রন্টে গিয়ে আমার নাম 'জাম্বু ক্যাম্পবেল' বললে একনামে চিনবে সবাই।'

'জাম্বু কেন?'

হাসলেন ভদ্রলোক। 'চিড়িয়াখানার জন্যে ইনডিয়া থেকে জাহাজে করে একটা হাতি আনার দায়িত্ব পড়েছিল আমার ওপর। কখনও জাহাজে ওঠেনি হাতিটা। সাগরের দুলুনি শুরু হতেই খেপে গেল। কেউ আর সামলাতে পারে না। শেষে আমি গিয়ে সামলালাম, কোন অঘটন না ঘটিয়ে নিরাপদে আমেরিকায় নিয়ে এলাম ওটাকে। সেই থেকে আমি জাম্বু।'

হাসল ওমর। 'তা এবার কি সমস্যা? ডাইনোসর আনার দায়িত্ব পড়েছে নাকি?'

'সেটা হলেও আমি একাই পারতাম, আপনার সাহায্যের প্রয়োজন পড়ত না।' দ্বিধা করতে লাগলেন ক্যাম্পবেল।

'তবে কোন্ জানোয়ার? ডাইনোসরের চেয়ে বড় কিছু আছে বলে তো শুনিনি।'

'না, জানোয়ার-টানোয়ার না।' ছেলের দিকে তাকালেন ক্যাম্পবেল। আবার ফিরলেন ওমরের দিকে। 'সে অনেক কথা, লম্বা কাহিনী।'

'নিশ্চিন্তে বলতে পারেন। আমাদের কোন তাড়া নেই।'

'ইয়ে...একগাদা টাকা পড়ে আছে এক জায়গায়...শুধু তুলে নেয়ার অপেক্ষা।'

আস্তে মাথা ঝাঁকাল ওমর। 'বুঝেছি। গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছেন। তুলে আনতে যেতে চান।'

'অনেকটা সেরকমই।'

'আমাকে কি দরকার?'

আবার দ্বিধায় পড়ে গেলেন ক্যাম্পবেল। 'আপনাকে ছাড়া হবে না।...আমি একা পারব না...'

ছেলে সাহায্য করল বাবাকে। তাঁর হয়ে ওমরকে বলল, 'আপনার কাছে পরামর্শের জন্যে এসেছি, স্যার। কার কাছে যাব ভাবতে প্রথমেই মনে এল আপনার কথা।'

চোখের পাতা সরু করে ফেলল ওমর, 'পরামর্শ মানে কি, সাহায্য?'

শুকনো ঠোঁটে জিভ বোলাল রোজার। 'অনেকটা তাই।'

'গুপ্তধন খুঁজতে গেলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিফল হয়ে ফিরে আসতে হয়, নিশ্চয় জানো সেটা।'

'জানি, স্যার। তবে আর কিছুই না পেলেও মজা তো পাওয়া যায়।'

'মজাটা পেতে বড় বেশি টাকা খরচের প্রয়োজন হয়,' ড্রয়ার থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে ক্যাম্পবেলের দিকে বাড়িয়ে ধরল ওমর। মাথা নাড়লেন তিনি। একটা সিগারেট নিয়ে টেবিলে মাথা ঠুকতে লাগল সে। 'যাকগে। কোথায় আছে এই গুপ্তধন?'

প্রায় মিনমিন করে ক্যাম্পবেল বললেন, 'দক্ষিণ মেরুর কাছে।'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। চট করে তাকাল রবিনের দিকে। মুচকি হাসল রবিন।

বাংলা বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকালেন ক্যাম্পবেল, 'কি বলল ছেলেটা?'

'না, কিছু না,' ওমর বলল। 'আপনি ভুল করছেন না তো? কোন্ পাগলে ওই বরফের মধ্যে সোনা লুকাতে যাবে?'

'সোনার তাল কিংবা বার নয়,' গলায় জোর নেই ক্যাম্পবেলের। 'তবে সোনার জিনিসই।'

'কি? মোহর?'

'না, মুকুট।'

'কি!'

'মুকুট। সোনার মুকুট, হীরা বসানো।'

ভ্রূকুটি করল ওমর। 'কুমেরুতে মুকুট! সত্যি! আপনি দেখেছেন?'

'না।'

'তাহলে জানলেন কি করে?'

'জানি।'

'এখনও আছে ওখানে?'

'হীরা আছে কিনা জানি না, তবে...'

কথাবার্তা যে ভাবে এগোচ্ছে, ছেলের সেটা ভাল লাগল না; বলল, 'খুলে বলো না সব, বাবা।'

তিন গোয়েন্দার দিকে তাকাল ওমর। আগ্রহী হয়ে তাকিয়ে আছে তিনজনেই। আবার ক্যাম্পবেলের দিকে ফিরল সে। 'বলুন।'

পকেট থেকে পুরানো চেহারার রূপার ব্যান্ড লাগানো একটা পাইপ বের করলেন ক্যাম্পবেল। কালো রঙের এক কয়েল ব্ল্যাক প্লাগ টোবাকো থেকে ভয়ঙ্কর দর্শন একটা ছুরি দিয়ে কয়েক টুকরো কেটে নিলেন। পাইপে ঠেসে ভরলেন সেগুলো। বড় একটা তামার লাইটার দিয়ে আগুন ধরালেন তাতে। জোরে টেনে নাকমুখ দিয়ে গলগল করে এত বেশি নীলচে ধোঁয়া বের করতে লাগলেন, মনে হলো তাঁর ভেতরে আগুন ধরে গেছে। আর সেই ধোঁয়ার যা দুর্গন্ধ, সিগারেট আর চুরুটখেকো ওমরও সহ্য করতে পারল না। কাশতে লাগল।

'হ্যাঁ, এইবার হয়েছে,' উজ্জ্বল হলো ক্যাম্পবেলের মুখ। মিনমিনে ভাবটা চলে গিয়ে গড়গড় করে কথা বেরিয়ে এল, দ্বিধা নেই আর, 'বাড়ি ফেরার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম, বুঝলেন, হংকং বন্দরে। জাতে নাবিক, টাকা খরচ করে টিকেট করব কেন? তারচেয়ে একটা জাহাজ খুঁজছিলাম, যেটা আমেরিকায় আসবে; তাতে চাকরি নিলে দেশে ফেরা হবে, নগদ টাকা বাঁচবে, উপরি কিছু আয়ও হবে। বন্দরে আমাকে খোঁজ-খবর নিতে দেখে পোত্রাঘাই নামে একটা লোক এসে দেখা করল আমার সঙ্গে। কত দেশে ঘুরেছি, বিদঘুটে নাম বহু শুনেছি, কিন্তু এমন অদ্ভুত নাম শুনিনি। এ নামের মানেটা যে কি তা-ও জানি না। সুতরাং কোন্ দেশের লোক বুঝতে পারলাম না। সে-ও বলল না। ভাল ইংরেজি বলতে পারে, চেহারাও ফর্সা, কিন্তু ইংরেজ নয়। আমার কৌতূহল

দেখে জানাল, অস্ট্রেলিয়ান, তবে বিশ্বাস হলো না আমার। হংকঙের জাপানীদের সঙ্গে তার বেশ খাতির দেখলাম। ও বলল, তার একটা জাহাজ আছে, চিলির এক কোম্পানির কাছে বিক্রি করেছে, সেটা সান্তিয়াগো বন্দরে পৌঁছে দিতে হবে। বিশ্বাস করলাম তার কথা। না করার কোন কারণ ছিল না। পরে জেনেছি, সব মিথ্যে। আমার সঙ্গে যাত্রী হিসেবে আসতে চাইল সে। জাহাজের মালিককে সঙ্গে না নেয়ার কোন যুক্তি দেখলাম না আমি। তখনও জাহাজটা দেখিনি। দেখতে গিয়ে অবাক। ওটা জাহাজ না জাহাজের অ্যানটিক বোঝা কঠিন। নাম বেত্রাঘাই...'

ফিকফিক করে হেসে ফেলল মুসা, 'বেত্রাঘাত রাখলে ভাল করত, মানে হত।'

ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকালেন আবার ক্যাম্পবেল। ওমরের দিকে ফিরলেন। 'কি বলল?'

'না কিছু না, বাংলা বলেছে। মুসা, একটু চুপ থাকো না। শুনি।' এ কথাটা ইংরেজিতে বলল ওমর, যাতে ক্যাম্পবেল বুঝতে পারেন।

লজ্জিত হলো মুসা। চুপ হয়ে গেল। রবিনের মুখেও হাসি ফুটেছিল, মিলিয়ে গেল।

'নিশ্চয় বেত্রাঘাই নিয়ে রসিকতা করছে,' ক্যাম্পবেল বললেন। 'করবেই। নাম শুনে আমার তো রাগই লাগছিল। পোত্রাঘাইয়ের জাহাজ বেত্রাঘাই একটা ড্যানিশ জাহাজ, আগে নিশ্চয় অন্য নাম ছিল, বদলে ফেলেছে। ইটালিয়ান ইঞ্জিন। দুটো ইঞ্জিনের একটা পুরোপুরি বন্ধ, আরেকটা কোনমতে ধুকধুক করে চলে। দেখে মনে হলো যে-কোন সময় জাহাজের তলা খসিয়ে দিয়ে পানিতে পড়ে যাবে। আমার কালো মুখ দেখে সান্ত্বনা দিল পোত্রাঘাই, কোন চিন্তা নেই, তার জানা একজন ভাল ইঞ্জিনিয়ার আছে, স্কটল্যান্ডে বাড়ি। কথার ভঙ্গিতে মনে হলো, স্কটল্যান্ডে বাড়ি হলেই যেন আর কোন চিন্তা নেই, দুনিয়ার যে কোন বাতিল ইঞ্জিন মেরামত করে ফেলতে পারবে। মানা করে দেব কিনা ভাবছিলাম; আমার মনের ভাব টের পেয়েই যেন মোটা টাকা বেতনের কথা শুনিয়ে দিল পোত্রাঘাই। টাকার অঙ্ক শুনে শেষে রাজি হয়ে গেলাম। ভাবলাম, যা হয় হোকগে, ভাঙা জাহাজ হলো তো আমার কি? আস্তে চলবে, বাড়ি ফিরতে কয়েক দিন দেরি হবে, এর বেশি কিছু না। আমারও তাড়া ছিল না তেমন...'

টান না দিতে দিতে পাইপটা যে নিভে গেছে এতক্ষণে খেয়াল করলেন ক্যাম্পবেল। জ্বেলে নিয়ে আবার শুরু করলেন, 'দিন বিশেক পর যাত্রা শুরু হলো আমাদের। নাবিক জোগাড় করেছিল বটে পোত্রাঘাই একদল—দুনিয়ার হেন ভাষা নেই, আর হেন চামড়ার রঙ নেই, যেটা সে জাহাজে তোলেনি। বন্দরের কাছাকাছি যতগুলো ক্রিমিন্যালকে কুড়িয়ে পেয়েছে, সব তুলে নিয়েছিল সে। এ নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা ছিল না। আমার গুরু ছিলেন জলদস্যুর বংশধর, তাঁর কাছে শিখেছিলাম কোন্ চরিত্রের মাল্লাকে কিভাবে ঠাণ্ডা করে রাখতে হয়। জাহাজে একটা লোকের ওপরই বিশ্বাস ছিল, আমার চীফ ইঞ্জিনিয়ার স্টো

জনহাওয়ার, সেই স্কট ইঞ্জিনিয়ার, বাস্তবিকই লোকটা ভাল ছিল। দুজন জাপানীকেও জাহাজে তুলেছিল পোত্রাঘাই, ওরা নাকি দক্ষিণ আমেরিকায় যেতে চায়। বন্দর ছেড়ে বহুদূরে সরে আসার আগে আমি ওদের কথা জানতেই পারিনি। বন্দরে দেখলে হয় ওদের নামিয়ে দিতাম নয়তো আমি নেমে যেতাম, এটা বুঝেই হয়তো খোলের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল পোত্রাঘাই। খোলা সাগরে এসে বেরোল ওরা, আর বেরিয়েই আমার জান কাবার করা শুরু করল। এমন করে হুকুম দিতে শুরু করল, যেন ওরাই জাহাজটার আসল মালিক। রাগ আরও বেশি লাগল, যখন দেখলাম পোত্রাঘাই কিছুই বলছে না ওদের। এতটাই খটমটে নাম ওদের, উচ্চারণ করতে পারি না; কাছাকাছি যেটা পারি তা হলো ঘেউয়া আর বোকাশুয়া। আমি আরও সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছিলাম, ঘেউ আর বোকা...'

বাংলায় শব্দগুলোর মানে কি হয় ভেবে হেসে ফেলল মুসা। ক্যাম্পবেল তাকাতেই হাসি চাপার চেষ্টা করল। রবিন আর কিশোরের মুখেও হাসি। এবার আর 'কিছু না' বলে চাপা দেয়ার চেষ্টা করল না ওমর। ইংরেজিতে বলে বুঝিয়ে দিল দুই জাপানী 'ভদ্রলোকের' সংক্ষিপ্ত নামের বাংলা মানে কি হয়। শুনে হেসে ফেলল রোজার। ক্যাম্পবেল মুখটাকে গম্ভীর বানিয়ে রাখলেও মনে মনে যে হাসছেন, বোঝা যায়।

'তো যাই হোক,' আগের কথার খেই ধরলেন তিনি, 'শুরুতে অতি সাধারণ একটা সাগরযাত্রাই মনে হলো। চমৎকার আবহাওয়া, সব কিছু ঠিকঠাকমত চলছিল। তারপর জাহাজের যাত্রাপথের দিকে নজর দিল পোত্রাঘাই। গোলমালটা শুরু হলো যখন গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। ব্রিজে এসে আমার সঙ্গে দেখা করল সে, বলল নতুন কোর্স ঠিক করে দক্ষিণে মুখ ঘুরিয়ে দিতে। কেন, জানতে চাইলাম। বলল, মালিকরা আগে গ্র্যাহাম ল্যান্ডে যেতে চাইছেন। চমকে গেলাম। বলে কি! গ্র্যাহাম ল্যান্ডের বরফের মধ্যে গিয়ে কি করবে? পোত্রাঘাই বলল, সেটা ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আরও বলল, অত কথায় কাজ নেই আমার, বাড়তি কাজের জন্যে বাড়তি পয়সা দেয়া হবে। টাকার কথা বলে আর নরম করতে পারল না আমাকে। বিপদের গন্ধ পেলাম। নিচে গিয়ে জনের সঙ্গে কথা বললাম। লক্ষ করলাম, প্রতিটি চোখ নজর রেখেছে আমাদের ওপর। মনে হলো, জাহাজে সবাই জানে, একমাত্র আমরা দুটি লোকই কেবল গ্র্যাহাম ল্যান্ডে যাওয়ার কারণ জানি না। বুঝলাম, রাজি না হয়ে উপায় নেই; যেতে না চাইলেও যেতে বাধ্য করবে ওরা আমাদের। তখনকার মত চুপ হয়ে গেলাম। তবে গোপনে লগবুকে লিখে রাখলাম: জোর করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাদের।

'লম্বা কাহিনী খাটো করি। পনেরো দিন পর বেলিংশাউজেন সী'র বড় বড় আইসবার্গ আর ভাসমান পাথরের চাঁইয়ের মাঝখান দিয়ে পথ করে চলল জাহাজ। তারপর যখন মেরুর বরফ বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আটকে দিল, ব্যঙ্গ করে পোত্রাঘাইকে বললাম, "তারপর? বরফের দৃশ্য দেখা শেষ হলো?" ও চুপ করে থেকে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। ভয়ানক বিপজ্জনক জায়গা ওটা; বরফের

ভাসমান চাঁইয়ের মাঝে যদি কোনভাবে পড়ে যায় জাহাজ, আর দুদিক থেকে এসে চাপ দেয় ওগুলো, দেশলাইয়ের বাক্সের মত চ্যাপ্টা হয়ে যাবে।'

অতীত কথা মনে করে রাগ কমানোর জন্যেই যেন জোরে জোরে পাইপের তামাক খোঁচাতে শুরু করলেন তিনি। আগুনটা উস্কে দিলেন।

'ওদের উদ্দেশ্যটা বুঝতে সময় লাগল না আমার,' বললেন তিনি। 'সীল। সীল পোচিং। বেআইনী ভাবে সীল শিকার করতে গিয়েছে। এ সব প্রাণীহত্যার ব্যাপারগুলো মোটেও ভাল লাগে না আমার। ভীষণ বিরক্ত হয়ে ঝগড়া বাধালাম পোত্রাঘাইয়ের সঙ্গে। তার দুই জাপানী সাঙ্গাত আর দলবলকে জাহান্নামে যেতে বললাম। কিন্তু যত প্রতিবাদই করি না কেন, জাহাজের সবার বিরুদ্ধে আমাদের দুজনের কিছুই করার ছিল না। তবে এটাও জানতাম, আমাকে আর জনকে ছাড়া ওরাও অচল। শিকার করা জানোয়ার বিক্রির টাকা থেকে ভাগ দেয়ার লোভ দেখাল আমাকে পোত্রাঘাই। কানেও তুললাম না। উল্টো হুমকি দিলাম, বাড়ি ফিরে গিয়েই পুলিশের কাছে রিপোর্ট করব। এই কথাটা বলেই করেছিলাম মস্ত ভুল। তখনকার মত চুপ হয়ে গেল পোত্রাঘাই। তবে ওদের শিকার বন্ধ করতে পারলাম না।

'একদিন সীল শিকার করতে গিয়ে ঘণ্টা দুই পরে খালি হাতে ফিরে এল ওরা। মুখ দেখেই বুঝলাম কিছু একটা ঘটেছে। উত্তেজনায় ফুটছে সব ক'জন। ভূতের মত সাদা হয়ে গেছে চেহারা। চোখে কেমন বুনো দৃষ্টি। কি দেখেছে জিজ্ঞেস করলাম। বলল, পুরানো একটা জাহাজ। জানতে চাইলাম, দামী কিছু আছে নাকি ভেতরে। বলল, না। নামটা কি জিজ্ঞেস করলাম, লগবুকে লিখে রাখার জন্যে। বলল, বরফে ঢেকে গেছে, পড়া যায় না। বুঝলাম, মিথ্যে কথা বলছে। জাহাজটাতে কি পেয়েছে ওরা সেটা জানার জন্যে ভীষণ কৌতূহল হলো আমারও। নেমে গেলেই দেখতে পারতাম, কিন্তু আবহাওয়া তখন সাংঘাতিক খারাপ হয়ে উঠেছে। ভয়াবহ তুষার ঝড়ের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। বাতাসে দ্রুত ঠেলে আনছিল ভাসমান আইসবার্গগুলোকে। ওগুলোর মাঝে আটকে গেলে আর বেরোনো লাগত না। জাহাজসুদ্ধ লোক সব মারা পড়তাম। তাড়াতাড়ি আমাকে জাহাজ ছাড়ার নির্দেশ দিল পোত্রাঘাই, যদিও ওখান থেকে সরার একবিন্দু ইচ্ছে ছিল না তার। আমিও ছাড়ার জন্যে তৈরি হয়েই ছিলাম। বলার সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিলাম।'

'সঙ্গে করে জাহাজের একটা জিনিসও আনেনি ওরা?' জানতে চাইল ওমর।

'না।'

'কিন্তু দামী কিছু পেলে তো ফেলে আসার কথা নয়, ওদের যা স্বভাব।'

'এইটাই তো হলো কথা। সহজে আনার মত হলে না এনে ছাড়ত না। নিশ্চয় বড় কিছু, কিংবা এমন কিছু যা আনতে সময় লাগে, ঝড় এসে যাওয়াতে সে-সময়টা আর পায়নি পোত্রাঘাই। আটকা পড়ে মরার ভয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল।

'যাই হোক, কয়েক রাত পর ভীষণ উত্তেজিত হয়ে জন এসে ঢুকল আমার কেবিনে। বলল, "জানেন ভাঙা জাহাজটায় কি পেয়েছে ওরা? সোনার মুকুট, হীরা বসানো।" জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি জানলে কি করে?" জবাব দিল, 'পোত্রাম্বাইয়ের কেবিনের দরজাটা সামান্য ফাঁক হয়ে ছিল, ভেতরের কথা শোনা যাচ্ছিল। জাপানী ভাষায় কথা বলছিল। কিছু কিছু বুঝি আমি। তাতেই বুঝলাম, মুকুটের কথা বলছে ওরা।"

'কিন্তু এরও তো মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না,' ওমর বলল। 'মেরু অঞ্চলে মুকুট নিয়ে যাবে কে? আর যদি কোন কারণে গিয়েও থাকে খোয়া গেলে সেটা গোপন থাকত না, সারা দুনিয়া জেনে যেত। রেফারেন্স বইতে থাকতই। কুমেরুতে কোন বিখ্যাত মুকুট খোয়া গেছে বলে শুনিনি। জনের জানার মধ্যে কোন ভুল ছিল না তো?'

দ্বিধা করলেন ক্যাম্পবেল। 'উঁহু। ও জাপানী শব্দের যা মানে করল, তাতে হয় "স্টারস অ্যান্ড ক্রাউন"। ওর মতে স্টারস মানে হীরা ছাড়া আর কিছু না।'

গভীর মনোযোগে শুনছিল কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে অদ্ভুত হয়ে উঠল চেহারার ভঙ্গি। প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'এক মিনিট, এক মিনিট! স্টারস অ্যান্ড ক্রাউন, তাই না? কোথাও শুনেছি। যাকগে, ভাবতে থাকি। মিস্টার ক্যাম্পবেল, আপনি বলে যান।'

কিশোরের এ ধরনের দুর্বোধ্য আচরণের সঙ্গে পরিচিত নন ক্যাম্পবেল। অবাক হলেন। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে থেকে যেন বোঝার চেষ্টা করলেন ছেলেটা পাগল কিনা। তারপর বললেন, 'যতই বাড়ির কাছাকাছি হচ্ছিলাম ততই কেমন যেন একটা চাপা অস্বস্তি চেপে ধরছিল আমাকে, জাহাজের পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণেই হচ্ছিল এটা। একটা কথা বলে রাখি, বাড়ি মানে ওদের বাড়ি, আমার নয়; আমাকে হংকঙে ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল ওরা। যা-ই হোক, যে দেশের বন্দরই হোক, আমি তখন মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম লোকালয়ে পৌঁছানোর জন্যে। পোত্রাঘাই আর তার দুই সাঙ্গাত পারতপক্ষে আমার সামনে পড়ত না, অন্যান্য নাবিকেরাও জটলা বেঁধে ফিসফাস করত, আমাকে দেখলেই চুপ। শেষে আর থাকতে না পেরে জনকে বললাম, "জন, আমার সন্দেহ হচ্ছে, ওরা আমাদের খুন করতে চায়। আমাদের বিশ্বাস করে না ওরা। যদি তীরে নেমে ওদের কুকর্মের কথা সব বলে দিই, সেজন্যে মুখ বন্ধ করা জরুরী। তুমি সাবধানে থেকো।" আমার সন্দেহ পুরোপুরি ঠিক ছিল। বন্দরে পৌঁছার আগের রাতে ইঞ্জিন রূম থেকে এক ফাঁকে এসে আমাকে বলে গেল জন, "ডেকে থাকবেন। আমি আসছি। জরুরী কথা আছে।" ওর চোখেমুখে উত্তেজনা আর ভয় দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু আর আসতে পারেনি ও। কয়েক মিনিট পর পানিতে ভারী কিছু পড়ার শব্দ শুনলাম। ভাবতেই পারিনি তখন, জনকে ফেলে দিয়েছে ওরা। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও যখন এল না সে, টনক নড়ল আমার। নিচে নামলাম। কোথাও পেলাম না ওকে। ওর কেবিনেও না। কাউকে জিজ্ঞেস করে কোন জবাব পেলাম না। বুঝলাম, এর পরেই আমার পালা। সোজা গিয়ে ঢুকলাম নিজের কেবিনে।

টাকা-পয়সা আর অতি প্রয়োজনীয় টুকিটাকি দু'চারটা জিনিস পকেটে ভরলাম। পিস্তলটা হাতে নিয়ে ডেকে বেরোতেই দেখি ওরা হাজির। একটা মাত্র পিস্তল দিয়ে জাহাজ ভর্তি লোকের সঙ্গে লড়াই করে পারব না। গোটা দুই গুলি চালিয়ে সামনে থেকে ওদের সরিয়ে দিয়ে সোজা গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম পানিতে। গলাকাটা অবস্থায় পড়ার চেয়ে ওভাবে পড়াটা ভাল মনে করেছিলাম। খুব ভাল সাঁতার জানি। গাঢ় অন্ধকারেও অসুবিধে হলো না আমার। তীর কোন্দিকে অনুমান করে সাঁতরে চললাম। বন্দরে পৌছে জাহাজটাকে দেখলাম না। বিদেশ-বিভুঁই। কাউকে কিছু বলতে গিয়ে আবার কোন্ বিপদে পড়ি, এ ভয়ে মুখ বন্ধ রাখলাম। টাকা বাঁচানোর কিপটেমির মধ্যে আর গেলাম না। একটা যাত্রীবাহী জাহাজের টিকেট কেটে সোজা দেশে ফিরে এলাম।'

পাইপের পোড়া তামাক ঝেড়ে ফেলে পাইপটা পকেটে রেখে দিলেন ক্যাম্পবেল। পাশে বসা রোজারের দিকে মাথা নেড়ে বললেন, 'বাড়ি ফিরে ছেলেকে সব বললাম। সে-ই আমাকে পরামর্শ দিল আপনাকে জানাতে, যাতে জাহাজের দামী মালগুলো উদ্ধারের একটা ব্যবস্থা করা যায়। বললাম, যাব কি করে? ছেলে বলল, সে-কথা ভাবার ভারও আপনার ওপর ছেড়ে দিতে। আপনার ওপর ভরসা খুব বেশি ওর। তো, আপনি কি এমন কাউকে চেনেন, যিনি এ কাজে আমাদের সহায়তা করতে পারবেন?'

হালকা এক চিলতে হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল ওমরের ঠোঁটে, 'হুঁ!'

'একটা কথা নিশ্চিত করে বলতে পারি আপনাকে,' ক্যাম্পবেল বললেন, 'মুকুটটা আনতে পারেনি পোত্রাঘাই।'

'আমিও জানি,' যেন ঘোরের মধ্যে থেকে বলে উঠল কিশোর।

ওর দিকে ফিরে তাকালেন বিস্মিত ক্যাম্পবেল। 'তুমি জানো মানে?'

'জানি, তার কারণ,' ধীরে ধীরে বলল কিশোর, 'মুকুটটা এত বড় আর ভারী, বয়ে আনা সম্ভব ছিল না ওদের পক্ষে।'

দুই

কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলেন ক্যাম্পবেল। ছেলেটা সত্যি সত্যি পাগল কিনা, আরেকবার বোঝার চেষ্টা করছেন যেন। 'তুমি কি বলছ আমি বুঝতে পারছি না। মাথায় পরার একটা সোনার মুকুট যত বড়ই হোক, কত আর বড় হবে? একজনের পক্ষেই বয়ে আনা সম্ভব। লুকিয়ে আনার ইচ্ছে থাকলে...'

'মজাটা তো ওখানেই,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর, 'মুকুটটা আদৌ সোনার তৈরি নয়। কাঠের তৈরি।' ক্যাম্পবেলের হাঁ হয়ে যাওয়া মুখের ফাঁকটাকে আরেকটু বাড়িয়ে দিতেই যেন রহস্যময় হাসি হাসল সে। 'ক্যাপ্টেন, আমার ধারণা যদি ভুল না হয়ে থাকে তো যে জাহাজটাকে খুঁজে পেয়েছে ওরা, সেটার

নাম স্টারি ক্রাউন।'

কিশোরের কথা শেষ হওয়ার পরেও পুরো পাঁচ সেকেন্ড তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন ক্যাম্পবেল। তারপর ওমরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছেলেটা কি সব সময় এ ভাবেই রহস্য করে কথা বলে নাকি?' ওমরের মুচকি হাসি দেখে মাথা ঝাঁকালেন। আবার ফিরলেন কিশোরের দিকে। 'ওরকম কোন জাহাজের নাম জীবনেও শুনিনি।'

'খুব অল্প লোকেই জানে ওটার নাম,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'আমি জানি, তার কারণ অব্যাখ্যাত রহস্য নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা আমার পছন্দ। এ সম্পর্কে যত লেখা আমি পেয়েছি, সব পড়েছি। বহুকাল আগে, আমার দাদার-বাবার বয়েস যখন আমার চেয়ে কম ছিল...'

'দাদার-বাবার বয়েস তোমার চেয়ে কম ছিল মানে?'

'মানে আমার এখনকার বয়েসের চেয়ে কম ছিল।'

'ও,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মনে হলো ক্যাম্পবেল।

'ওই সময় জাহাজটা অস্ট্রেলিয়া থেকে লন্ডন রওনা হয়েছিল।'

'তার মধ্যেই ছিল নাকি মুকুটটা?'

'না, মুকুট-টুকুট কিছু ছিল না।'

'মার্লিন মারার স্পাইক দিয়ে আমার মাথায় একটা বাড়ি মারো!' তিক্ত শোনাল ক্যাম্পবেলের কণ্ঠ। 'আমি কোথায় ভেবে বসে আছি বিরাট সম্পদ লুকিয়ে আছে দক্ষিণ মেরুতে, তুলে আনার অপেক্ষায়, তা না, একটা সাধারণ কাঠের জাহাজ...ধুর!'

হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। 'আপনার ধারণায় এক বিন্দু ভুল নেই।'

'ছেলেটা আমাকে সত্যি সত্যি পাগল করে দেবে!' দুই হাতে মাথা চেপে ধরলেন ক্যাম্পবেল। 'যা বলার খোলাখুলি বলো না! এত নাটক করছ কেন?'

চট করে মুসার দিকে তাকাল রবিন। দেখল, মুসাও হাসছে নীরবে।

হাসিটা মুছল না কিশোরের। বলল, 'আমি ভেবেছিলাম স্টারি ক্রাউন নামটা বললেই সব বুঝতে পারবেন। যাকগে, সবাই তো আর চট করে সবকিছু বোঝে না। বুঝিয়ে দিচ্ছি। আপনার ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু স্টার শব্দটা শুনেছেন, আর ক্রাউন। ঠিকমত ভাষা না বুঝলে যা হয়, অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী, তাঁর হয়েছিল তা-ই। ক্রাউনের মানে জানা ছিল, মুকুট, তাতে স্টার অর্থাৎ হীরা বসিয়ে মনে মনে দিব্যি একখান মুকুট তৈরি করে নিয়েছিলেন। আসলে ওরা বলাবলি করছিল স্টারি ক্রাউন জাহাজটার কথা।

'রওনা দেবার সময় স্টারি ক্রাউনের খোলে ছিল এক টন অস্ট্রেলিয়ান গোল্ড—এখন অবশ্য কতটা অবশিষ্ট আছে, নাকি তলা ফেটে পানিতে পড়ে গেছে, বলতে পারব না। পনেরোশো টনের স্কুনার জাতীয় জাহাজ ওটা। মেলবোর্ন থেকে লন্ডন যাবার পথে সমস্ত সোনা নিয়ে গায়েব হয়ে যায়। একজন নাবিকেরও বেঁচে থাকার খবর পাওয়া যায়নি, কারও কোন হদিসই পাওয়া যায়নি আর জাহাজটা হারিয়ে যাওয়ার পর। বীমার টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। বিশ বছর পরে সোর্ডফিশ নামে একটা তিমি শিকারীর জাহাজ স্টারি

ক্রাউনকে আটকে থাকতে দেখে দক্ষিণ মেরুর বরফে। দুর্ঘটনায় পড়েছিল সোর্ডফিশ। সব নাবিক মারা গিয়েছিল ওটার, একজন বাদে, তার নাম লাস্ট। বছর পঞ্চাশেক আগে অস্ট্রেলিয়ায় মারা গেছে সে। বাড়ি ফেরার পরে তার এক বন্ধু ম্যানটনকে বিশ্বাস করে জানিয়েছিল সব কথা। সেই বন্ধু ছিল ব্ল্যাকডগ নামে একটা স্কুনারের মালিক। সোনার লোভ বড় সাংঘাতিক। লাস্ট আর ম্যানটন বেরিয়ে পড়ল গুপ্তধন উদ্ধারে। কুমেরুতে গিয়ে এই জাহাজটাও দুর্ঘটনায় পড়ল। দুটো সচল আইসবার্গের মাঝে পড়ে চাপ খেয়ে চিড়েচ্যাপ্টা হলো। জাহাজের সমস্ত লোক মারা গেল, দুজন বাদে, লাস্ট আর ম্যানটন। আগেই তীরে নেমে পড়েছিল ওরা। তীর মানে, বরফের ওপর। হেঁটে পৌঁছল ওরা স্টারি ক্রাউনের কাছে। জাহাজটাকে যেমন দেখে গিয়েছিল লাস্ট, তেমনই ছিল তখনও। সোনাগুলোও ছিল। কিন্তু সোনা দিয়ে আর কি করবে ওরা? কুমেরুতে বন্দি তখন। বেরোনোর সামান্যতম আশা নেই। স্টারি ক্রাউনের গুদামে খাবার ছিল। ঠাণ্ডার কারণে নষ্ট হয়নি। খাবার থাকাতে বেঁচে গেল ওরা। সময় কাটানোর জন্যে সোনা ভাগাভাগি করত নিজেদের মধ্যে। কয়েক মাসের মধ্যে ভয়াবহ নিঃসঙ্গতায় পাগল হয়ে গেল ম্যানটন। লাস্টকে খুন করার চেষ্টা করল। কিন্তু আত্মরক্ষা করতে গিয়ে লাস্টই খুন করে বসল ম্যানটনকে। অনুশোচনা হতে লাগল। বরফের মধ্যে কবর দিল বন্ধুকে। নিঃসঙ্গতায় পাগল হয়ে ধুঁকে মরার চেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করল। তবে তার চেষ্টাটা একটু বিচিত্র। স্টারি ক্রাউনে ছোট একটা নৌকা ছিল। সেটা মেরামত করে নিল। একটা স্লেজ বানাল। নৌকাটাকে স্লেজে তুলে তাতে কিছু খাবার-দাবার নিল। তারপর বসন্তকালে যখন বরফ ভাঙতে আরম্ভ করল, স্লেজটাকে টেনে নিয়ে রওনা হলো। পানির কিনারে পৌঁছে নৌকা ভাসিয়ে তাতে চেপে বসল। মরল না ও। স্প্রে নামে একটা আমেরিকান তিমি শিকারীর জাহাজ ওকে দেখতে পেয়ে তুলে নিল। এত ভোগান্তির পরও সোনার লোভ ছাড়তে পারেনি লাস্ট। কি করে গিয়েছে ওখানে, বানিয়ে বানিয়ে একটা গল্প শুনিয়ে দিল। বাড়ি ফিরল সে। কিন্তু এত ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে, পুরোপুরি সুস্থ হতে পারল না আর। কয়েক মাসের মধ্যেই মারা গেল। মরার আগে তার এক আত্মীয়কে জানিয়ে গিয়েছিল সোনার খবর। সেই আত্মীয় তার এক বন্ধুকে বলল, বন্ধু বলল আরেক বন্ধুকে। ছড়িয়ে পড়তে দেরি হলো না। সোনার গল্পটাকে পাগল হয়ে যাওয়া লাস্টের প্রলাপ বলে ধরে নিল অনেকেই। যারা বিশ্বাস করল, তারাও আনতে যাওয়ার ঝুঁকি নিল না। সোনা আনতে গিয়ে মরার চেয়ে যেভাবে আছে সেভাবেই বেঁচে থাকাটা ভাল মনে করল ওরা। এরপর ওই সোনা উদ্ধারের আর কোন চেষ্টাই কেউ করেনি কখনও।' ক্যাম্পবেলের দিকে তাকাল কিশোর। 'জাহাজটা যদি আগের মতই এখনও বরফে আটকা পড়ে থাকে, ধরে নেয়া যায় সোনাগুলো আছে ওর মধ্যে। ওগুলো না দেখলে অতটা উত্তেজিত হত না পোত্রাঘাই। সোনার বার অতিরিক্ত ভারী, আর বরফের ওপর দিয়ে বয়ে আনাটা সময়সাপেক্ষ। ওসব কোন কিছুকেই পরোয়া করত না ওরা, নিয়ে আসতই; তুষার ঝড় আর আইসবার্গ বাদ না

সাধলে।'

'লাস্ট আসার সময় সোনা আনেনি?' জানতে চাইল ওমর।

'মনে তো হয় না। যুক্তি কি বলে? আপনি যদি ওর অবস্থায় পড়তেন, কি করতেন? অহেতুক বাড়তি ওজন বহনের কষ্ট করতে চাইতেন? তা ছাড়া এমনিতেই যেখানে প্রাণের ঝুঁকি, সেখানে প্রাণ বাঁচানো ছাড়া ওই মুহূর্তে তখন আর কোন কিছুর কথা ভাববে না কোন মানুষ। আনেনি। আনলে জানাজানি হয়ে যেত। তিমি শিকারীদের নজরে পড়ত ওই সোনা। বেহুঁশ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করেছিল ওরা।' ক্যাম্পবেলের দিকে ফিরল সে। 'জাহাজটার পজিশন নোট করে নিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'পোত্রাঘাইকে বলেছেন?'

'না।'

'কিন্তু লগবুক থেকে সে জেনে নিতে পারে, তাই না?'

'খুব সহজে।'

'বরফ তো নড়াচড়া করে, বিশেষ করে বসন্তে ভাঙা শুরু হলে। জাহাজটার অবস্থান সরে যেতে পারে না?'

'তা তো পারেই। কিন্তু এত বছরে যখন সরেনি–কিংবা সরলেও আমাদের জানার কথা নয়–না সরার সম্ভাবনাই বেশি। হয়তো মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে আটকানো বরফে আটকা পড়েছে ওটা। একটা কথা ঠিক, কুমেরুতে যত বরফই থাক, তলায় কোথাও না কোথাও মাটি আছেই।'

খস করে দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাল ওমর। 'তারমানে সোনাগুলো এখনও আগের জায়গাতেই আছে, যদি ইতিমধ্যে পোত্রাঘাইরা গিয়ে তুলে এনে না থাকে। নিয়ে এলে কি করবেন?'

'কি আর করব?' শুকনো গলায় বললেন ক্যাম্পবেল। 'তবে এত তাড়াতাড়ি গিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছে বলে মনে হয় না। অত সহজ না। কিন্তু সোনাগুলো তো ওর নয়, আনতে যাবে কোন অধিকারে?'

'সেকথাই যদি বলেন, তাহলে তো আপনারও নয়। যাই হোক, আপনার ধারণা, এখনও সময় আছে, প্লেন নিয়ে গেলে ওদের আগে পৌঁছানো যাবে, সেজন্যেই আমার কাছে এসেছেন।'

আবার অস্বস্তি দেখা দিল ক্যাম্পবেলের চোখে। 'বুঝতে তাহলে পেরেছেন।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল ওমর। 'কিন্তু আপনি যান বা যে-ই যাক, সোনাগুলোর মালিকানার ব্যাপারটা স্থির করে নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া ভাল। নইলে কষ্ট করে তুলে আনা হলো, আর অন্য কেউ এসে মালিকানার দাবিতে সেটা কেড়ে নিল, তাহলে আফসোসের সীমা থাকবে না।'

'মালিক আইনত এখন সেই বীমা কোম্পানি, যারা বীমার টাকা শোধ করে দিয়েছে। তবে সোনার আশা নিশ্চয় ছেড়ে দিয়েছে ওরা। ওরা ধরেই নিয়েছে জাহাজটা এখন পানির তলায়।'

'কিন্তু যদি জানে ওপরেই আছে, আর সোনাগুলোও বহাল তবিয়তে রয়েছে–যদিও কুমেরুতে, তুলে আনার চান্স ফিফটি ফিফটি, তখন কি করবে বলা যায় না। যাকগে, এই সোনার কথা আর কাউকে বলেছেন?'

'কি করে বলব? আমি নিজেই তো জানতাম না। স্টারি ক্রাউন জাহাজটার কথাই জানতাম না আমি, এখানে এসে শুনলাম। তবে সীল শিকারের কথাটা রিপোর্ট করেছি আমি।'

'তাহলে প্রথম কাজই হবে জাহাজটার মালিকানা ঠিক করা, যাতে উদ্ধার করে আনার পর মাল নিয়ে টানাহেঁচড়া না পড়ে। বীমা কোম্পানিকে গিয়ে সব কথা খুলে বলতে হবে। যদি ওরা অভিযানের খরচ আর সেই সঙ্গে সোনার একটা ভাগ দিতে রাজি থাকে, তো ঝামেলা চুকে গেল। আর যদি বলে, না ভাই খরচ-টরচ দিতে পারব না, তোমরা পারলে তুলে নাওগে, তাহলে ওদের কাছ থেকে লিখিত নিতে হবে যে স্যালভেজ করা জাহাজ আর এর সমস্ত মালামাল আপনার; ওরা আর কিছু দাবি করতে আসবে না। আমার ধারণা, "সেক্ষেত্রে যা পেলাম তাই লাভ" ভেবে নামমাত্র মূল্যে জাহাজের মালিকানা ছেড়ে দেবে।'

'তা নাহয় দিল,' খুশি হতে পারলেন না ক্যাম্পবেল, 'কিন্তু ওই নামমাত্র মূল্য দেয়ার পরও আমার গাঁট খালি হয়ে যাবে। এই অভিযানের খরচ অনেক, আমি একা কুলাতে পারব না। জাহাজে করে গেলে হয়তো কিছুটা কম হবে, কিন্তু তাতে অনেক সময় লাগবে আর দেরি হয়ে যাবে। গিয়ে হয়তো দেখব আমার আগেই পোত্রাঘাই গিয়ে সব সাফ করে নিয়ে এসেছে। তখন আমও গেল, ছালাও, পথের ফকির হব।'

'পোত্রাঘাই কিসে যাবে বলে মনে হয় আপনার? জাহাজে করে?'

'সে তো বটেই। তবে অন্য আরেকটা জাহাজ জোগাড় করতে হবে তাকে। বেত্রাঘাইকে নিয়ে যেতে পারবে বলে মনে হয় না। ওটার কিছু নেই আর।'

'আমার তা মনে হয় না,' মাথা নাড়ল ওমর। 'জাহাজের অনেক দাম। ওর মত লোক হুট করে আরেকটা ভাল জাহাজ কেনার মত এত টাকা জোগাড় করতে পারবে না।'

'তাহলে ভাড়া নেবে।'

'তা-ও পারবে না।'

'কেন?'

'ভাড়া নিতে গেলেই কোথায় যাবে, কেন যাবে, এ সব প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে তাকে। কি জবাব দেবে? সত্যি কথাটা কি বলতে পারবে? বললেই তখন ঘাড়ে চাপবে। জাহাজের মালিক মুখ যদি বন্ধও রাখে, শুধু ভাড়াতে যেতে রাজি হবে না, সোনার ভাগ চাইবে। পোত্রাঘাইয়ের লাভের গুড় পিঁপড়েয় খাবে তখন, এ প্রস্তাবে রাজি হতে পারবে না। অপরিচিত জাহাজ আর নাবিক নিয়ে যাওয়ার চেয়ে পুরানো জাহাজে করে পুরানো লোকদের নিয়ে যেতেই সাচ্ছন্দ্য বোধ করবে সে।' পোড়া সিগারেটের গোড়াটা অ্যাশট্রেতে গুঁজল

ওমর। 'আমার কথা শেষ।'

লম্বা দম নিলেন ক্যাম্পবেল, 'এখন তাহলে কি করব?'

'আমার সঙ্গে কি জন্যে দেখা করতে এসেছিলেন আপনি?'

'ভেবেছিলাম আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।'

'কিভাবে?'

'প্লেন নিয়ে আমার সঙ্গে যাবেন সেখানে। সোনাটা ভাগাভাগি করে নিতে পারি আমরা। প্রস্তাবটা কি অযৌক্তিক?'

'অযৌক্তিক নয়, যদি আমি যেতে চাই। কিন্তু মিস্টার ক্যাম্পবেল, সোনার লোভ আমার এক বিন্দুও নেই। সোনার চেয়ে নিজের জীবনটাকে অনেক বেশি মূল্যবান মনে করি আমি। জীবনটা যে ভাবে চলছে এখন, তাতে মোটেও অখুশি নই আমি। শুধু শুধু আত্মহত্যা করতে যাব কেন, বলুন?'

'এতটাই কঠিন আর অসম্ভব মনে হচ্ছে আপনার কাছে?' অবাক হলেন ক্যাম্পবেল। 'আমি তো জানতাম প্লেন নিয়ে দুনিয়ার যে কোন জায়গায় চলে যাওয়া যায়।'

'অনেকেই তাই ভাবে। যাওয়া যায় না তা বলি না, তবে এরও একটা সীমা আছে। কুমেরু থেকে ঘুরে আসার পরেও আমি বলব আপনি জায়গাটা সম্পর্কে অনেক কিছুই জানেন না। পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্গমতম জায়গায় যাওয়া নিয়ে আলোচনা করছি আমরা। আধুনিক যন্ত্রপাতি সহ খুব ভাল একটা জাহাজ নিয়ে যাওয়াটাও খুব কঠিন। আর যন্ত্রপাতি ছাড়া প্লেন নিয়ে যাওয়াটা তো রীতিমত বিপজ্জনক। যেতে হলে অন্তত দুটো প্লেন লাগবে, তা-ও বড় আকারের। তার খরচ জানেন?'

মেঝের দিকে চোখ চলে গেল ক্যাম্পবেলের। 'আমি অবশ্য এতটা সমস্যা হবে ভাবিনি।'

'হয়তো যতটা বলছি ততটা সমস্যা হবে না। কিন্তু এমনভাবে আটঘাট বেঁধে যাওয়া উচিত, যাতে বেঁচে ফেরার আশা থাকে, সুযোগও থাকে। অহেতুক ঝুঁকি নিয়ে লাভটা কি? আমি যেমন জানি, হয়তো আপনিও জানেন কয়েকটা দেশের সরকারের নজর এখন কুমেরুর দিকে। সুমেরুর চেয়ে কুমেরুর প্রতি তাদের আকর্ষণ বেশি। এর কারণ হলো কম দূরত্ব, সুমেরুর চেয়ে কুমেরুতে যেতে সময় লাগে কম। তা ছাড়া কুমেরু এক বিশাল জায়গা, ষাট লক্ষ বর্গমাইল। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস ওই জমাট বরফের নিচে মাটি আছেই আছে, নইলে বরফ আটকে থাকতে পারত না। আর সেই মাটির নিচে রয়েছে সোনা, কয়লা, তেল থেকে শুরু করে সব ধরনের ধাতুর বিশাল বিশাল খনি। যে দেশ এর মালিক হবে, সেটা লালে লাল হয়ে যাবে যদি সে-সব সম্পদ তুলে আনতে পারে। সেজন্যে চেষ্টাও চালানো হচ্ছে ঘন ঘন। আমেরিকান সরকারও চেষ্টা করছে। শেষ যে অভিযানটা চালানো হয়েছিল, তাতে প্লেন ব্যবহার করা হয়েছিল, সেগুলোতে যে আধুনিক যন্ত্রপাতি কি পরিমাণ ছিল তা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তারপরেও কি ভোগান্তিটাই না গেছে বিজ্ঞানীদের। এর জন্যে বেশি দায়ী হলো কুমেরু সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা।'

প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে ওমরের দিকে তাকিয়ে আছে সব ক'টা মুখ। যেন ছেলেবেলার রূপকথার গল্প শুনছে।

আরেকটা সিগারেট ধরাল ওমর। 'প্রথম সমস্যাটাই হলো সীমারেখা নিয়ে। কোনখান থেকে মূল ভূখণ্ড শুরু হয়েছে, পানির সীমানা কোনটা, সেটাই সঠিকভাবে জানা যায়নি এখনও। কারণ পানি জমাট বেঁধে বরফ হয়ে থাকে। কখনও ভেঙে ভেঙে সরে যায়, কখনও আরও বেশি যুক্ত হয়। তাতে কোন সময়ই উপকূলভাগের চেহারা একরকম থাকে না। ওপর থেকে মনে হয় জমাট বাঁধা মসৃণ বরফ, নামতে গেলে বাধে বিপদ। কারণ যেটাকে মসৃণ মনে করা হয়েছিল সেটা প্রায় ফুটখানেক পুরু মিহি বরফের গুঁড়োতে ঢাকা, পা ফেললেই ডেবে যায়, আর প্লেনের চাকার যে কি দুর্গতি হবে, অনুমান করা কঠিন নয়–এমনকি আপনার পক্ষেও নয়, কারণ আপনি গেছেন জলপথে, জাহাজে করে। কখনও বৃষ্টি হয় না ওখানে, নিশ্চয় জানেন, তবে তুষারপাত হয়, সেই সঙ্গে চলে বাতাসের ঘূর্ণি, সেই তাণ্ডবের মধ্যে প্লেন থেকে বরফের ওপরটা দেখা যাবে না। নামার পরে ওঠার কথাটাও মাথায় রাখতে হবে।'

'তা ঠিক,' মাথা ঝাঁকালেন ক্যাম্পবেল। 'সত্যি, অদ্ভুত এক জায়গা। দিন ভাল থাকলে চতুর্দিকে একশো থেকে দেড়শো মাইল পর্যন্ত নজর চলে, কারণ বাতাসে আর্দ্রতা একেবারে নেই। ঠিক একই কারণে আকাশের রঙ দেখা যায় বেগনি-লাল, নীল নয়; আর আর্দ্রতা না থাকার কারণে রোদ এতটাই প্রখর হয়ে ওঠে, তাপমাত্রা শূন্যের নিচে থাকার পরেও চামড়া পুড়িয়ে দেয়। আবহাওয়া খারাপ হয়ে গেলে, আর তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটলে তো কথাই নেই, ষোলোকলা পূর্ণ হবে। সাদা হয়ে যাবে সবকিছু। ব্ল্যাক-আউটের কথা শুনেছেন, তাতে সব কালো, অন্ধকার হয়ে যায়, কুমেরুতে হয়ে যায় হোয়াইট-আউট। যেদিকে তাকানো যায়, সব সাদা, সাদার জন্যে কোন কিছুই চোখে পড়ে না। সব দিক থেকে আলো আসছে, তাই ছায়াও পড়ে না। প্লেন নিয়ে নামতে গেলে বরফে গিয়ে ধাক্কা খাওয়ার আগে বুঝতেই পারবেন না যে নিচে নেমেছেন। সামনে সব সাদা বলে দশ হাজার ফুট উঁচু বরফের পাহাড়ও হয়তো চোখে পড়বে না আপনার। যখন গুঁতো লাগবে, তখন আর জেনেও লাভ নেই; চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে প্লেন।'

'প্লেন নিয়ে ওখানে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার নেই,' ওমর বলল, 'কিন্তু যারা গেছে তাদের লেখা পড়ে মনে হয়েছে, ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছিল তারা, আর সেই দুঃস্বপ্নটা বাস্তব দুঃস্বপ্ন। শেষ আবহাওয়া কেন্দ্রটা রয়েছে ওদিকে কারগুয়েলেন আইল্যান্ডে, সেটাও কুমেরু থেকে বহুদূরে; ওখানেই যে পরিমাণ আইসবার্গ রয়েছে আর কুয়াশা পড়ে, শুনলে যাওয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে দেবে যে কোন বুদ্ধিমান লোক। তবে আরেকটা আবহাওয়া কেন্দ্র আর গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে কুমেরু থেকে ছয়শো মাইল দূরে–গাউ আইল্যান্ডে। ওখানে প্লেন নামানো যায়। আর বেশি কিছু বলতে চাই না, অনেক বলে ফেলেছি; কুমেরু সম্পর্কে আপনাকে এত কথা শোনাতে যাওয়ার

কোন প্রয়োজন ছিল না, আপনি ওখান থেকে ঘুরেই এসেছেন, তবু আলোচনার খাতিরে এতসব বলা। সবশেষে শুধু একটা কথাই বলতে চাই, সবচেয়ে আশাবাদী পাইলটটিও ওখানে গিয়ে স্টারি ক্রাউনকে খুঁজে বের করে, সোনাগুলো তুলে নিয়ে নিরাপদে ফেরার আশা করবে না। ওখানে আটকা পড়ার কথা ভাবতেই গায়ের রোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে আমার।'

'আমারও,' মুসা বলল।

'আপনার কথা বুঝতে পারছি,' নিরাশ কণ্ঠে বললেন ক্যাম্পবেল।

'সময়, প্রচুর টাকা আর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থাকলে সোনাগুলো তুলে আনার চেষ্টা করে দেখা যেত,' ওমর বলল, 'কিন্তু অত টাকা আপনার যেমন নেই, আমারও নেই। আর থাকলেও নিজের খরচে সেটা করতে যেতে রাজি হতাম না আমি।' এক মুহূর্ত ভাবল সে। 'বীমা কোম্পানি খরচ দিতে রাজি না হলেও অবশ্য উপায় আরেকটা আছে। যে কোন দেশের সরকারেরই সোনা প্রয়োজন, আমাদের সরকারেরও তাই। জায়গামত গিয়ে ধরাধরি করতে পারলে অভিযানের খরচটা হয়তো জোগাড় করা যায়, কিন্তু সেক্ষেত্রে সোনাগুলো চেয়ে বসবে ওরা। এনে দেয়ার জন্যে আমাদেরকে একটা পার্সেন্টেজ দিতেও রাজি হবে, এই দশ, পনেরো, ওরকম কিছু। আর ব্যর্থ হলে খরচের সমস্ত টাকাটাই যাবে ওদের, আমাদের কোন লোকসান নেই। তবে, জীবনটা খোয়ানোর ঝুঁকি থাকবে। সেটা অবশ্য নিজেদের পকেটের টাকা খরচ করলেও থাকবে। আপনি রাজি থাকলে সরকারী খরচে যাওয়া যায় কিনা চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'আমি রাজি,' বলতে সামান্যতম দ্বিধা করলেন না ক্যাম্পবেল।

'তাহলে আজ থেকেই চেষ্টাটা শুরু করে দেব।'

'ঠিক আছে,' উঠে দাঁড়ালেন ক্যাম্পবেল, 'সে-ভার আপনার ওপরই ছেড়ে দিলাম।'

ওমরও উঠে দাঁড়াল, 'ঠিকানা রেখে যান, যাতে যোগাযোগ করতে পারি। যদি যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি, আপনাদের দুজনকেও যেতে হবে। আপনি যাবেন গাইড হিসেবে, স্কুনারটা কোথায় আছে দেখিয়ে দেবেন। আপনার ছেলে যাবে মেকানিক, রেডিও অপারেটর আর পাইলট হিসেবে।' রোজারের দিকে তাকাল সে, 'কি, কোন আপত্তি আছে তোমার?'

'না, স্যার, কোন আপত্তি নেই,' জোরে জোরে মাথা নাড়ল রোজার ক্যাম্পবেল, 'ওই সাইকেলের দোকান থেকে বেরোতে পারলে এখন আমি বাঁচি।'

দুজনকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল ওমর।

'শীতের জামাকাপড়গুলো বের করব নাকি গিয়ে আলমারি থেকে?' খানিকটা রসিকতার সুরেই জিজ্ঞেস করল মুসা।

সঙ্গে সঙ্গে ধরল রবিন, 'কেন, তোমার তো মেরু অঞ্চলে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না।'

'সবাই চলে গেলে আমি একা একা রকি বীচে বসে মাছি মারব নাকি? সবে মিলে করি কাজ, মরি বাঁচি নাহি লাজ...'

'এখানে লাজ শরমের তো কোন ব্যাপার নেই, আছে ভয়; মরতে ভয় পাও কিনা সেটা বলতে হবে।'

'বেশ,' কবিতাটা শুধরে দিল মুসা, 'সবে মিলে করি কাজ, মরি বাঁচি নাহি ভয়...'

হেসে উঠল রবিন, 'মিলল তো না।'

'বুঝলাম,' কপালে ভাঁজ ফেলে দিয়ে কানাই মাস্টারি ভঙ্গিতে বলল মুসা, 'আধুনিক কবিতা সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই। আধুনিক কবিতায় কোন কিছু মেলানো লাগে না। আমারটা তো তা-ও বোঝা যায়, বেশির ভাগ কবিতার তো কি যে বলতে চায় মাথামুণ্ড কিছুই বুঝি না...'

হেসে ভুরু নাচাল ওমর। 'কাজ পেয়ে গেছি, ফালতু তর্ক করে নষ্ট করার সময় নেই। যাওয়ার জন্যে তৈরি হতে হবে আমাদের। মুসা, তুমি যে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করছিলে, তার জবাবে বলি, কুমেরুতে যেতে হলে শুধু শীতের জামাকাপড়ে চলবে না, ডীপ ফ্রিজে ঢুকে বসে থাকা যায় যাতে, তেমন পোশাক লাগবে।'

তিন

পনেরো দিন পর মেরু সাগরের ধূসর জলরাশির ওপর দিয়ে দুটো বিমানকে দক্ষিণে উড়ে যেতে দেখা গেল। বহু পুরানো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার ওয়েলিংটন বম্বার, এককালে ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর গর্ব ছিল এগুলো, এখন মিউজিয়ামের জিনিস। একটার ককপিটে বসা ওমর, পাশে কিশোর। পেছনে রেডিও কম্পার্টমেন্টে রবিন আপাতত রেডিওম্যানের দায়িত্ব পালন করছে। তার সঙ্গে রয়েছেন ক্যাপ্টেন ক্যাম্পবেল। অন্যটায় রয়েছে রোজার আর মুসা। পথে গাউ আইল্যান্ডে নেমে যাবে ওরা। ওমররা সোজা এগিয়ে যাবে কুমেরুর দিকে।

পনেরো দিন খুব ব্যস্ততায় কেটেছে ওদের সবারই। টাকা জোগাড় করার পর একটা দিন নষ্ট করেনি, বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু তারপরেও দুশ্চিন্তা যাচ্ছে না ওমরের। পোত্রাঘাই আগেই চলে গেছে কিনা কে জানে, তাহলে সব পণ্ড হবে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, পোত্রাঘাই যাবেই, ওর মত লোক এত সোনার লোভ সংবরণ করতে পারবে না। দুটো দলের দেখা হয়ে গেলে যে সংঘর্ষ বাধবেই, তাতে কোনই সন্দেহ নেই, সেজন্যে তৈরি হয়েই যাচ্ছে ওমর। তবে ওদের আগে গিয়ে কাজটা সেরে চলে আসতে পারলে ঝামেলাটা এড়ানো যেত।

স্টারি ক্রাউনের বীমার টাকা শোধ করেছিল যে কোম্পানিটা, সেই কোম্পানিটার অস্তিত্বই নেই আর, লোকসান দিয়ে দিয়ে ফতুর হয়ে বহুকাল আগেই উঠে গেছে। অভিযানের জন্যে টাকা আদায় করতে অনেক তর্কবিতর্ক, ঝগড়াঝাঁটি করতে হয়েছে ওমরকে সরকারের বিশেষ বিশেষ দপ্তরের লোকের

সঙ্গে। রাজি আর কোনমতেই হতে চায় না ওরা। অবশেষে নিমরাজি হলো, বলল, সমস্ত সোনা এনে ওদের দিয়ে দিতে হবে। ওমর বলল, 'বাহ্, চমৎকার কথা! প্রাণ বাজি রেখে যাব, এত কষ্ট করে সোনা উদ্ধার করে আনব, তারপর সব দিয়ে দেব আপনাদের। ছাগল পেয়েছেন নাকি আমাদের? কমপক্ষে পনেরো পার্সেন্ট কমিশন দিতে হবে। অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় কেবল এত কমে করতে চাইছি। রাজি হলে হোন, নইলে যেখানে আছে সেখানেই থাকুক পড়ে ওই সোনা। অন্য কাউকে জানিয়ে দেব, ওরা গিয়ে তুলে নিয়ে আসবে। তথ্যটা জানানোর জন্যে হয়তো নগদ কিছু টাকাও ধরে দিতে পারে।' খানিকক্ষণ ঘ্যানর ঘ্যানর করে শেষে ট্রেজারির কর্মকর্তা বললেন, 'ঠিক আছে, যান, দেব দশ পার্সেন্ট।' খরচের টাকা নিয়েও চাপাচাপি। শেষমেষ যা দিতে রাজি হলো ওরা, তাতে সারপ্লাস আর্মি স্টোর থেকে দুটো পুরানো ওয়েলিংটন ছাড়া আর কোন বিমান পাওয়া গেল না। কি আর করবে। ওদুটোকেই সারিয়ে-সুরিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত করে নিয়েছে। আধুনিক বিমানের চেয়ে গতি অনেক কম হলেও নির্ভর করা যায় বিমান দুটোর ওপর।

এগুলোকে কুমেরুতে নিয়ে যাওয়ার উপযোগী করে তুলতে কম পরিশ্রম করতে হয়নি তিন গোয়েন্দা, ওমর আর রোজারকে। প্রথমেই অস্ত্রশস্ত্র আর লড়াইয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় যে সব যন্ত্রপাতি বসানো ছিল, প্রায় সব খুলে নিতে হয়েছে। ওজন কমানোর জন্যে। তার জায়গায় বসানো হয়েছে বড় বড় তেলের ট্যাংক—যেটা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস; কারণ বহু দূরের পথ পাড়ি দিতে হবে ওদের, আবার ফিরেও আসতে হবে। মাঝপথে তেল শেষ হয়ে গেলে মরা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাঁবু, রসদপত্র নেয়া হয়েছে বিমান ভর্তি করে। যদি সোনা পাওয়া যায়, কিছু কিছু কম প্রয়োজনীয় জিনিস ফেলে দিয়ে তার জায়গায় সোনা ভরা হবে। বরফের ওপর ফুটখানেক পুরু হয়ে জমে থাকা তুষারে চাকা নামাতে অসুবিধে হবে, বিমান উল্টে যাওয়ার ভয় আছে, তাই স্কি ফিট করে নিয়েছে এমনভাবে যাতে তার নিচে চাকার কয়েক ইঞ্চি বেরিয়ে থাকে। এতে চাকাও কাজ করবে, একই সঙ্গে স্কি-ও কাজ করবে। এই পদ্ধতি ওদের নিজের আবিষ্কার নয়, বহু বছর আগে বিমানে করে কুমেরু অভিযানে বেরিয়েছিলেন একদল বিজ্ঞানী, তাঁরা এ ভাবে চাকা আর স্কি একসঙ্গে ব্যবহার করে সফল হয়েছিলেন। দুটো বিমান নেয়ার কারণ, একটা যাবে কুমেরুতে, আরেকটা থেকে যাবে হেডকোয়ার্টারে। কোন কারণে কুমেরুতে যাওয়া বিমানটা দুর্ঘটনায় পড়ে গেলে রেডিওতে জানাবে দ্বিতীয় বিমানটাকে—যদি জানানোর অবস্থা থাকে ওদের, সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করতে ছুটবে দ্বিতীয়টা। ওসব জায়গায় সচরাচর কেউ যায় না, বিপদে পড়লে উদ্ধার করার মত অন্য কোন জাহাজ বা বিমানকে পাওয়া যাবে কিনা বলা কঠিন, তাই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে যাতে না থাকতে হয় সেজন্যে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করে এসেছে ওরা।

হেডকোয়ার্টার করা হয়েছে গাউ আইল্যান্ডকে। একটা বিমান নিয়ে ওখানে থাকবে মুসা আর রোজার। সর্বক্ষণ রেডিওর সামনে। যোগাযোগ রক্ষা করবে। ডাক পেলেই সঙ্গে সঙ্গে বিমান নিয়ে উড়ে যাবে কুমেরুর উদ্দেশে।

দিনটা সুন্দর। দৃষ্টিও চলে চমৎকার। কিন্তু ঘণ্টাখানেক যেতে না যেতেই স্নায়ুর ওপর অদ্ভুত চাপ টের পেল কিশোর। যখনই ভাবতে গেল ওদের জীবন এখন সম্পূর্ণ নির্ভর করছে বিমানটার ইঞ্জিনের ওপর, অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। যদি কোন কারণে এখন বিগড়ায় ওটা, পানিতে পড়ে যায়, কয়েক মিনিটের বেশি বাঁচবে না ওরা, সাগরের পানি এখানে ভয়াবহ ঠাণ্ডা, মুহূর্তে জমে যাবে শরীর। মানসিক চাপ বাড়তেই থাকল। কাটানোর জন্যে সামনে-পেছনে, আশেপাশের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করল। কি দেখবে? কিছুই নেই দেখার। সব একই রকম, সব একঘেয়ে। হাঁটুতে বিছানো ম্যাপের দিকে তাকাল। জাহাজ চলাচলের পথ ফেলে এসেছে বহু পেছনে। ঢোক গিলল সে। ইঞ্জিনের শব্দকে মনে হলো অন্য রকম। যেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ঢোক গেলা বন্ধ করে দিল।

ডানে বহুদূরে কুখ্যাত গুড হোপ এখন অস্পষ্ট ছায়ার মত, আমেরিকা মহাদেশের সর্বদক্ষিণ প্রান্তটা মিলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। আবার ম্যাপের দিকে তাকাল সে। সামনে হাজার মাইলের মধ্যে যেসব দ্বীপ রয়েছে রোমাঞ্চকর সব নাম সেগুলোর–মাউন্ট মিজারি, ডেসোলেশন আইল্যান্ড, লাস্ট হোপ বে, ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট ফিউয়ারিজ। মনে মনে বাংলা করল নামগুলোর–দুর্দশার পর্বত, নিরানন্দ দ্বীপ, শেষ আশার উপসাগর, পূর্ব ও পশ্চিমের ক্রোধ। নামগুলো দিয়েছিল প্রাচীন নাবিকেরা, জায়গাগুলোর চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে। অবাক হয়ে ভাবল, আরও দক্ষিণের মহাদেশটার কি নাম দিত ওরা, যদি সেখানে যেতে পারত? যেতে পারেনি, তাই দিতেও পারেনি। কুমেরু নামটার মধ্যে কোন ভয়াবহতা নেই। এটা অনেক পরে দেয়া হয়েছে। এখনও এখানে পারতপক্ষে আসতে চায় না কেউ, মাঝেসাঝে দু'একটা অতি দুঃসাহসী তিমি শিকারীর জাহাজ ছাড়া। পোত্রাঘাইয়ের কথা ভাবল। মনে পড়তেই জাহাজের খোঁজে চারপাশে তাকাতে লাগল। কোন ধরনের একটা জলযানও চোখে পড়ল না। সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা বড় বড় আইসবার্গগুলো যেন সদাজাগ্রত ভূতুড়ে প্রহরীর মত পৃথিবীর শেষ সীমানাটাকে পাহারা দিয়ে চলেছে সেই কোন্ অনাদিকাল থেকে।

ওমরের দিকে তাকাল সে। ওর ভাবলেশহীন চেহারা দেখে মনে কি চলেছে কিছু অনুমান করা গেল না। থেকে থেকে চোখ দুটো শুধু চঞ্চল হয়ে উঠছে, নিচের ধূসর সাগরের দিকে তাকাচ্ছে, ফিরে আসছে আবার ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলে। মাঝে মাঝে নোট লিখছে এক টুকরো কাগজে। গোমড়া শূন্যতার মাঝে একঘেয়ে গুঞ্জন করে চলেছে বিমানের ইঞ্জিন।

গাউ আইল্যান্ড এসে গেল। চক্কর দিয়ে নেমে যেতে শুরু করল মুসাদের বিমান। দ্বীপের একপাশে আমেরিকান নেভির ছোট-বড় কয়েকটা জাহাজ দেখা গেল। নিশ্চয় মহড়া দিতে এসেছে। ডেক থেকে দূরবীন দিয়ে বিমান দুটোকে দেখছে ওরা। রেডিওতে জানতে চাইল, 'কোথায় যাচ্ছ?' রবিন জানাল, গবেষণার কাজে কুমেরুতে যাচ্ছে।

ওমররা এগিয়ে চলল। গাউ আইল্যান্ড পার হয়ে আসার পর থেকে সাগরে

ভাসমান বরফের টুকরোর সংখ্যা বাড়তে থাকল। অদ্ভুত চেহারার বার্গ আর ছোট আকারের গ্রাউলারগুলো পার হয়ে যাচ্ছে নিচে। যতই দক্ষিণে এগোচ্ছে, বাড়ছে ওগুলোর সংখ্যা। বিচিত্র তাদের রঙ। সাদা, হালকা সবুজ, নীল তো আছেই, কোন কোনটা বাতির মত জ্বলজ্বলে, কোনটার গায়ে আবার কালো কালো দাগ দেখে মনে হয় মাটির গা থেকে উপড়ে তুলে আনা হয়েছে। আকৃতিও বিচিত্র। কোনটা স্তম্ভের মত, কোনটা বা দুর্গ, আবার কোন কোনটা এত বড় আর সমতল, বিমান নামানোর রানওয়ের মত। একটা তো এত বড়, পার হতে পুরো বিশ মিনিট লেগে গেল। এগুলোর কাছে নিজেদেরকে বড়ই নগণ্য আর ক্ষুদ্র মনে হতে লাগল কিশোরের। প্রকৃতির বিশালত্বের কাছে এমনই লাগে মানুষের। প্লেনে করে সাহারা মরুভূমি পাড়ি দেবার সময়ও এই অনুভূতি হয়েছিল ওর।

এ সব দেখেটেখে ওমর ভাবছে, কাজটা নেয়া বোধহয় ভুলই হয়ে গেছে। কুমেরু সম্পর্কে শুধু বই পড়া আর ভিডিও দেখা জ্ঞান তার। বাস্তব অবস্থা দেখে দমে গেল। তা-ও তো কুমেরুতে পৌছায়ইনি এখনও। এতদূর এগিয়ে আর ফিরে যাওয়াও সম্ভব না। ট্রেজারিকে কি জবাব দেবে? সাগর কোনখানে শেষ, কোথা থেকে ভূখণ্ড শুরু হয়েছে বোঝার কোন উপায় নেই। সামনে শুধুই বরফ আর বরফ। বরফের সমভূমি, বরফের টিলা, বরফের পাহাড়। এতক্ষণ ওগুলোর মাঝে বেশ পানি চোখে পড়ছিল, বড় পুকুর কিংবা লেকের মত, এখন সেটাও কমে এসেছে। একপাশের সাগরকে বাদ দিলে সামনে ডোবার সমান জায়গায় পানি চোখে পড়ছে কদাচিত। সীমাহীন বরফের নিচে যে কি আছে, পানি না মাটি, তা-ও বোঝার উপায় নেই। ঠাণ্ডাও বেড়েছে। কেবিনের হীটারও কুলিয়ে উঠতে পারছে না। জানালার কাঁচ ঘোলা হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে মনে করেছিল বাইরে কুয়াশা পড়ছে, কিন্তু পরে সন্দেহ হওয়ায় অ্যালকোহলে নেকড়া ভিজিয়ে কাঁচের ভেতরটা মোছার পর যখন পরিষ্কার হয়ে গেল, বুঝল কুয়াশা নয়। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার জন্যে হচ্ছে এ রকম।

অবশেষে কথা বলল সে, 'গ্র্যাহাম ল্যান্ডের কিনারে চলে এসেছি আমরা। মাটির তো কোন চিহ্নও দেখতে পাচ্ছি না। তবে ম্যাপ আর হিসেব-নিকেশ তাই বলছে। বেজ-এ যোগাযোগ করতে বলো রবিনকে। মুসাকে আমাদের অবস্থান জানাতে বলো। আর ক্যাপ্টেন ক্যাম্পবেলকে ডাকো। কথা আছে।'

উঠে চলে গেল কিশোর। খানিক পর ফিরে এসে জানাল মুসাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তার পেছনে এসে দাঁড়ালেন ক্যাম্পবেল।

'সামনেটা দেখুন তো, ক্যাপ্টেন,' ওমর বলল। 'দেখুন কিছু চিনতে পারেন নাকি। উঁচু একটা জায়গা, আইসবার্গের মত দেখা যাচ্ছে। নিচে পাহাড়ও থাকতে পারে। যদি তাই হয়, এটাকে চিহ্ন ধরে রাখতে হবে।' এক টুকরো কাগজ বাড়িয়ে দিল। 'এই যে আমাদের পজিশন। আমার ধারণা আপনারা জাহাজটা দেখেছিলেন এখান থেকে একশো মাইল দক্ষিণ-দক্ষিণ-পশ্চিমে। সেদিকেই যাব এখন। কিছুটা পুব ঘেঁষে এগিয়েছি অ্যাডমিরালটি

ইনফরমেশনের ওপর ভিত্তি করে, ওরা বলছে বরফের ভেসে যাওয়ার প্রবণতা উত্তর-পুব দিকে। হিসেব মত এদিকেই সরে আসার কথা জাহাজটার। তাহলে চোখে পড়ে যাবে।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন ক্যাম্পবেল। অনেকক্ষণ দেখে নিয়ে বললেন, 'কিছুই তো চিনতে পারছি না। পারার কথাও নয় অবশ্য। বরফ তো আর এক জায়গায় স্থির থাকে না, বরফের চেহারাও বদলাতে থাকে।'

'ওপর থেকে তাহলে জাহাজটা দেখার উপায় কি?'

'কোনই উপায় নেই। আমরা দেখে যাওয়ার পর তুষারপাত হয়েছে। জাহাজের ওপরের অংশটা আগের চেয়ে পুরু বরফে ঢেকে গেছে নিশ্চয়। নিচে বরফের ওপর দাঁড়িয়ে দেখলে একটা পাশ হয়তো চোখে পড়বে, মাস্তুল আর কেবিনটাও দেখা যেতে পারে, তবে সবই বরফে ঢাকা।'

'খানিকটা নিচে নামাই, কি বলেন? তবে পাঁচশো ফুটের বেশি নামানো যাবে না। বার্গগুলো অনেক উঁচু। সামনে থেকে দূরত্বটা বোঝাও যাচ্ছে না পরিষ্কার। বাড়ি লাগলে শেষ। আমি চালাই, আপনি দেখুন জাহাজের মত কিছু চোখে পড়ে কিনা।'

'ঠিক আছে।'

কিশোর কিছু বলল না। এই বিশালত্বের মাঝে অর্ধেক ডুবে থাকা একটা জাহাজকে খুঁজে বের করা কয়েক হাজার খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার চেয়েও কঠিন মনে হচ্ছে তার কাছে। আগে ভাবেইনি তুষারপাত হয়েও যে ঢেকে যেতে পারে জাহাজটা, এখানকার সব কিছুর মত ওটাও সাদা হয়ে মিশে যেতে পারে। সহজে নিরাশ হয় না সে। কিন্তু এ মুহূর্তে, ওমর যখন উত্তরে নাক ঘোরাল বিমানের, কোন রকম আশা করতে পারল না কিশোর।

তবে ওমরেরও ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। গতি কমিয়ে উড়ে চলল। গ্র্যাহাম ল্যান্ড একটা উপদ্বীপ। আধঘণ্টা পর জানাল উপদ্বীপটার পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছে গেছে। প্রান্তটা লম্বা একটা বাহুর মত ঠেলে বেরিয়ে আছে সাগরের দিকে। সাগরের পানি খুব কম জায়গাতেই চোখে পড়ছে। এবড়োখেবড়ো বরফের দেয়াল তৈরি হয়েছে বাহুটার ওপর, কোথাও মাত্র দশ ফুট উঁচু, কোথাও অনেক বেশি—একশো ফুট। তার ওপাশে শুধুই সাদা, দিগন্ত বিস্তৃত বরফের সমভূমি যেন। চাপ লেগে মালভূমি আর টিলার মত উঁচু হয়ে ঠেলে উঠেছে জায়গায় জায়গায়। পানির সীমারেখা বোঝা যায় এখানে, কিন্তু সেটাই উপকূলের সীমা কিনা নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। কারণ বরফ জমছে আর ভাঙছে, জমছে আর ভাঙছে; মূল ভূখণ্ড থেকে সাগরের ভেতরে কতটা ছড়িয়ে আছে আলগা বরফ বোঝা যাচ্ছে না। তবে বরফ ভেঙে গেলে জাহাজের পক্ষে সবচেয়ে কত বেশি এগোনো সম্ভব সেটা অনুমান করা যায়। তাতে অনুমান করা গেল, স্টারি ক্রাউনের ধ্বংসাবশেষ এই সীমারেখা থেকে বড়জোর দু'মাইল ভেতরে থাকবে, তার বেশি না।

আরেকটু নিচে নেমে চক্কর মারতে শুরু করল ওমর। উপকূল ধরে চক্কর

দিতে দিতে এগিয়ে চলল। কিন্তু জাহাজের মত কোন কিছুই নজরে পড়ল না।

বড় বড় কতগুলো জানোয়ারের দিকে আঙুল তুলল কিশোর।

ক্যাম্পবেল বললেন ওগুলো ওয়েডেল সীল। এত দক্ষিণে ওরা ছাড়া আর কোন স্তন্যপায়ী জীবের বাস নেই। পাখির মধ্যে বড় আকারের রুকারি আর পেঙ্গুইন আছে।

নতুন এক আতঙ্ক এসে হাজির হলো হঠাৎ। ঈগলের মত ঠোঁট আর কালো বাকা নখওয়ালা বড় বড় হলুদ রঙের কতগুলো পাখি ঘিরে ফেলল বিমানটাকে। ধাক্কা লাগে লাগে। ক্যাম্পবেল জানালেন, ওগুলো স্কুয়া। প্রায় মিনিট দুই বিমান ঘিরে উড়ে চলল ওরা, তারপর সরে গেল।

কিশোরের দিকে তাকাল ওমর, 'অনেক তো দেখলাম, কি করা যায় বলো তো?'

'সত্যি আমার পরামর্শ চাইছেন?' অবাক হলো কিশোর। 'এ জায়গা সম্পর্কে আমি কি জানি...'

'হ্যাঁ, চাইছি। ওপর থেকে এর বেশি দেখা যাবে না। শুধু শুধু তেল নষ্ট করব। জাহাজটা যদি এখনও পানির ওপর থেকে থাকে, তো বিশ মাইলের মধ্যেই আছে। নতুন করে তুষার পড়ে ঢেকে গেছে বলেই দেখতে পাচ্ছি না। নিচে নেমে গ্রাউন্ড লেভেল থেকে দেখলে হয়তো চোখে পড়বে। কিন্তু একলা আমার ইচ্ছেয় নিচে নামার ঝুঁকি আমি নিতে চাই না। যার যার জীবন তার তার, দায়িত্বটাও সে-ই নেবে। সবাই মিলে বললে তবেই নামব। নিচে নামব, না ফিরে যাব?'

দ্বিধা করছে কিশোর। নামা বা খালি হাতে ফিরে যাওয়া কোনটাই মনঃপূত হচ্ছে না তার। 'নিচেই নামব। ওপর থেকে দেখা না গেলে নিচে নেমেই দেখতে হবে।'

'আমিও নিচে নামার পক্ষে।'

কিশোরের দিকে তাকাল ওমর, 'রবিনকে জিজ্ঞেস করে এসো।'

'আমাদের কথাই বলবে সে।'

'তা-ও জিজ্ঞেস করে এসো। পরে যেন কিছু বলতে না পারে।'

যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এল কিশোর। 'নামতে বলেছে।'

'যান, পেছনে গিয়ে সীট বেল্ট বেঁধে নিন,' ক্যাপ্টেনকে বলল ওমর।

সামনের সমতল অঞ্চলটার দিকে উড়ে গেল সে। জায়গার কোন অভাব নেই, কিন্তু তুষার কতখানি পুরু বোঝা যাচ্ছে না।

তাকিয়ে আছে কিশোর। নামার আগে শেষবারের মত চক্কর দিয়ে আসছে ওমর। বাতাস নেই। হালকা সবুজ বরফের রঙ। দেখে মনে হচ্ছে কঠিন, সমতল, চাকা নামাতে কোন অসুবিধেই নেই। কিন্তু নামালেই বসে যাবে কোন সন্দেহ নেই।

নিচে নামল ওমর। চাকা নামাতেই স্কি-ও নেমে এল। দম আটকে রেখেছে কিশোর। কিন্তু কোন অঘটন ঘটল না। আবার বেড়ে গেল ইঞ্জিনের গতি। ওপর দিকে উঠে গেল বিমানের নাক।

হেসে উঠল ওমর। তবে তার মধ্যে আনন্দ নেই। কিশোরের মতই টানটান হয়ে আছে তারও স্নায়ু, বুঝতে অসুবিধে হয় না। 'ঘটনাটা কি বুঝতে পেরেছ? বরফ ছোঁয়নি চাকা। যেখানে নামাতে চেয়েছি তার আরও অন্তত দশ ফুট নিচে রয়েছে বরফ। তুষারে ঢাকা জায়গায় প্লেন নামানো এমনিতেই কঠিন, কিন্তু এখানে যা আলো—নানা রকম খেলা খেলতে থাকবে, কিচ্ছু বোঝার উপায় নেই।'

তবে পরের বারে আর ভুল করল না ওমর। ঠিকই নামিয়ে ফেলল চাকা। তীক্ষ্ণ হিসহিস শব্দ তুলে পিছলে যেতে লাগল স্কি। মিহি তুষারের গুঁড়ো লাফ দিয়ে উঠল ওপরে, ধুলোর মত উড়তে লাগল। উইন্ডস্ক্রীন ঢেকে দিয়ে আটকে দিল দৃষ্টিশক্তি। তবে দ্রুতই নেমে গেল আবার। বিমানের গতিও দ্রুত কমল, চাকা শক্ত বরফে চাপ দিতে পারছে না বলে গড়াতে পারল না। দাঁড়িয়ে গেল বিমান।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। বিরাট স্বস্তির। বুঝতে পারছে স্কি না লাগালে কি সাংঘাতিক ভুলটাই না হয়ে যেত। এতক্ষণে নাকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকত বিমানটা।

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল ওমর। হালকা স্বরে জানতে চাইল, 'পৃথিবীর তলায় নেমে অনুভূতিটা কেমন হচ্ছে?'

'ভীষণ ঠাণ্ডা!'

'বাইরে আরও বেশি ঠাণ্ডা। চলো, বেরোই। কতটা বেশি, দেখা যাক।'

চার

শূন্যের নিচে সতেরো ডিগ্রি তাপমাত্রা। কুমেরুর উপযোগী পোশাক পরে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই একটা তাঁবু খাড়া করে ফেলল ওরা। চারপাশ ঘিরে দিল বরফের নিচু দেয়াল তুলে। তাঁবুর নিচের ফাঁকগুলো বন্ধ করে দিল তুষার ঠেসে দিয়ে। বিমান থেকে সমস্ত জিনিসপত্র নামিয়ে এনে ভরল সেই তাঁবুতে। হাত-পা ছড়ানোর জন্যে খুব অল্পই জায়গা রইল। মাঝখানে রাখা হলো একটা ফোল্ডিং টেবিল। চারপাশ ঘিরে বাক্সগুলো এমন করে সাজাল যাতে চেয়ারের কাজ দেয়। স্লীপিং ব্যাগ আর কম্বলগুলো ফেলে রাখা হলো একধারে, সময়মত খোলা যাবে। ওমর বলল, বাইরে থেকে এখানে ঠাণ্ডা কিছুটা কম।

তাড়াহুড়ো করে মাল নামানোর একটা বড় কারণ, বিমানের বোঝা কমাতে চাইছিল ওমর, যাতে ভারের চোটে তুষারে দেবে না যায় ওটা। পানির কাছ থেকে দু'শো গজ দূরে ল্যান্ড করেছে সে। তুষার এখানে যথেষ্ট গভীর, তবে অন্যান্য জায়গায় আরও বেশি গভীর। এই কমবেশির জন্যে বাতাস দায়ী। চিনির দানার মত তুষারকণা ঢেউ তৈরি করে বিছিয়ে আছে, মরুভূমির বালির ঢেউয়ের মত।

একটা বড় সুবিধে পাচ্ছে ওরা এখন, অন্ধকার হয়ে যাওয়ার ভয় নেই। বছরের এ সময়টায় সূর্য ডোবে না, সারাক্ষণ দিগন্তরেখার ওপরে একই জায়গায় বসে থাকে, সুতরাং চব্বিশ ঘণ্টাই দিনের আলো পাওয়া যায়। যখন রাতের অন্ধকার নামার কথা, তখনও অদ্ভুত এক আলোর আভায় আলোকিত হয়ে থাকে বিচিত্র এই বরফের রাজ্য, লাল রঙের মস্ত একটা বলের মত যেন দূরের বরফের ওপর বসে থাকে সূর্যটা। ভঙ্গি দেখে মনে হয় ধাক্কা দিলেই গড়াতে শুরু করবে।

বিমান থেকে দৃশ্যটা আরও চমৎকার লাগে। ক্রমশ উঠে যাওয়া ঢালের শেষ মাথায় বরফের পাহাড়। দূর থেকে ঘাসে ঢাকা মাটির পাহাড়কে যেমন দেখা যায় ঠিক তেমনি লাগে দেখতে, ফ্যাকাসে নীল। ওগুলোর মাঝে মাঝে বরফের চাঙড় বাড়িঘর আর দুর্গের রূপ নিয়ে এমন করে বসে আছে, মনে হয় যেন লোকালয় রয়েছে ওখানটায়, গেলেই মানুষের দেখা পাওয়া যাবে। দিগন্তে বসা সূর্য সব কিছুকে রাঙিয়ে রাখে শেষ বিকেলের লালিমার মত।

জিনিসপত্র সব গোছগাছ হয়ে গেলে স্টোভ জ্বেলে খাবার তৈরি করতে বসল ওরা। সহজ রান্না। খাওয়ার শুরুটা হবে টিনের সুপ গরম করে নিয়ে, শেষ কড়া লিকার আর অতিরিক্ত চিনি মেশানো চা দিয়ে। ঠাণ্ডা দূরে রাখতে এর জুড়ি নেই, ওমর বলল। তার সঙ্গে একমত হলেন ক্যাম্পবেল।

জ্যাম লাগানো রুটি চিবোতে চিবোতে ক্যাম্পবেলকে জিজ্ঞেস করল ওমর, 'জাহাজটা খুঁজে পাওয়ার উপায়টা কি?'

'একটা উপায়ই দেখতে পাচ্ছি, পানি বাদ দিয়ে অন্য সব দিকে হাঁটা। পানির দিকে যাওয়ার কোন দরকার নেই। ওদিকে থাকবে না। বরফের আওতা থেকে সরে গিয়ে পানিতে পড়লে মুহূর্তে তলিয়ে যাবে। চাপে চাপে তলাটা ভর্তা হয়ে গেছে নিশ্চয়। ক্যাম্পটাকে কেন্দ্র ধরে হাঁটা শুরু করব আমরা। দুই-এক মাইল গিয়ে ঘুরে আধমাইলমত পাশে সরে ফিরে আসব। সমস্ত জায়গা দেখা হয়ে যাবে। সবাই একসঙ্গে যাব না। ছড়িয়ে পড়ে খুঁজব। তাতে সময় লাগবে কম। দু'একদিনের মধ্যেই সবটা দেখা হয়ে যাবে। যদি না পাই, তাহলে ক্যাম্প সরাতে হবে। অন্য জায়গায় গিয়ে খুঁজব। কাজটা ভীষণ কঠিন। কিন্তু এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।'

'কঠিন আর কই,' রবিন বলল, 'আমার কাছে তো সহজই মনে হচ্ছে।'

'হাঁটা শুরু করো না একবার, তারপর বুঝবে কঠিন না সহজ,' ক্যাম্পবেল বললেন। 'আবহাওয়ার ব্যাপারটাও গোলমেলে। কোন ঠিকঠিকানা নেই। এই ভাল তো এই খারাপ। সামান্য একটু বাড়লেই কিংবা দু'এক ডিগ্রি এদিক ওদিকে হলেই যা খুশি ঘটে যেতে পারে। তুষার পড়া শুরু হলে...'

'আগে পড়ুক তো,' বাধা দিল ওমর। 'আগেই এত কিছু শুনে ফেললে শেষে বেরোতেই ভয় লাগবে। হাঁটা ছাড়া আমিও আর কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি না। প্রশ্ন হলো, ঠিক জায়গায় নেমেছি তো?'

'আমার তো কোন সন্দেহ নেই। দু'এক মাইলের মধ্যেই আছে জাহাজটা। যেদিন রওনা হয়েছিলাম, দিনটা পরিষ্কার ছিল। যন্ত্রপাতিও ঠিক

ছিল। তিন তিনবার পরীক্ষা করেছি আমি। তিনবারই করি সব সময়, যাতে ভুল হতে না পারে। বরফ সরে গিয়ে জাহাজটাকে সরিয়ে নিতে পারে অবশ্য।'

তাঁর কথাকে সমর্থন জানাতেই যেন দূরে, সাগরের দিকে শোনা গেল ভারী গুমগুম শব্দ; তারপর অদ্ভুত চাপা গর্জন। যেন দুটো দৈত্য মল্লযুদ্ধ শুরু করেছে।

'শুনলেন তো? বরফের সঙ্গে বরফের ঘষার শব্দ। দুটো আইসবার্গ সরে এসে ধাক্কা দিচ্ছে একে অন্যকে। এর মধ্যে কোন জাহাজ পড়লে কি ঘটবে বুঝতেই পারছেন।'

'বরফ সরে বটে,' কিশোর বলল, 'কিন্তু সেটাকে অত গুরুত্ব দেয়ার কিছু আছে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানীদের মতে দিনে কয়েক ফুটের বেশি না। মূল বরফখণ্ডটার কথা বলছি আমি, যেটার ওপর রয়েছি আমরা এখন। ভেঙে যাওয়া ছোট ছোট খণ্ডগুলো অবশ্য অনেক দ্রুত সরে, তাতে কোন সন্দেহ নেই; পেছন থেকে বাতাসে ঠেলতে থাকলে তো কথাই নেই। জাহাজটা মূল বরফখণ্ডে আটকে থাকলে আপনি যেখানে দেখে গিয়েছিলেন তার থেকে বেশি দূরে সরেনি।'

আবার শোনা গেল বরফের গর্জন।

'দেরি না করে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়া দরকার,' ওমর বলল। 'ক্যাম্প খালি করে সবাই চলে না গিয়ে একজনকে অন্তত থাকতে হবে এখানে, পাহারা দেয়ার জন্যে। ফিরে এসে যদি দেখি সমস্ত জিনিসপত্র তছনছ করে ফেলেছে সীলমাছে, দুঃখের সীমা থাকবে না। সিগন্যালার হিসেবেও কাজ করবে সে।'

'সিগন্যালার মানে?' বুঝতে পারল না রবিন।

'কুয়াশা আর তুষারপাতের ঝুঁকি সব সময়ই রয়েছে এখানে। দিনের আলো থেকেও তখন লাভ হয় না, কিছু দেখা যায় না। তাঁবুতে ফেরা কঠিন হয়ে যাবে। এ রকম কিছু ঘটলে ক্যাম্প থেকে গুলির শব্দ করে জানান দিতে হবে। তাঁবুতে ফেরা যাবে তখন। একে অন্যের কাছ থেকে বেশি সরা ঠিক হবে না, কয়েকশো গজের মধ্যে থাকতে হবে, পরস্পরের দৃষ্টিসীমার মধ্যে। তাহলে প্রয়োজনে হাত নেড়ে ইশারা করেও কিছু বোঝানো যাবে।'

'ঠিক আছে, তাই করা হবে,' ক্যাম্পবেলও অমত করলেন না। 'নিরাপত্তার দিকটাই প্রথম দেখা উচিত। কোন কিছু খোঁজার জন্যে হাঁটা শুরু করলে অনেক ক্ষেত্রেই হুঁশ থাকে না। যখন খেয়াল হয়, দেখা যায়, পথ হারিয়ে বসে আছে। জাহাজ থেকে আধমাইল দূরে গিয়েও হারিয়ে যেতে শুনেছি সীল শিকারীদের। একটা ঘটনা তো আমার চোখের সামনেই ঘটেছে এখানে। তার নাম ছিল জেনসেন। ভাল নাবিক ছিল। সীল শিকারে ওস্তাদ। ফেলে আসা একটা সীলমাছের চামড়া আনতে পাঠিয়েছিল তাকে পোত্রাঘাই। বরফ ঘিরে আসতে শুরু করেছে তখন। তাড়াতাড়ি জাহাজ সরিয়ে আনা ছাড়া উপায় ছিল না। পরে বুঝেছি, ইচ্ছে করেই ওই সময় পাঠিয়েছিল ওকে পোত্রাঘাই, দেখতে পারত না বলে। তাকে রেখেই চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। আর দেখা

যায়নি জেনসেনকে।'

'কেউ শুনলে ভাববে আমরা যা করতে এসেছি এটা কোন কাজই না,' কিশোর বলল। 'প্লেন আছে, কোথায় আসতে হবে জানা আছে, কি করতে হবে জানি; কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে কাজটা সেরে ফিরে যাওয়া মোটেও সহজ হবে না। ঘাপলা একটা বাধবেই।'

'সেই ভয়টা আমার আগে থেকেই আছে,' ওমর বলল। 'আমার জানা মতে আজ পর্যন্ত কোন স্যালভেজ অপারেশন নির্বিবাদে শেষ হয়নি, কোন না কোন গণ্ডগোল হয়েছেই। কখন যে কি অঘটন ঘটে যাবে কেউ বলতে পারে না। আমাদের বেলায় এবারে কি ঘটবে কে জানে। ভালয় ভালয় শেষ হলেই বাঁচি। একটা কথা ভেবে শান্তি পাচ্ছি, মেরিন এয়ারক্রাফট নিয়ে আসিনি। সাগরের কথা ভাবলে তো ফ্লাইং-বোট আনারই কথা ছিল। পানিতে নামতে সুবিধে, ডাঙার কাছে নামিয়ে ফেললেই হলো, প্রথমে অবশ্য তাই মনে করেছিলাম। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, বরফের দেশ, কখন জমে যাবে কোন ঠিকঠিকানা নেই। এখন দেখছি, ভাল করেছি। যখন নামছিলাম, পানি কতটা খেয়াল করেছ? যুদ্ধজাহাজ ঢোকানো যেত। আর এখন দেখো।'

তাকাল কিশোর। ভাসমান বরফের চাঁই গিজগিজ করছে পানিতে, শুরুতে যেমন পরিষ্কার ছিল পানি তেমন আর নেই। চাঁইগুলোর কোন কোনটা এতবড়, ছোটখাট একেকটা দ্বীপের সমান। 'কি সাংঘাতিক! ফ্লাইং-বোট নিয়ে এলে ভাল বিপদে পড়তাম। ওড়ানোর জন্যে দৌড় দেয়ার তো জায়গা নেই।'

'আস্ত থাকলে তো ওড়াতে। ওসব বরফের সামান্যতম ছোঁয়া লাগলেই চিরে ফালাফালা হয়ে যাবে প্লেনের পেট, চাপে পড়লে ভর্তা।...কিন্তু কথা অনেক হলো। বেরোনো দরকার। তাঁবু পাহারায় থাকবে কে?'

'রবিনই থাক,' কিশোর বলল। 'আপত্তি আছে?'

'না। আমার পালা তো আসবেই। তখন যাব।'

হাসল কিশোর। 'কেন, প্রথমবারেই যদি পেয়ে যাই?'

'পেলে তো ভাগ্য খুবই ভাল। তারপরেও যাওয়ার সুযোগ থাকবে আমার। যাও।'

'বসে না থেকে রাতের রান্নাটা সেরে ফেলো। তুষার গলিয়ে পানিও বের করা লাগবে খাওয়ার জন্যে।'

'সবই করব। নিশ্চিন্তে চলে যাও।'

'ক্যাপ্টেন,' ওমর বলল, 'আপনি বাঁয়ে যান, পানির ধার ঘেঁষে। কিছু দেখলে চিৎকার করে ডাকবেন আমাকে। আপনার পরেই আমি থাকব।'

'ঠিক আছে।'

'কিশোর, তুমি ডানে ঘুরে যাও। বেশি সরতে যেয়ো না। কিছু দেখলে তুমিও ডাকবে আমাকে। আমি কিছু দেখলে, আমিও ডাকব। তিনজনের সঙ্গেই তিনজনের যোগাযোগ রাখতে পারব এভাবে।'

'হ্যাঁ, ভাল বুদ্ধি।'

'চলো, বেরোই।'

দেখতে অতটা খারাপ মনে না হলেও বাস্তবে যে কতটা কঠিন, ক্যাম্পবেলের এ কথার প্রমাণ পেতে দেরি হলো না কিশোরের। যতটা ভেবেছিল, অবস্থা তারচেয়ে অনেক খারাপ। তবে এর একটা ভাল দিকও আছে, পরিশ্রম বেশি হলে গা গরম থাকে। হাঁটতে গিয়ে আরেকটা ব্যাপার লক্ষ করল, তুষারের গুঁড়োতে গভীর পায়ের ছাপ রেখে যাচ্ছে, দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে যেটা; এ চিহ্ন ধরে তাঁবুতে ফিরে যেতে সুবিধে হবে।

কোথাও গোড়ালি ডোবে, কোথাও কোমর সমান তুষার, কোথাও বা একেবারেই নেই। এটা দেখে উপলব্ধি হলো, কি একটা অসাধ্য সাধন করতে এসেছে। এ রকম বরফের মধ্যে তুষারে ঢাকা একটা জাহাজের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব মনে হতে লাগল তার কাছে। উঁচু হয়ে থাকা টিলাটক্করগুলোর যে কোনটার নিচে ঢাকা পড়ে থাকতে পারে ওটা, বোঝার কোনই উপায় নেই। তবু নিরাশ হলো না সে। আশা ছেড়ে দিলে কোন কাজই সম্ভব হয় না।

বাঁয়ে, সিকি মাইল দূরে দেখা যাচ্ছে ওমরকে; সাদা কার্পেটে কালো গুবরেপোকার মত। হঠাৎ আর দেখা গেল না। বোধহয় কোন টিলার আড়ালে চলে গেছে। কয়েক মিনিট পরও যখন দেখা গেল না ওকে, কিছু করবে কিনা ভাবতে লাগল কিশোর। কিন্তু নিজের জায়গা ছেড়ে, খোঁজা বাদ দিয়ে অন্য কিছু করতে যাওয়াটাও ঠিক মনে হলো না। পেছনে তাকাতে নতুন অস্বস্তিতে পড়তে হলো যখন দেখল তার ফেলে আসা পায়ের চিহ্নগুলো মুছে যাচ্ছে। তুষার যে দ্রুত নড়ে, অন্তত ওপরিভাগটা, তার প্রমাণ দেখতে পেল। সমস্যা আরও আছে। ওপরের দু'এক ইঞ্চি তুষার ক্রমাগত বাতাসে উড়তে থাকে, তাতে এক ধরনের ঝিলিমিলি তৈরি হয়, স্পষ্ট দেখাও যায় না ওপরটা। তবে ঝিলিমিলি নিয়ে মাথা ঘামাল না বিশেষ। আলো এখনও চমৎকার। দেখা যায় সবকিছু। মুখের কাছে হাত জড় করে ওমরের উদ্দেশে একটা চিৎকার ছুঁড়ে দিল সে। তাকিয়ে রইল দেখার জন্যে বরফের স্তূপ বা টিলার ওপাশ থেকে বেরিয়ে আসে কিনা ওমর।

এল না। ধীরে ধীরে একটা সন্দেহ মাথাচাড়া দিতে শুরু করল মনে। ফিরে তাকাল সূর্যের দিকে। নেই ওটা। ধূসর দিগন্ত। কিছু একটা ঘটছে। কি, বুঝতে পারল না। সব কিছু ঠিকমত দৃষ্টিগোচর হচ্ছে তো? নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না এখন। চিৎকার করে ডাকল ওমরকে। কান পেতে রইল জবাবের আশায়। পেল না। পেছনে ফিরে হাঁটতে শুরু করল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।

অনুমান করল, তাঁবু থেকে মাইল দুয়েক দূরে এসেছে। এক ঘন্টার বেশি লেগেছে আসতে। কোনদিকে যেতে হবে জানে। তারপরেও অস্বস্তিবোধটা যাচ্ছে না। ফিরে তাকিয়ে যখন দেখল তার পায়ের ছাপ মুহূর্তে মুছে দিচ্ছে উড়ন্ত ঘূর্ণায়মান তুষারকণা, অস্বস্তি আরও বেড়ে গেল। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল।

শীঘ্রিই বুঝতে পারল, দৃষ্টিগোচর হওয়ার ব্যাপারটা মোটেও স্বাভাবিক নয়।

অথচ ও ভেবেছিল সব কিছুই বুঝি ঠিকঠাক আছে। গাধা মনে হলো নিজেকে। আধঘণ্টা ধরে এক অদ্ভুত সাদা পৃথিবীর মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গলদঘর্ম হলো, যে ব্যাপারটা সম্পর্কে সাবধান করেছিলেন ক্যাম্পবেল, কিন্তু গুরুত্ব দেয়নি সে। দূরে গুলির শব্দ শুনল মনে হলো কয়েকবার, কিন্তু সত্যি গুলি, না বরফ ভাঙার শব্দ, নিশ্চিত হতে পারল না।

সামনে বরফ ভাঙার পরিচিত শব্দ হতে থমকে দাঁড়াল। বরফে বরফে ঘষা লাগার শব্দও হচ্ছে। তারমানে ভাসমান বরফ। আর ভাসমান মানে পানির কিনারে চলে এসেছে সে। তাহলে তাঁবুটা কাছাকাছিই কোথাও আছে। কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেছে তার। এই বরফের রাজ্যে কোন কিছুকেই আর বিশ্বাস নেই। হেঁটে চলল ধীরে ধীরে। সামনে তিরিশ ফুট উঁচু একটা বরফের ধোঁয়াটে দেয়াল চোখে পড়ল। তার ওপাশে সাগর।

দাঁড়িয়ে গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবার চেষ্টা করল। সামনে পানি। তারমানে তাঁবুটা দূরে নয়। কিন্তু কোনদিকে? ডানে, না বাঁয়ে? চিৎকার করে রবিনের নাম ধরে ডাকল। সাড়া নেই। আবার ডাকল। আবার। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে। সবচেয়ে অবাক হচ্ছে, গুলি করে জানান দিচ্ছে না কেন রবিন? আবহাওয়া এ রকম করে বদলে গেলে, সবকিছু পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর না হলে তো তার গুলি করার কথা। কোন দিকে যাবে ঠিক করতে পারছে না। ভুল করলে ক্যাম্প থেকে দূরে সরে যাবে। ফেরা তখন আরও কঠিন হয়ে উঠবে।

ভেবেচিন্তে একটা বুদ্ধি বের করল। বরফের দেয়ালটা ধরে হেঁটে যাবে পনেরো মিনিট। এর মধ্যে তাঁবুটা খুঁজে না পেলে উল্টোদিকে ঘুরে হাঁটা শুরু করবে। আবার পনেরো মিনিট হাঁটলে যেখানে রয়েছে সেখানে ফিরে আসবে। তাতে এখনকার চেয়ে অবস্থা খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা আর থাকবে না।

মনস্থির করে নিয়ে ঘড়িতে সময় দেখে হাঁটতে শুরু করল সে। টানটান হয়ে উঠেছে স্নায়ু। হঠাৎ কুয়াশার ভেতর থেকে বিশাল ধূসর একটা ছায়া অদ্ভুত ভঙ্গিতে নেচে নেচে এগিয়ে আসতে শুরু করল তার দিকে। আরও কাছে আসার পর চিনতে পারল, ওয়েডেল সীল। আকাশ থেকে দেখে এতটা বড় প্রাণী মনে হয়নি এগুলোকে। তাকে দেখে থমকে গেল সীলটা। আগে বোধহয় কখনও মানুষ দেখেনি। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বিচিত্র ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দ করতে করতে সরে যেতে লাগল। কিশোরের কাছ থেকে কয়েক গজ দূরে গিয়ে বরফের মাঝখানে গোল একটা ডোবার মধ্যে ডাইভ দিয়ে পড়ে হারিয়ে গেল।

সাদা পৃথিবীটা যেভাবে অজান্তেই তৈরি হয়েছিল, তেমনি করেই দূর হয়ে গেল আবার। দৃষ্টিগোচর হতে লাগল আবার সবকিছু। কথার শব্দ কানে এল। সে চিৎকার করে ডাকতে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া এল। শব্দ লক্ষ করে এগিয়ে যেতে চোখে পড়ল পরিচিত তাঁবুটা। রবিনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে ওমর আর ক্যাম্পবেল।

'কোনদিক চলে গিয়েছিলে?' জিজ্ঞেস করল ওমর।

'চলে যাইনি,' কিশোর বলল, 'হারিয়ে গিয়েছিলাম।'
'কোথায়?'
'কুয়াশার মধ্যে।'
'কিসের কুয়াশা?'
অবাক হলো কিশোর, 'কিসের কুয়াশা মানে? জানেন না?'
'না।'
'কুয়াশা দেখেননি, সত্যি?'
'হালকা একটুখানি ছিল একজায়গায়, তবে এত সামান্য পাত্তাই দিইনি। হঠাৎ গায়েব হয়ে গেলে তুমি। সেটাকেও গুরুত্ব দিইনি। ভাবলাম টিলা বা চাঙড়ের আড়ালে চলে গেছ। হাত নেড়ে ক্যাম্পবেলকে ইশারা করে ক্যাম্পে ফিরে এলাম।'
'আমি ঢুকে পড়েছিলাম ঘন কুয়াশার মধ্যে। এত ঘন, কোন কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।'
'অবাক কাণ্ড!'
'তুমি যেখানে ঢুকেছিলে,' ক্যাম্পবেল বললেন, 'সেখানে বাতাস বোধহয় অন্যরকম ছিল। এখানে বাতাসের গতিবিধির ওপর নির্ভর করে কুয়াশা, সামান্য একটু তারতম্য হলেই ঘন কুয়াশা পড়তে শুরু করে।'
'বাতাসেই করুক আর যেটাতেই করুক, শেষ দিকে তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম।' রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, 'গুলির শব্দ শোনার অপেক্ষায় ছিলাম আমি।'
'প্রয়োজন মনে করিনি,' জবাব দিল রবিন। 'আমার এখানে তো কুয়াশা ছিল না। ওমরভাই আর মিস্টার ক্যাম্পবেলকেও আসতে দেখতে পাচ্ছিলাম। ভাবিইনি তুমি বিপদে পড়েছ।'
'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর, 'আমি নিজেও জানতাম না। অনেক পরে বুঝেছি।'
'জাহাজের মত কিছু চোখে পড়েছে?' জিজ্ঞেস করল ওমর।
'নাহ্। আপনার?'
মাথা নাড়ল ওমর। 'না, আমারও পড়েনি। শুধুই বরফ আর বরফ। ক্যাপ্টেনও কিছু দেখেননি।'
'জাহাজটাকে এবার খুঁজে পেলে ভবিষ্যতে কোন কাজকেই আর অসম্ভব ভাবব না।'
'দেখা যাক কাল চেষ্টা করে, তোমার ভবিষ্যতের সব কিছুকেই সম্ভব করে দেয়া যায় কিনা,' হাসল ওমর। 'এখন এসো, কিছু খেয়ে নেয়া যাক।'

পাঁচ

পরের তিনটে দিন ব্যর্থ খোঁজা খুঁজে বেড়াল ওরা। কেউ মুখফুটে কিছু বলছে না, কিন্তু জানে আরেকজন কি ভাবছে। কোন আশা নেই।

রোজ দু'তিনবার করে গিয়ে বিমানের ইঞ্জিনটা স্টার্ট দিয়ে গরম করে ওমর। তুষার এখন পর্যন্ত ক্ষতি করতে পারেনি ওটার। লুব্রিকেশন সিসটেমটা নিয়েই বেশি ভয় তার। তবে এখনও ঠিকই আছে। বাকি তিনজনের জন্যে কুমেরুর দিনগুলো বড়ই দীর্ঘ আর একঘেয়েমিতে ভরা। কিছু ঘটছে না। আবহাওয়ার পরিবর্তন নেই। খোলা পানির দিক থেকে ভেসে আসে কেবল বরফ ভাঙার শব্দ আর ঘষা লাগার বিচিত্র গর্জন।

একটা ব্যাপারে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতেই হয়, সব কিছুই দৃশ্যমান রয়েছে। চলাফেরা করতে গিয়ে পথ হারানোর তেমন ভয় নেই। প্রথম দিন কিশোরের বেলায় যে সমস্যাটা হয়েছিল, সেরকম যাতে আর কারও না ঘটে তার একটা সহজ সমাধান বের করেছে সে। প্যাকিং কেসের কাঠ ভেঙে লম্বা লম্বা ফালি করেছে। বেরোনোর সময় কিছু কিছু করে সঙ্গে নেয় সবাই। চলার পথে কিছুদূর পর পর একটা করে কাঠ পুঁতে রেখে এগোয়। পরে সেগুলো দেখে ফিরে আসাটা সহজ। এতে আরও একটা সুবিধে। কেউ যদি বিপদে পড়ে, সময়মত না ফেরে, অন্যেরা চিহ্ন দেখে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে আনতে পারবে।

আশেপাশের বেশির ভাগ জায়গাই দেখা হয়ে গেছে, খুব সামান্যই বাকি আছে আর। সেটুকু দেখা হয়ে গেলে কয়েক মাইল পুবে তাঁবু সরিয়ে নেয়ার চিন্তা-ভাবনা করছে ওরা।

দূরে বসে ব্যর্থতার খবর পেয়ে পেয়ে মুসা আর রোজারও এখন হতাশ। সবচেয়ে বেশি হতাশ ক্যাপ্টেন ক্যাম্পবেল। নিজের পর্যবেক্ষণের ওপর আস্থা হারিয়েছেন তিনি। ভাবছেন, লগবুকে অবস্থান টুকে রাখার সময় ভুল করেননি তো? ভুল জায়গায় নামেননি তো? তবে ওমর হতাশ হয়নি। হতাশ হয়নি কিশোরও। এ সব কাজে ধৈর্য রাখতে হয়। সবচেয়ে বড় কথা, এখনও সুস্থ রয়েছে ওরা। ঠাণ্ডা ওদের কিছু করতে পারেনি। ক্লান্ত হয়ে পড়েনি ওরা। বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভাল লাগছে। কুমেরুকে এভাবে কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়ে ভাগ্যবান ভাবছে নিজেদের।

চারদিনের দিন সকালে শেষবারের মত খুঁজতে বেরোল ওরা। এদিন কিশোর, রবিন আর ক্যাম্পবেল বেরোলেন; তাঁবু পাহারা দিতে আর রান্না করতে রয়ে গেল ওমর। ক্যাম্পবেল গেলেন বাঁয়ে, কিশোর মাঝে আর রবিন ডানে।

সাগরতীরে বরফের পাহাড়ের কিনার ধরে এগিয়ে চলল রবিন। একশো গজ পর পর একটা করে কাঠ পোঁতে বরফে। আঠারো ইঞ্চির মত বেরিয়ে

থাকে মাথাটা। গতি খুব ধীর। এর কয়েকটা কারণ। পানি আর বরফের সীমারেখা ধরে হাঁটতে হচ্ছে তাকে। কেমন একটা অসমাপ্ত জিগ্-স পাজলের মত হয়ে আছে জায়গাটা। এতে সরাসরি সমান জায়গা দিয়ে গেলে যতটা হাঁটতে হত, তারচেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি হাঁটতে হচ্ছে। পানির কিনারে বলে বরফ মোটেও সমতল নয়। পানির দিকের চাপেই হোক, কিংবা নিচের চাপেই হোক, করোগেটেড টিনের মত ঢেউখেলানো হয়ে গেছে বরফ। ঢেউগুলো কোথাও এত উঁচু, ওপাশে কি আছে চোখে পড়ে না। আকাশের রঙ ধূসর। অনেক ওপরে মেঘের স্তর। এত ওপর থেকে কখনও বৃষ্টি নামে না।

ঢেউ পেরিয়ে আসতে গিয়ে পরিশ্রমে ঘামতে শুরু করল সে। পেছনে তাকিয়ে তাঁবুটা আর চোখে পড়ে না এখন, বরফের দেয়ালের জন্যে। না পড়ুক, ভাবনা নেই, কাঠের চিহ্ন তো রেখেই আসছে। জাহাজটা খুঁজে পেলেই হয়।

কোথায় আছে ওটা? এদিকে কি সত্যি আছে? জায়গা চিনতে ক্যাম্পবেল ভুল করেননি তো? শেষবার জাহাজটাকে যেখানে দেখা গেছে, তখন পানির সীমারেখা যেখানে ছিল, সেবমত তারচেয়ে পানির অনেক কাছে রয়েছে সে। জাহাজটা ছিল পানি থেকে মাইলখানেক ভেতরে, সে এখন রয়েছে একশো গজ ভেতরে। এখানে থাকার কথা নয় জাহাজটা। তবে এটা মাটিও নয় যে সাগরের সীমারেখা বহুকাল ধরে একই রকম থাকবে। বরফ ক্রমাগত ভাঙছে। ভাঙতে ভাঙতে যদি পানির সীমারেখা ভেতরের দিকে সরে যেতে থাকে তাহলে জাহাজটা চলে আসবে পানির কাছাকাছি।

সামনে বরফের স্তূপ আর ঢেউয়ের ছড়াছড়ি। ওগুলোর কাছাকাছি আসতে হাঁটুতে বাড়ি লাগল কি যেন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আলোর কারসাজি আর ছায়ার জন্যে এখানে অনেক সময় একহাত সামনের জিনিসও চট করে চোখে পড়ে না। অন্ধকারে যেমন সামনে পড়ে থাকা জিনিস অদৃশ্য হয়ে থাকে, সাদা আলোর মধ্যেও থাকে। বিড়বিড় করে গাল দিয়ে হাঁটু ডলার জন্যে নিচু হলো সে। নজরে পড়ল জিনিসটা। কৌতূহল জাগাল। জিনিসটা বরফই, তবে আকৃতিটা অদ্ভুত, ক্রুশের মত। সবচেয়ে কাছের গির্জাটাও এখান থেকে হাজার মাইলের বেশি দূরে, এখানে বরফের ক্রুশ বানাতে আসবে কে?

ওটার দিকে তাকিয়ে রইল সে। কি যেন মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ছে না। হঠাৎ মনে পড়ল গল্পটা। স্টারি ক্রাউনের সঙ্গে সম্পর্কিত। একজন লোক তার সঙ্গীকে খুন করে বাইরে নিয়ে গিয়ে কবর দিয়েছিল। নিশ্চয় ক্রুশ গেঁথে দিয়েছিল কবরের ওপর।

বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে। কোমর থেকে বড় হান্টিং নাইফটা খুলে নিয়ে কোপ দিল ক্রুশের বরফে। কয়েক কোপেই ঝরিয়ে দিল ওপরের বরফ। বেরিয়ে পড়ল কাঠ। দুই মিনিটের মধ্যে জেনে গেল কার কবর ওটা। কাঠের মধ্যে ছুরি দিয়ে কেটে খোদাই করে লেখা হয়েছে :

জন ম্যানটন

নামটা পড়া যায় কোনমতে, তবে মৃত্যুর সাল-তারিখ কিছু বোঝা যায় না।

যেটুকু বুঝেছে, যথেষ্ট। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কপালের ঘাম মুছল সে। হাতটা কাঁপছে। ওর পায়ের নিচেই একশো বছরেরও বেশি পুরানো একটা লাশ রয়েছে, বরফের মধ্যে থাকায় অবিকৃত; ভাবনাটাও অস্বস্তিকর। ওর মতই সোনার সন্ধানে এসেছিল লোকটা, আর কোনদিন ফিরে যেতে পারেনি, শেষ ঠাঁই হয়েছে এই সীমাহীন বরফের রাজ্যে।

গায়ে কাঁটা দিল ওর। চারপাশে তাকাল। মনে হলো আগের চেয়ে ঠাণ্ডা বেড়ে গেছে। সব কল্পনা! গা ঝাড়া দিয়ে যেন দূর করে দিতে চাইল ভয় ধরানো ভাবনাগুলো। আসল কথা ভাবতে চাইল। খুনটা হয়েছে জাহাজের কাছাকাছি। একজন লাশটাকে বেশি দূর বয়ে নিতে পারেনি লাস্ট, কিংবা প্রয়োজনই মনে করেনি।

এর মানেটা কি?

কাছাকাছিই আছে জাহাজটা!

উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন। আবার চারপাশে তাকাতে শুরু করল। প্রথমে বরফের স্তূপই মনে হলো ওটাকে। তীক্ষ্ণ হলো ওর দৃষ্টি। ধীরে ধীরে রূপ নিতে শুরু করল আকৃতিটা। বরফে এমন করে ঢেকে রয়েছে, জাহাজের খোল আর ডেক বলে মনেই হয় না।

পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে যেন রবিন। অদ্ভুত এক অনুভূতি হচ্ছে বুকের মধ্যে। কল্পনাই করেনি জাহাজটাকে এভাবে পেয়ে যাবে সে। দুর্বল লাগছে হাঁটু দুটো। গা কাঁপছে। কি করবে এখন? ফিরে গিয়ে জানাবে সবাইকে? জাহাজটা পেয়েছে বললে, প্রথমেই জানতে চাইবে সবাই, সোনাগুলো আছে তো ভেতরে?

সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হলো না। জাহাজটা যখন পেয়েছে, ভেতরে সোনাগুলো আছে কিনা সেটাও দেখে যাবে এখনই।

কাত হয়ে আছে জাহাজটা। বরফে ঢাকা ডেকে উঠতে গিয়ে কয়েকবার পা পিছলে পড়ল। পা ভাঙার ভয়ে শেষে ওভাবে ওঠার চেষ্টা বাদ দিল। কতটা পুরু হয়ে জমেছে বরফ বোঝার উপায় নেই।

উঠবে কি করে?

খুঁজতে খুঁজতে অদ্ভুত একসারি সিঁড়ির ধাপ চোখে পড়ল তার। বরফ কেটে তৈরি করেছে, জাহাজে ওঠার জন্যে। সেটা বেয়ে সহজেই উঠে এল। সিঁড়ির মাথার শেষ ধাপটার কাছ থেকে কম্প্যানিয়নওয়ে চলে গেছে। তাতে মানুষ চলাচলের চিহ্ন। অবাক হলো না। সোনার খোঁজ পাওয়ার পর বহুবার এ জাহাজে মানুষ উঠেছে। মাসের পর মাস বসবাস করেছে।

কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে এগোলে কিছুটা সামনে উঁচু হয়ে আছে বরফ, নিশ্চয় নিচে নামার পথের ঢাকনা-টাকনা হবে। কাছে এসে দেখল, তার ধারণাই ঠিক। ঢাকনাটা নেই এখন, তার জায়গায় গোল করে বরফ কেটে ফোকর করা হয়েছে, গুহার প্রবেশ মুখের মত। সেখান থেকে নেমে যাওয়া কাঠের সিঁড়িতে বরফ জমে আছে। মানুষের তৈরি এক অদ্ভুত গুহা, কল্পনাকে হার মানায়।

সাবধানে সিঁড়িতে পা রাখল সে। পিছলে পড়লে কোমর ভাঙবে। নিচে নামতে শুরু করল। চারপাশে তাকিয়ে মনে হচ্ছে ওর, জাহাজটা শুধু বরফেই তৈরি, কাঠ বা কোন রকম ধাতু নেই। আজব এক পরীরাজ্যের মত লাগছে ভেতরটা। আলো আসছে ওপর থেকে। বরফের ভারে ধসে পড়েছে ডেক, মস্ত এক গর্ত হয়ে আছে সেখানটায়; আলো আসছে সেই ফোকর দিয়ে। ভেতরে নানা রকম মূর্তি তৈরি করেছে বরফ, বিচিত্র সব আকৃতি। ছাত থেকে ঝুলছে বরফের ঝাড়বাতি, যদিও আলো নেই সেগুলোতে। হাঁ করে তাকিয়ে দেখতে দেখতে কোথায় আছে ক্ষণিকের জন্যে ভুলে গেল সে।

একটা করিডর চোখে পড়ল। এগিয়ে গেল সেটা ধরে। পা টিপে টিপে, যতটা সম্ভব নিঃশব্দে। একটা ঘরে এসে ঢুকল। নাবিকদের মেসরুম। থালা-বাসন, কাপ, চামচ পড়ে আছে টেবিলে, যেন সেদিনই রাখা হয়েছে। খাবারের টিন খোলা। একটা বিস্কুট আর এক টুকরো গরুর মাংস তুলে নিয়ে শুঁকে দেখল। তাজা। বরফের রাজ্যটা বিশাল এক রেফ্রিজারেটর। কোন কিছু নষ্ট হয় না এখানে, পচে না।

কয়েকটা কেবিনে উঁকি মেরে দেখল। সবগুলোর দরজা হাঁ করে খোলা। আগ্রহ জাগানোর মত কিছু দেখা গেল না ওগুলোতে। একটা ঘরে বাংকের ওপর কম্বল দলামোচড়া হয়ে পড়ে আছে, যেন এইমাত্র ওটার নিচ থেকে উঠে গেছে কোন মানুষ। শেষের একটা ঘর দেখা গেল, অন্য সব ঘরের চেয়ে বড়। বরফের ছড়াছড়ি এখানেও, কিন্তু দেয়ালের বরফের সঙ্গে পানি দেখে বোঝা যাচ্ছে গলেছে। বরফ গলে গরমে। গরমটা লাগল কি করে! আগুন জ্বাললেই কেবল হতে পারে এ রকম। কিন্তু এখানে আগুন জ্বালতে আসবে কে?

ঘরের মাঝখানে বড় একটা টেবিল। তাতে চোখ পড়তেই স্থির হয়ে গেল চোখ। কালো কালো কিছু জিনিস স্তূপ হয়ে আছে। আকারটা ইঁটের মত। সোনার বার! কিন্তু সোনা তো হয় হলুদ, কালো নয়।

টেবিলের কাছে এসে একটা ইঁট তুলে নিতে গেল। ভীষণ ভারী। বুকের মধ্যে হাতুড়ির বাড়ি পড়তে শুরু করল যেন। ওর জানা আছে আয়তনের তুলনায় এ রকম ভারী হয় কোন ধাতু। ছুরি বের করে আঁচড় কাটল জিনিসটার গায়ে। ওপরের কালো রঙ কেটে গিয়ে ঝলমল করে উঠল ভেতরের হলুদ রঙ। বরফের মধ্যে শ্যাওলা বা ছত্রাক জাতীয় কিছু পড়ে ওপরটা কালো করে দিয়েছে। উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে সে।

সোনা!

পেয়ে গেছে সোনাগুলো!

মৃদু একটা শব্দ কানে এল। বরফের টুকরো ভেঙে পড়ার মত। গুরুত্ব দিল না। চারপাশে ছড়ানো বরফ, একআধটা টুকরো ভেঙে পড়ে শব্দ হতেই পারে। গুপ্তধন আবিষ্কারের আনন্দ আর নেশায় আশেপাশের কোন কিছুকেই পাত্তা দিতে চাইল না। দেখি... সবাইকে চমকে দেয়ার জন্যে খানিকটা সোনা তাঁবুতে নিয়ে যেতে চাইল ... আস্ত একটা বার নেয়া কঠিন কাজ। যেটা তুলতেই কষ্ট হয়, একা বয়ে নিতে ... বেরিয়ে যাবে। ছুরির উল্টোদিকের

করাতের মত ধারটা দিয়ে কাটতে শুরু করল। খাঁটি সোনা নরম হয়। কাটতে অসুবিধে হচ্ছে না। ছুরিটা সহজেই বসে যাচ্ছে দেখে হাসি ফুটল মুখে।

হঠাৎ মুছে গেল হাসিটা। আবার কানে এল সেই শব্দ। এবার আর বরফ ভাঙার মত নয়। হাসির শব্দের মত। আতঙ্কের ঠাণ্ডা শিহরণ যেন খামচে ধরল তার পিঠ, মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে যেতে লাগল শিরশির করে। কুসংস্কার নেই তার। ভূত বিশ্বাস করে না। তবু পলকের জন্যে ভাবনাটা খেলে গেল মাথায়, 'ম্যানটনের প্রেতাত্মা না তো!'

চারপাশে তাকাল। কোন কিছু নড়তে দেখল না। অখণ্ড নীরবতা।

নিজেকে বোঝাল, ভুল শুনেছে। কিংবা বাইরে থেকে এসেছে। হাসির শব্দের মত হলেও ওটা হাসি নয়, উড়ে যাওয়ার সময় স্কুয়া ডেকে উঠেছে। কিন্তু বুঝতে চাইল না মন। ভাল করেই জানে, স্কুয়া ওরকম শব্দ করে না। হাসিটা মানুষের।

'ধূর! মুসার রোগে ধরেছে!' বলে নিজেকে ধমক দিয়ে আবার ছুরি চালাতে শুরু করল সে। দু'তিনটে পোঁচ দিতে না দিতেই চোখের কোণ দিয়ে একটা ছায়া সরে যেতে দেখল সাঁৎ করে। আবার মনকে বোঝানোর জন্যে নানা রকম যুক্তি, 'ফোকর দিয়ে মেঘের ছায়া পড়ল নাকি?' কিন্তু মেঘের ছায়া পড়বে কি করে? আকাশের রঙ ধূসর। সূর্য নেই। মেঘও এত ওপরে, ছায়াই পড়বে না, সরে যাওয়া তো পরের কথা।

আবার পিঠ খামচে ধরল ভয়ের বরফ-শীতল অদৃশ্য আঙুলগুলো। ভূতের ভয়ে কাবু হয়ে যাচ্ছে বলে নিজেকে আবার ধমক লাগাল। কিন্তু কাজ হলো না কোন। ভয়টা গেল না।

আবার বার কাটতে শুরু করল। মন দিতে পারল না কোনমতেই। বার বার চোখ দুটো চলে যেতে চায় ঘরের শেষপ্রান্তে, যেদিকে ছায়াটাকে সরে যেতে দেখেছে।

দৃষ্টিটা স্থির হয়ে গেল হঠাৎ। বরফের পাশ দিয়ে বেরিয়ে আছে যেন আধখানা মানুষের মুখ। তাতে একটামাত্র চোখ বসানো। মুখটা মড়ার মুখের মত সাদা। গভীর কোটরে বসে থেকে চোখটা আগুনের মত জ্বলছে তার দিকে তাকিয়ে।

ছয়

কতক্ষণ সম্মোহিতের মত চোখটার দিকে তাকিয়ে ছিল সে বলতে পারবে না। আচমকা গলা চিরে বেরিয়ে এল চিৎকার। একটা মুহূর্ত আর দাঁড়াল না সেখানে। ঘুরে দিল দৌড়। পড়িমরি করে চলে এল সিঁড়ির কাছে। কিভাবে যে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল, তা-ও বলতে পারবে না। এ ভাবে দৌড়ে ওঠার

যে ঝুঁকি রয়েছে, পা পিছলে পড়লে হাঁটু ভাঙতে হবে, মনেই রইল না। যাই হোক, নিরাপদেই বেরিয়ে এল ডেকে। আবারও পা ভাঙার ভয় না করে বরফের সিঁড়ি বেয়ে নেমে তাঁবুর দিকে ছুটল। ছুটতে ছুটতে বার বার পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখল, ভূতটা তাকে ধরতে আসছে কিনা।

তাঁবুটা চোখে পড়তে আবার স্বাভাবিক হয়ে আসতে লাগল তার মন। ভূতের ভয় কেটে যেতে শুরু করল।

ক্যাম্পে ফিরে দেখল কিশোর আর ক্যাম্পবেল ফিরে এসেছেন। তাঁর অবস্থা দেখে অবাক হয়ে তাকাল সবাই। কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

হাঁপানোর জন্যে প্রথমে কিছু বলতেই পারল না রবিন। তাকে শান্ত হওয়ার সময় দেয়া হলো। দুধ মেশানো ব্র্যান্ডি খেতে দিল ওমর।

খেয়েটেয়ে সুস্থির হয়ে সব কথা খুলে বলল রবিন।

প্রথমে তো বিশ্বাসই করতে চাইল না কেউ। তারপর কিশোর বলল, 'চলো, এখনই যাব।'

'এখনই' বললেও তখুনি রওনা হওয়া গেল না। গেল না মানে যেতে দিল না ওমর। বলল, 'পাওয়া যখন গেছে এত তাড়াহুড়া নেই। দুপুরের খাওয়া খেয়ে তারপর বেরোব।'

আবার যখন বেরোল ওরা, বিকেল শেষ হয়ে এসেছে, অবশ্য ঘড়ির কাঁটায়। সূর্য দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। আবার দিগন্তের কাছে মস্ত একটা লাল বলের মত ঝুলে থাকতে দেখা যাচ্ছে সূর্যটাকে। আকাশ পরিষ্কার। কিন্তু যন্ত্রপাতি দেখে ক্যাম্পবেল বললেন, তাপমাত্রা বাড়ছে। আবহাওয়ার এই পরিবর্তনে ঘন কুয়াশার সৃষ্টি আর সেই সঙ্গে প্রবল তুষারপাত হতে পারে।

রবিনকে ক্যাম্প পাহারায় রেখে আসা হয়েছে। রেখে আসার কারণ, তার ওপর দিয়ে ধকল গেছে। খানিক বিশ্রাম দরকার। কাঠ পুঁতে চিহ্ন রেখে গেছে রবিন, ওকে ছাড়াই জাহাজটা খুঁজে বের করতে পারবে কিশোররা।

চিহ্নগুলো না সরিয়ে খুব ভাল করেছে রবিন। জাহাজটার কাছে ফিরে আসতে কোন অসুবিধে হলো না ওদের। বরফের ওপর কাত হয়ে পড়ে থাকা ক্রুশটার কাছে এসে থামল ওরা। তুলে নিয়ে খোদাই করে লেখা নামটা পড়ল কিশোর।

জাহাজটা দেখতে পেল। আগে আগে চলল ওমর। ঠিক তার পেছনেই রয়েছে কিশোর। খোলের গা ঘেঁষে তৈরি রাখা বরফের সিঁড়িটার দিকে হাত তুলে ইঙ্গিত করল নীরবে।

ডেকে উঠে এল ওমর। কিশোর আর ক্যাম্পবেলও উঠে এলে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'এখানে দাঁড়ান।' একা এগোল গর্তটার দিকে। নিচে উঁকি দিয়ে শিস দিয়ে উঠল। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে কিশোরকে বলল, 'দারুণ দৃশ্য!' আবার গর্তের নিচে তাকিয়ে চিৎকার করে ডাকল, 'এই, কেউ আছেন?'

সাড়া দিল না কেউ।

চোখের কোণ দিয়ে ডেকের শেষ মাথায় একটা নড়াচড়া দেখতে পেল কিশোর। ঝট করে ফিরে তাকাল। কালো বলের মত একটা জিনিস। কসম

খেয়ে বলতে পারে, মুহূর্ত আগেও ছিল না ওটা ওখানে। মানুষের মাথা নাকি? চুল লেপ্টানো মুখের একটা অংশ দেখতে পাচ্ছে বলে মনে হলো তার। ভাল করে দেখার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা।

রবিন কেন দৌড় দিয়েছিল বুঝতে অসুবিধে হলো না কিশোরের। একা হলে এখন সে নিজেও ছুটে পালাত। এ রকম পরিবেশে এ ধরনের ভূতুড়ে কাণ্ড অতি বড় সাহসীরও বুক কাঁপিয়ে দিতে পারে। অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে।

ফিরে তাকাল ওমর, 'কি হলো?'

ঢোক গিলল কিশোর। 'একটা মাথা। দাড়ি-গোঁফ আর বড় বড় চুলওয়ালা।'

'কোথায়?'

হাত তুলল কিশোর, 'ওদিকে। আমি তাকাতেই সরে গেল।'

'চমৎকার! রবিনের রহস্যময় চোখটা তাহলে একটা মাথাও খুঁজে পেয়েছে এখন! সত্যি দেখেছ?'

'তাই তো মনে হলো।'

সেদিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ডাকল আবার ওমর, 'কে ওখানে?'

এবারও কেউ সাড়া দিল না। দেবে আশাও করেনি সে। দুজনকে দাঁড়াতে বলে এক পা এগোল। হঠাৎ একপাশে ছুঁড়ে ফেলল নিজেকে। কানের পাশ দিয়ে শাঁ করে চলে গেল একটা কুড়াল। কারও কোন ক্ষতি না করে পেছনের বরফ হয়ে থাকা দড়িতে গিয়ে লাগল। বরফের গুঁড়ো আর চটা ছিটকে পড়ল।

উঠে দাঁড়াল আবার ওমর। পকেট থেকে পিস্তল বের করে সামনে তুলে ধরে চিৎকার করে ডাকল, 'অ্যাই, বেরিয়ে এসো!'

জবাবে শোনা গেল উন্মাদের হাসি। ঘাড়ের রোম খাড়া করে দিল কিশোরের। মনে হলো যেন ওদের পায়ের নিচের বরফ ভেদ করে বেরিয়ে আসছে হাসিটা।

ফিরে তাকাল ওমর, 'খোলের মধ্যে কেউ আছে!'

'থাকলে ভূত আছে,' ক্যাপ্টেনের কণ্ঠে অস্বস্তি, 'আর কে হবে?'

'ভূত বিশ্বাস করেন নাকি আপনি?'

'না।'

'ভূত হোক আর যে-ই হোক, পঁয়তাল্লিশ ক্যালিবারের সফট-নোজ বুলেটের সঙ্গে কি করে এঁটে ওঠে দেখতে চাই...'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই জাহাজের গভীর থেকে ভেসে এল গোঙানি মেশানো একটা কণ্ঠ, 'চলে যাও। চলে যাও। সোনাগুলো আমার। আমি নিতে দেব না।'

'জলদি বেরোও!' গর্জে উঠল ওমর। 'নইলে গুলি খাবে!'

ডেকটা যেখানে বরফের ভারে ধসে পড়েছে, সেই গর্ত দিয়ে লাফিয়ে বেরোল একটা মূর্তি। দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখ। লম্বা লম্বা চুল কান ঢেকে দিয়ে গালে এসে পড়েছে। দু'হাতে ধরে রেখেছে একটা সোনার বার। ওমর ভাবল

তার মাথায় ওটা দিয়ে বাড়ি মারতে এসেছে পাগলটা। আরও উঁচু করে ধরল পিস্তল। কিন্তু বাড়ি মারল না লোকটা। সোনার বারটা কাঁধে তুলে নিয়ে দৌড় দিল। কাত হয়ে থাকা পিচ্ছিল ডেকে পিছলে পড়তে পড়তেও পড়ল না। চোখের পলকে ডেক থেকে নেমে হারিয়ে গেল তুষারপাতের মধ্যে। বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে আছে সবাই, বাধা দেয়ার কথাও মনে ছিল না।

সবার আগে নড়ে উঠল কিশোর। চিৎকার করে পিছু নিতে গেল তার।

পেছনে এসে দাঁড়াল ওমর। বাধা দিয়ে বলল, 'পিছু নিয়ে লাভ নেই। এই তুষারে ওকে খুঁজে পাবে না। জায়গাটা আমাদের চেয়ে ভাল চেনে ও।'

'কিন্তু লোকটা কে?' কিশোরের প্রশ্ন।

চিন্তিত ভঙ্গিতে ক্যাপ্টেন বললেন, 'লোকটা কে অনুমান করতে পারছি, দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলের জন্যে যদিও চেনা কঠিন; ও জেনসেন। পছন্দ করত না বলে যাকে ফেলে গিয়েছিল পোত্রাঘাই। তারমানে জেনসেন মরেনি, বেঁচে আছে।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল কিশোর, 'চোখ রহস্যের সমাধান তাহলে হয়ে গেল।'

নিচে ফিরে এল আবার তিনজনে। রবিনের কথামত ঘরটা খুঁজে বের করল। টেবিলটাও আছে। কিন্তু তার ওপরে সোনার বারগুলো নেই। গেল কোথায়?

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। ওমর আর ক্যাম্পবেলের দিকে তাকাল, 'কোথায় আছে, জানি। আসুন আমার সঙ্গে।'

জেনসেন যেখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল সেখানে এসে দাঁড়াল সে। নিচে নামার সিঁড়ি কেটে রেখেছে এখানেও। নিচে নেমে বরফের একটা গর্ত দেখিয়ে বলল, 'ওই দেখুন। টেবিল থেকে সরিয়ে এনে সোনাগুলো লুকিয়ে ফেলতে চেয়েছিল জেনসেন। কাজ শেষ করতে পারেনি। আমরা আসতে আর আধঘণ্টা দেরি করলেই গর্তের মুখ বরফ দিয়ে বন্ধ করে দিত সে। কোনদিনই হয়তো আর খুঁজে পেতাম না এগুলো।'

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন ক্যাপ্টেন। দুই হাত প্যান্টের পকেটে। 'নেব কি করে এখন? তাঁবুতে বয়ে নিতে জান কাবার হয়ে যাবে।'

'অত কষ্ট করতে যাচ্ছিও না,' ওমর বলল। 'প্লেনটাই নিয়ে আসব এখানে। জাহাজের কাছাকাছি রেখে তাতে নিয়ে তুলব।'

'নামাতে পারবেন? জায়গা আছে?'

'আছে।'

'চলুন তাহলে, দেরি করার দরকার নেই। তুষার পড়া বেড়ে গেলে সমস্যা হয়ে যাবে।'

'কিন্তু এখানে সোনাগুলো ফেলে রেখে যাওয়া ঠিক হবে না,' কিশোর বলল। 'জেনসেন ফিরে এসে দেখলে অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলতে পারে।'

ভুরু কুঁচকে তাকাল ওমর, 'তা ঠিক। কি করতে চাও?'

'জাহাজ থেকে বের করে নিয়ে যাই। আমি বসে বসে পাহারা দেব, আপনারা গিয়ে পেনটা নিয়ে আসবেন। মুসাকেও মেসেজ পাঠানো দরকার,

চলে আসুক। একসঙ্গে দুটো প্লেন হলে একবারেই সব সোনা তুলে নিয়ে চলে যেতে পারব, ফিরে আসা লাগবে না আর।'

কিশোরের কথায় একমত হলো ওমর আর ক্যাম্পবেল। কিন্তু সোনাগুলো বের করতে গিয়ে বুঝতে পারল কতটা কঠিন কাজ। একবারে একজনের পক্ষে একটার বেশি বার বয়ে নেয়া সম্ভব হলো না। দু'হাতে বওয়ার চেয়ে কাঁধে তুলে নিলে অনেকটা সহজ হয়, জেনসেনের নেয়া দেখেই বুঝতে পেরেছিল। ওরাও তা-ই করল।

বারগুলোকে বের করে এনে একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে রাখা হলো। তার ওপর বসে পড়ে কিশোর বলল, 'আপনারা চলে যান।'

'সত্যি একা থাকতে পারবে তুমি?' ক্যাপ্টেনের কণ্ঠে অস্বস্তি।

'না পারার কি আছে?'

'জেনসেন পাগল হয়ে গেছে!'

'তাতে কি?' হাসল কিশোর। 'তুষারপাত বাড়লে আমাকে দেখতেই পাবে না জেনসেন। আর কম থাকলে ও যেমন আমাকে দেখতে পাবে, আমিও ওকে দেখতে পাব। পিস্তল তো আছেই পকেটে। পিস্তলকে পাগলেও ভয় পায়, দেখলেনই তো।'

'কিন্তু আমার যাওয়ার কি দরকার আছে?'

'আছে। জিনিসপত্র যা যা দরকার, নিয়ে একবারে চলে আসবেন। শুধু শুধু ওখানে ফিরে যাওয়ার আর কোন মানে হয় না। এখান থেকেই দেশে রওনা হয়ে যাব আমরা।'

'দেশে রওনা হয়ে যাব' কথাটা শুনতে খুব মধুর শোনালেও নিশ্চিত হতে পারল না ওমর। এত সহজে, নির্বিঘ্নে এই বরফের রাজ্য থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে, এটাও বিশ্বাস করতে পারছে না। তা ছাড়া জেনসেনের কি হবে? একজন অসুস্থ মানুষকে একা ফেলে যাওয়াটা ঠিক হবে না মোটেও। যে করেই হোক তাকে খুঁজে বের করে এনে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

'থাক, পরের ভাবনা পরে' ভেবে ক্যাম্পবেলকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল সে।

বসে বসে ওদের যাওয়া দেখল কিশোর। এক টন খাঁটি সোনাকে আসন বানানো–ভাবতেও অবাক লাগল তার। বিশ্বাস হতে চাইছে না। নিচের দিকে তাকাল। তলার বারগুলো দেখা যাচ্ছে না। বরফে ডেবে গেছে। ভারের চোটে ওপরেরগুলোও যাবে শীঘ্রি। এটা দেখেই কথাটা মাথায় এল তার। কোন কারণে বারগুলোকে এখন এ ভাবে ফেলে যেতে বাধ্য হলে ফিরে এসে আর খুঁজে পাবে না। একটা চিহ্ন দিয়ে রাখা দরকার। রবিনের পুঁতে যাওয়া একটা কাঠের ফালির ওপর চোখ পড়ল। তুলে এনে দুটো বারের মাঝে দাঁড় করিয়ে রাখল ওটা। বার দুটো চেপে দিতেই কাত হয়ে পড়ল না আর ফালিটা, দাঁড়িয়ে রইল সোজা হয়ে।

আবার সোনার বিচিত্র আসনে বসল সে। চারপাশে তাকাতে লাগল। সাদা বরফের একঘেয়ে দৃশ্য দেখছে না তার চোখ খুঁজছে পালিয়ে যাওয়া

লোকটাকে। ফিরে আসে কিনা দেখছে।

গড়িয়ে গড়িয়ে কাটছে সময়। ভীষণ ঠাণ্ডা। হাঁটাচলা করলে মোটামুটি সহ্য করা যায়, কিন্তু বসে থাকলে কাঁপুনি তুলে দেয়। তার ওপর ভয়াবহ একঘেয়েমি, নীরবতা আর নিঃসঙ্গতা। এই বরফের রাজ্যে আটকা পড়লে কেন পাগল হয়ে যায় মানুষ, বুঝতে সময় লাগল না তার। মাথার মধ্যে যেন কুরে কুরে খেতে থাকে, একটানা চাপ দিতে থাকে স্নায়ুর ওপর।

দূরে প্লেনটা স্টার্ট নেবার শব্দ কানে আসতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। ইঞ্জিনের পরিচিত শব্দটা যেন মধুবর্ষণ করল কানে। কিছুক্ষণ চলে বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন। আবার চালু হলো। আবার বন্ধ।

কান খাড়া করে ফেলল সে। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে লাগল। চালু হয়ে বন্ধ হচ্ছে কেন? ইঞ্জিনে গোলমাল? উড়তে পারছে না?

অস্থির হয়ে উঠল সে। উদ্বেগটা সহ্য করতে পারছে না। উঠে দাঁড়াল। ঘন ঘন তাকাতে লাগল ক্যাম্পের দিকে। কিন্তু আর শোনা গেল না শব্দ। কিছু দেখাও গেল না। এতক্ষণ উত্তেজনায় লক্ষ করেনি, হঠাৎ খেয়াল করল তুষারপাত বেড়ে গেছে। সমস্ত চরাচর ঢেকে দিতে যেন ওপর থেকে অবিরাম নেমে আসছে তুষারের ধূসর পালকগুলো, মনটাকেও যেন ধূসর করে তুলল তার।

সাত

বিপদেই পড়েছে ওমর। বার বার চেষ্টা করেও বিমানটাকে তুলতে না পেরে শঙ্কিত হলো। শেকড় গেড়ে ফেলেছে যেন বিমানটা। একবিন্দু নড়ছে না। শেকড়? সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলল কি ঘটেছে। রবিন আর ক্যাম্পবেলকে নামতে বলে নিজেও উঠে দাঁড়াল।

তার অনুমান ঠিক। নিচে নেমে একবার তাকিয়েই নিশ্চিত হয়ে গেল। বরফে আটকে গেছে স্কি দুটো। ইস, আগেই ভাবা উচিত ছিল। তুলতে হয়তো পারা যাবে, কিন্তু আগে থেকে ব্যবস্থা নিয়ে রাখলে এই সমস্যায় পড়া লাগত না।

'ইঞ্জিন দিয়ে টেনে তোলা যায় না?' ক্যাপ্টেন বললেন।

'নাহ্, জোর করতে গেলে হঠাৎ যদি খুলে আসে বরফ থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়বে, কিংবা উল্টে যাবে। এখানে ওরকম ডিগবাজি খাওয়ানোর ঝুঁকি নেয়া যায় না।'

'তাহলে কি করবেন?'

এক মুহূর্ত ভাবল ওমর। রবিনের দিকে তাকাল, 'রবিন, ছেনি আর হাতুড়ি বের করো। বরফ কেটে ফেলব।'

বরফের অঞ্চলে বরফ কাটা, সে-ও সহজ ব্যাপার নয়। এক জায়গায়

কেটে এগোতে না এগোতে আবার আগের মত জমে যায়। বাধ্য হয়ে কাটা জায়গায় স্কি'র নিচে বাক্স কেটে প্যাকিং দেয়া লাগল।

ধীর গতিতে কাজ এগোচ্ছে। ওমর বরফ কাটছে। রবিন প্যাকিং দিচ্ছে। ক্যাম্পবেলও বসে নেই, বড় একটা স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে অন্য পাশের স্কি থেকে যতটা সম্ভব খুঁচিয়ে বরফ তোলার চেষ্টা করছেন।

বিমানটাকে বরফ থেকে তোলা নিয়ে ভাবছে না ওমর, তোলা যাবেই, দুশ্চিন্তাটা কিশোরের জন্যে। তুষারপাত বেড়ে গেলে খোলা জায়গায় বিপদে পড়ে যাবে সে। আশ্রয় বলতে ওই জাহাজের খোলটা ছাড়া আর কোন জায়গা নেই। সেখানে ঢোকাটা বিপজ্জনক। পাগল জেমসেন ফিরে এলে যে কোন অঘটন ঘটিয়ে বসতে পারে।

স্কি দুটো মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ককপিটে বসল ওমর। স্টার্ট দিয়ে থ্রটল ওপেন করতেই কেঁপে উঠল বিমান। হয়ে গেছে। ওড়া যাবে এখন। রবিন আর ক্যাম্পবেলকে উঠতে বলল।

আকাশে উড়ল বিমান। নিচে থেকে যতটা ভাল দেখা যাচ্ছিল, ওপর থেকে তা যাচ্ছে না। দিগন্ত বলতে এখন কিছু চোখে পড়ছে না। নিচের দিকে সামান্য একটুখানি গোল জায়গা কেবল দৃষ্টিগোচর হয়, অন্ধকার রাতে টর্চের আলো ফেললে যেমন কিছুটা জায়গা দেখা যায়, অনেকটা তেমনি। তুষারের পর্দার আড়ালে সূর্যটাকে লাগছে আবছা একটা কমলা বলের মত।

মাত্র পাঁচশো ফুট ওপর দিয়ে উড়ে চলল সে। কয়েক মিনিট পর নিচে তাকিয়ে কিশোরকে দেখার চেষ্টা করল। দেখতে পেল না। তুষারপাতের মধ্যে সব সাদা হয়ে গেছে। তবে বরফের দেয়াল দেখে জাহাজটা কোনখানে আছে মোটামুটি ঠাহর করা যাচ্ছে। কিশোরকে দেখতে পাওয়ার ভাবনাটা আপাতত মন থেকে দূর করে দিয়ে বিমান নামানোর চিন্তা করতে লাগল সে।

নামাতেও অসুবিধে হলো না তেমন। বিমানটা থামার সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে নেমে গেল রবিন। দ্বিতীয়বার আর স্কি দুটোকে বরফে ডুবতে দিতে চায় না। তাড়াতাড়ি বাক্সের প্যাকিং ঢোকাতে শুরু করল স্কি'র তলায়।

ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে নেমে এসে ওমর জিজ্ঞেস করল, 'হয়েছে?'

মাথা নাড়ল রবিন, 'হয়েছে।'

'মুসার সঙ্গে কথা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। ওদের বলেছি, সোনাগুলো পাওয়া গেছে। দেরি না করে যেন চলে আসে। ওরা তো আসবে ঠিকই, ভয় পাচ্ছি আবহাওয়াকে। তুষারপাত আরও বাড়লে এসে শেষে দেখতেই পাবে না আমাদের।'

কথা বলতে বলতেই চারপাশে তাকিয়ে কিশোরকে খুঁজছে ওমর। 'কিশোর গেল কোথায়?'

রবিনও চারপাশে তাকাল ক্যাম্পবেলও দেখছেন। কারও মুখে কথা নেই।

কপালে ভাঁজ পড়ল ওমরের। 'জায়গা ঠিক আছে তো?'

'কোন সন্দেহ নেই।' হাত তুলে দেখালেন ক্যাপ্টেন। 'ওই যে জাহাজটা।

এখানেই রেখে গিয়েছিলাম কিশোরকে। হলো কি ওর? সোনাগুলোও তো দেখছি না।'

'জাহাজে গিয়ে ঢোকেনি তো?' রবিন বলল।

'তা তো ঢুকতেই পারে, কিন্তু সোনাগুলো?' ক্যাপ্টেন বললেন। 'কি করে নেবে?'

'তুষারে ঢেকে গিয়ে থাকতে পারে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল ওমর। 'একটা কথা জোর দিয়ে বলা যায়, কিশোর যেখানেই যাক না কেন, সোনাগুলো আগের জায়গাতেই আছে। এত সোনা এত তাড়াতাড়ি একা সরানো সম্ভব নয় তার পক্ষে।' ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল সে, 'আসলেই ঠিক জায়গায় এসেছি তো আমরা?'

'হ্যাঁ,' নির্দ্বিধায় জবাব দিলেন ক্যাম্পবেল। 'আপনার সন্দেহের কারণটা কি?'

'কি যেন একটা পরিবর্তন হয়েছে।'

'কি?'

'বুঝতে পারছি না।' আরেকবার চারপাশে তাকিয়ে কিশোরকে দেখার চেষ্টা করল। না পেয়ে চিৎকার করে ডাকল, 'কিশোর!'

জবাব এল না।

ক্যাম্পবেলের দিকে তাকাল আবার ওমর, 'ঘটনাটা কি, বলুন তো? সত্যি জায়গা ভুল করিনি আমরা, নাকি পাগল হয়ে গেছি?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হাত নেড়ে জবাব দিলেন ক্যাম্পবেল, 'জায়গাও ভুল করিনি, পাগলও হইনি।' মুখের কাছে হাত জড় করে কিশোরের নাম ধরে নাবিকসুলভ এক হাঁক ছাড়লেন।

জবাব এল না।

ওমর আর রবিনকে ওখানে থাকতে বলে দৌড়ে গিয়ে জাহাজটায় দেখে এলেন তিনি। ওখানেও নেই।

আকাশের দিকে পিস্তল তুলে গুলি করল ওমর। শব্দটা কেমন ভোঁতা আর নিষ্প্রাণ শোনাল। খোলা সাগরের দিক থেকে ভেসে এল আরেকটা গুলির মৃদু শব্দ।

নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে ক্যাপ্টেন বললেন, 'প্রতিধ্বনি। আপনার গুলির শব্দটাই আইসবার্গে বাড়ি খেয়ে ফিরে এসেছে।'

মেনে নিতে পারল না ওমর। তবে জবাবও দিতে পারল না। খোলা সাগরের দিকে যাবে কেন কিশোর, কোন যুক্তি খুঁজে পেল না।

*

তবে যুক্তিটা সহজ। সাময়িক উত্তেজনায় ক্যাম্পবেলের মত পোড়খাওয়া, দক্ষিণ মেরু ঘুরে যাওয়া নাবিকের মাথায়ও প্রথমবারে ব্যাপারটা ঢোকেনি।

সোনার বারের ওপর বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হলো কিশোরের, নড়ে উঠেছে ওগুলো। ভুরু কুঁচকে গেল। মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে নাকি? কিন্তু আবার নড়ে উঠল ওগুলো; ঠিক নড়া নয়, কেঁপে উঠল বলা যায়। ঘটনাটা কি?

ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি? দক্ষিণ মেরুতে ভূমিকম্প? বাতিল করে দিন সন্দেহটা। তবে নয়ই বা কেন? পৃথিবীর সবখানেই যদি ভূমিকম্প হতে পারে, দক্ষিণ মেরুতে হলে দোষটা কি?

ঘুরে তাকাতে জাহাজটার দিকে চোখ পড়ল ওর। চমকে গেল। সত্যি সত্যি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে নাকি? জাহাজটা দূরে সরে গেছে। আরও একটা জিনিস চোখে পড়তেই ধড়াস করে উঠল বুকের ভেতর। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। বরফের মধ্যে চওড়া, আঁকাবাঁকা, দীর্ঘ একটা ফাটল তৈরি হয়েছে। ক্রমেই বাড়ছে ফাঁকটা। বুঝে ফেলল কি ঘটেছে। মূল বরফখণ্ড থেকে খসে গেছে একটা অংশ, যেটার ওপর বসে আছে সে; সরে যাচ্ছে খোলা সাগরের দিকে।

ফাঁকটার কাছে দৌড়ে এল সে। ইতিমধ্যেই সাত-আট হাত সরে গেছে। লাফিয়ে পেরোনো অসম্ভব। ছয় ফুট নিচে কালো পানি। এই বরফ শীতল পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কাটার চেষ্টা করা আত্মহত্যার সামিল। পানিতে পড়লে একটা মিনিটও টিকবে না।

পেছনে তাকাল। ওদিকে ফাঁক কম। দৌড় দিল। কিন্তু সে ওখানে পৌঁছতে পৌঁছতে বেড়ে গেল ফাঁক। পেরোনো অসম্ভব। আরও আগে বুঝতে পারল না কেন ভেবে নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল এখন।

এই মরণ-ফাঁদ থেকে বেরোনোর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল সে। চারপাশে তাকাতে লাগল। কোন উপায় দেখতে পেল না। যেদিকে তাকায় শুধুই বরফ আর বরফ, ছোট-বড় বরফের চাঙড় তুষারপাতের কারণে খুবই অস্পষ্ট চোখে পড়ে; আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় স্থির হয়ে আছে, আসলে ভেসে ভেসে সরে যাচ্ছে সবগুলোই। সরাটা এমনই, বোঝা যায় না।

সে যেটাতে রয়েছে, ভাল করে দেখল সেটা। অনেকটাই বড়, কিন্তু বিমান নামানোর জন্যে যথেষ্ট নয়। ল্যান্ড করার মত জায়গা নেই। ওমর যদি আসেও, নামতে পারবে না। বিমানে অবশ্য একটা রবারের ভেলা রয়েছে। সেটা ফেলে দিতে পারে। কিন্তু তাতে কতটা লাভ হবে কে জানে! বাতাস ভরে ফোলাতে হয় ভেলাটা, খোঁচা লেগে ফুটো হয়ে বাতাস বেরিয়ে গেলেই শেষ। এখানে যা অবস্থা, চোখা বরফে খোঁচা লাগার সম্ভাবনা প্রতি মুহূর্তে। তবু ওটাতে করে মূল বরফখণ্ডে গিয়ে ওঠার ক্ষীণ একটা আশা করা যেত, যদি ওমর ওকে খুঁজে পেত। পাওয়াটা কঠিন, প্রায় অসম্ভবই বলা চলে। তুষারপাতের কারণে দৃষ্টি চলে না বেশিদূর। তা ছাড়া ওমরও যে বড় রকমের বিপদে পড়েনি সেটাই বা কে বলতে পারে! যে ভাবে ইঞ্জিন স্টার্ট নিল আর বন্ধ হলো, কি অবস্থায় আছে সে খোদাই জানে!

মূল বরফখণ্ড থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছে কিশোর যে টুকরোটাতে রয়েছে সেটা। গতি দেখে অনুমান করা গেল স্রোতের মধ্যে পড়েছে। উত্তর-পুবে এগোচ্ছে। মনে মনে এই এলাকার ম্যাপটা কল্পনা করে অঙ্ক করা শুরু করে দিল সে। গ্র্যাহাম পেনিনসুলার উত্তরের বাহুটা রয়েছে প্রায় একশো মাইল দূরে। সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতে…নাহ্, আশা করা পাগলামি। অতটা দূরে

যেতে যেতে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাহিল হয়ে, তুষারপাতের মধ্যে ঠাণ্ডায় জমেই মরে যাবে। কিংবা আরও সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটতে পারে। উত্তুরে স্রোতে পড়ে এগোতে গিয়ে গলে যেতে পারে টুকরোটা–আশেপাশে ছোট ছোট বরফের টুকরোগুলোকে গলতে দেখছে সে; তাতে এক সময় টুপ টুপ করে পানিতে পড়তে থাকবে সোনার বারগুলো, সে নিজেও পড়বে···

সোনার বার! হাহ্ হাহ্! তিক্ত হাসি হাসল সে। এগুলোর কোন অর্থই নেই তার কাছে এ মুহূর্তে। অতি সাধারণ একটা ডিঙির জন্যেও অকাতরে দিয়ে দিতে পারে সব।

বাঁচার আশা ছেড়ে দিল সে। বরফের কিনারে দাঁড়িয়ে পানির দিকে তাকিয়ে থাকার আর কোন অর্থ হয় না। ধীর পায়ে ফিরে এসে বসে পড়ল আবার আগের জায়গায়। বসে বসে ভাবতে লাগল। চারপাশে বরফের টুকরো ভেসে বেড়াচ্ছে, ধাক্কা লাগছে, ঘষা খাচ্ছে একটার সঙ্গে আরেকটা। আরেকটা বড় টুকরোর সঙ্গে ধাক্কা খেল ওর টুকরোটা। থরথর করে কেঁপে উঠল। বিকট গর্জন আর কড়মড় আওয়াজ তুলে ভাঙল কিছু বরফ। একটা আরেকটার সঙ্গে লেগে গেল শক্ত হয়ে। সহজে ছুটবে বলে আর মনে হয় না। কিন্তু আশা করতে পারল না সে। জোড়া লেগেও ততটা বড় হয়নি বরফ যাতে প্লেন ল্যান্ড করতে পারে।

এই সময় কানে এল ইঞ্জিনের শব্দ। বিমানের ইঞ্জিন। ধক করে উঠল বুকের মধ্যে। এর একটাই মানে, উড়ে যাচ্ছে ওমরভাই। এদিকে কি আসবে? কোন কারণ নেই আসার। তবু আশায় দুলতে লাগল তার মন। কান পেতে রইল সে। থেমে গেল ইঞ্জিনের শব্দ। তারমানে ল্যান্ড করেছে বিমানটা। আরও কিছুক্ষণ পর শোনা গেল গুলির শব্দ।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল আবার কিশোর। পকেট থেকে পিস্তল বের করে গুলির শব্দের জবাব দিল। কিন্তু গুলি ফোটার শব্দ শুনে আবার মনটা দমে গেল তার। অদ্ভুত এই অঞ্চলে পিস্তলের গুলি ফোটার শব্দটা পর্যন্ত স্বাভাবিক শোনা যায় না। আশা করতে লাগল জবাবে আবার গুলির শব্দ হবে। হলো না। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে আবার নিরাশ হয়ে পড়ল সে। ওটা আদৌ গুলির শব্দ ছিল কিনা সন্দেহ হতে লাগল।

আবার বসে পড়ল বারগুলোর ওপর। কান পেতে রইল শব্দ শোনার আশায়। পকেট থেকে চকলেট বের করে খেল।

সময় কাটছে। উত্তেজনার মধ্যে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল সে। শুয়ে পড়তেও ভয় পাচ্ছে। ঘুমের মধ্যেই যদি তুষারে ঢেকে যায়।

ঘড়ি দেখাও ছেড়ে দিল একসময়। ক্লান্তিতেই বোধহয় চোখটা লেগে এসেছিল, মাথাটা বুকের কাছে ঝাঁকি খেতেই তন্দ্রা টুটে গেল। ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসল। সামনের দিকে তাকাতে চোখে পড়ল জাহাজটা।

তিক্ত হাসি হাসল সে। পাগল হওয়ার লক্ষণ। উল্টোপাল্টা দেখা শুরু হয়ে গেছে। চোখ মুদল। আবার খুলল। আছে জাহাজটা।

কয়েকটা মিনিট চুপচাপ বসে তাকিয়ে রইল ওটার দিকে। গেল না ওটা।

মুছল না চোখের সামনে থেকে। বরং এগিয়ে আসছে। ডেকে লোকজনের চলাফেরাও দেখতে পেল। নিশ্চিত হওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল কয়েক পা। মাথা ঝাড়া দিল। চোখ ডলল। তারপরও যখন অদৃশ্য হলো না জাহাজটা, চিৎকার করে ডাকতে শুরু করল সে।

জাহাজ থেকে শুনতে পেল ওর চিৎকার। রেলিঙের কাছে জড় হলো কয়েকজন মানুষ। তাকিয়ে রইল এদিকে। ধীরে ধীরে ঘুরে যেতে শুরু করল জাহাজের নাক।

নিজের গালে চিমটি কেটে দেখল কিশোর জেগে আছে না স্বপ্ন দেখছে। এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না তার।

কাদের জাহাজ? তিমি শিকারী নাকি সীল শিকারীদের? একটিবারের জন্যেও মাথায় এল না তার যে ওটা পোত্রাঘাইয়ের জাহাজ। মাথা শান্ত রেখে ভাবার মত পরিস্থিতিও নয়। জাহাজটা আরও কাছে এলে ওটার নামটা পড়ে চমকে গেল : বেত্রাঘাই। এতক্ষণে বিশ্বাস হলো, স্বপ্ন দেখছে না। একমাত্র পোত্রাঘাইয়েরই এদিকে আসার কথা ছিল। এসেছে। আর এসেছে একেবারে সময়মত। তবে ওকে দেখে শঙ্কিত হওয়ার চেয়ে বরং খুশি হলো সে। নিশ্চিত মৃত্যুর সম্ভাবনায় কিছুটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছে। যদিও, পোত্রাঘাইয়ের হাতে পড়লেও মরার সম্ভাবনা কম নয়। সোনাগুলো দেখে আনন্দে আত্মহারা হবে পোত্রাঘাই, কোন সন্দেহ নেই। এত সহজে হাতের কাছে চলে আসবে ওগুলো নিশ্চয় কল্পনাই করেনি সে। জাহাজে তুলে নেবে। কিশোরকে তুলে নেয়াটা তার জন্যে ঝামেলা। তারচেয়ে মাথায় একটা বাড়ি মেরে বেহুঁশ করে বরফের ওপর তাকে ফেলে রেখে জাহাজ ভর্তি সোনা নিয়ে হাওয়া হয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। কেউ জানবে না তখন কিশোরের কি হলো। ওমরের কাছেও একটা রহস্য হয়ে থাকবে চিরকাল।

জাহাজটাকে আসতে দেখে, বাঁচার আশায় আবার বুদ্ধি খুলে গেল কিশোরের। বাঁচতে হলে সোনাগুলো পোত্রাঘাইয়ের চোখে পড়তে দেয়া চলবে না। ফিরে তাকাল স্তূপটার দিকে। তুষার পড়ে ঢেকে গেছে। দু'এক জায়গায় ওর ঘষা লেগে সামান্য যেটুকু বেরিয়ে আছে, সেগুলোও ঢেকে দিল হাত-পা ছড়ানোর ছুতো করে; ডেকে দাঁড়ানো লোকগুলো যাতে বুঝতে না পারে যে সে কিছু ঢাকার চেষ্টা করছে।

কাছে এসে ভিড়ল জাহাজ। একটা দড়ি ছুঁড়ে দেয়া হলো ওর দিকে। দড়িটা কোমরে পেঁচিয়ে দুই হাতে শক্ত করে চেপে ধরল কিশোর। ডেকে তুলে নেয়া হলো ওকে। অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে দাঁড়াল বিস্মিত নাবিকেরা। রুক্ষ, কর্কশ চেহারার লোক ওরা। ভারী শীতের পোশাকে ভয়ঙ্কর লাগছে। মাথায় ব্যালাক্লাভা হেলমেট। বেশির ভাগই এশিয়ান।

তেল চিটচিটে নীল জ্যাকেট আর মাথায় পীক্‌ড্ ক্যাপ পরা একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে সবার সামনে। দেখেই অনুমান করে ফেলল কিশোর, এই লোকই পোত্রাঘাই। অন্য নাবিকদের মত বিশালদেহী নয়। ফ্যাকাসে, বসা চোয়াল। চোখের কোটর দুটো স্বাভাবিকের চেয়ে কাছে। শীতল. ধসর চোখের

মণি দুটো স্থির হয়ে আছে কিশোরের দিকে। ভঙ্গি দেখে মনে হলো পোকামাকড় দেখছে।

'কোত্থেকে এলে তুমি?' প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল অবশেষে সে। ইংরেজিই বলল, তবে বিচিত্র টান, বোঝা গেল না কোন দেশের লোক।

'বরফের ওপর থেকে,' জবাব দিল কিশোর। চলতে শুরু করেছে জাহাজ। যে টুকরোটাতে ছিল সে, সেটার কাছ থেকে সরে যেতে দেখে স্বস্তি বোধ করছে।

জবাব শুনে থমকে গেল পোত্রাঘাই। মনে মনে রেগে গেলেও কিছু বলতে পারল না। তার প্রশ্নটা যে রকম, ছেলেটা জবাবও দিয়েছে সে-রকম। ভেবেচিন্তে করল পরের প্রশ্নটা, 'ওখানে কি করছিলে?'

'গবেষণা।'

এবারের প্রশ্নটাও ঠিক হয়নি, বুঝল পোত্রাঘাই। 'তোমার জাহাজের নাম কি?'

'আমি জাহাজে করে আসিনি,' জবাব দিল কিশোর। 'আমেরিকান এয়ার এক্সপ্লোরেশন পার্টির সদস্য আমি। বরফের কিনারে বসেছিলাম। আমার দলের লোকেরা অন্য জায়গায় গবেষণায় ব্যস্ত। হঠাৎ বরফ ভেঙে সরে যেতে লাগল, আমি রয়ে গেলাম তার ওপর। কিছুই করতে পারলাম না। প্লেনটাকে উড়ে যেতে শুনেছি। ওরাও মনে হয় বুঝতে পারছে না আমার কি হয়েছে। মরার অপেক্ষা করছিলাম, এই সময় আপনারা এলেন।'

'হুঁ। কপাল ভাল তোমার।'

একমত হলো কিশোর। তবে পরের কথাটা বেকায়দায় ফেলে দিল ওকে।

'আমার ধারণা,' ধীরে ধীরে বলল পোত্রাঘাই, 'তুমি জাহাজ খুঁজতে আসা দলের লোক।'

'জাহাজ! কিসের জাহাজ?'

কিশোরের বিস্ময়টা এতই স্বাভাবিক, দ্বিধায় ফেলে দিল পোত্রাঘাইকে। 'খানিক আগে রেডিওতে একটা মেসেজ ধরেছে আমাদের রেডিওম্যান, তাতে কোন একটা জাহাজ খুঁজে পাওয়ার কথা বলা হয়েছে।'

কি ঘটেছে বুঝতে অসুবিধে হলো না কিশোরের। রেডিওতে মুসাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে রবিন, সেটা ধরা পড়েছে বেত্রাঘাইয়ের রেডিওতেও। তারমানে পোত্রাঘাইয়ের এদিকে আসাটা কাকতালীয় নয়। সাবধানে কথা বলতে হবে এখন, নইলে বিপদ বাড়বে। বলল, 'হ্যাঁ, আমাদের ক্যাম্পের কাছে একটা জাহাজ পাওয়া গেছে। ওটার কাছ থেকে দূরে থাকার অনুরোধই করব আপনাকে।'

'কেন?' তীক্ষ্ণ হলো পোত্রাঘাইয়ের কণ্ঠ।

'ওটাতে পাগলের বাস…কিন্তু কার সঙ্গে কথা বলছি আমি সেটাই তো জানা হলো না।'

'আমার নাম পোত্রাঘাই, এই জাহাজের মালিক,' দায়সারা জবাব দিল সে।

'পাগলটার নাম কি?'

'তা কি করে বলব? জাহাজে কেউ আছে কিনা দেখতে গিয়েছিলাম। আমাদের দিকে কুড়াল ছুঁড়ে মারল পাগলটা। চিৎকার করে গালাগাল করতে লাগল। তাকিয়ে দেখি দৈত্যের মত এক লোক। বড় বড় লাল লাল চুল।'

ঝট করে ঘুরে সঙ্গীদের দিকে তাকাল পোত্রাঘাই। 'কি বলল শুনলে? লাল লাল চুল। ওখানেই গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে তাহলে। করব, ওর ব্যবস্থাও করা যাবে।' কিশোরের দিকে ফিরল আবার, 'জাহাজের ভেতরে ঢুকেছিলে?'

শুকনো হাসি হাসল কিশোর। 'ভেতরে আর ঢুকি কখন। মাত্র তিনটে মিনিট ছিলাম ডেকে। প্রথমে কুড়াল ছুঁড়ে মারল, তারপর চিৎকার...পাগলটার চোখের দিকে তাকিয়ে আর দাঁড়ানোর সাহস করলাম না। ঝেড়ে দিলাম দৌড়।'

দ্বিধা করতে লাগল পোত্রাঘাই। কেন, বুঝতে পারল কিশোর। আসল প্রশ্নটা আসছে। বলেই ফেলল শেষে পোত্রাঘাই, 'জাহাজে কোন দামী জিনিস দেখেছ?'

সব ক'টা মুখে উত্তেজনা দেখতে পেল কিশোর। জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে লোকগুলো। 'দামী মানে?'

'ধরো, সোনাটোনা জাতীয় কিছু?'

হাসল কিশোর। 'গুপ্তধনের কথা জানতে চাইছেন? নাহ্, দেখিনি। সময় পেলাম কোথায়? পাগলের তাড়া খেয়ে পালিয়ে বাঁচি না...যদি থাকেই, সব নিয়ে নিনগে আপনি। আমি যে প্রাণে বাঁচলাম এটাই যথেষ্ট।'

'হুঁ!' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল পোত্রাঘাই। 'যাও, নিচে যাও। সময় হলে ডাকব।'

'থ্যাংকস,' কিশোরের ধন্যবাদটা আন্তরিক।

আট

কিশোরের কি ঘটেছে দেরিতে হলেও বুঝতে পারল ওমর। বিমানে করে পানির ওপরে চক্কর দিয়ে আসার কথা ভাবল।

বাধা দিলেন ক্যাম্পবেল। না যাওয়ার সপক্ষে দুটো যুক্তি দেখালেন। প্রথম যুক্তিটা হলো, ভেঙে যাওয়া বরফখণ্ডটা কত বড় জানা নেই। ছোট হয়ে থাকলে সোনার ভারে উল্টে যাবে। তাতে সোনাগুলোও পড়বে সমুদ্রে, কিশোরও রেহাই পাবে না। যদি না-ও ওল্টায়, একপাশে কাত হয়ে যাবে, তাতেই রেহাই পাবে না সে। তারমানে বহু আগেই মরে গেছে কিশোর। মরা মানুষকে খুঁজতে যাওয়া কিছুটা আগে আর আগে পরে, একই কথা। দ্বিতীয় যুক্তিটা হলো, আকাশ অপরিষ্কার, দেখা যায় না ভালমত। কিশোরকে খুঁজতে হলে নিচু দিয়ে উড়ে যেতে হবে, তাতে না দেখতে পেয়ে আইসবার্গে ধাক্কা খেয়ে বিমানটা

ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা একশো ভাগ। যেতে হলে আবহাওয়া ভাল হওয়ার অপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ। কিশোর যদি পানিতেই পড়ে গিয়ে থাকে, ঘণ্টাখানেক পরে খুঁজতে গেলেও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। আর যদি অলৌকিক ভাবে বেঁচেও যায়, তাহলে তো বরফের টুকরোটার ওপরেই আছে। ঝুঁকি নিতে গিয়ে বিমানটা ধ্বংস হলে তার কোন উপকার হবে না, বরং সবার ক্ষতি।

যাওয়ার সপক্ষে পাল্টা যুক্তি দিতে না পেরে চুপ হয়ে গেল ওমর। সিগারেট ধরিয়ে প্লেনের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। শুধু যে সাদা আলো আর না দেখার সমস্যা, তাই নয়, সমস্যা আরও আছে। কিশোর যদি বেঁচেও থাকে, তাকে উদ্ধার করবে কি ভাবে? ছোট বরফখণ্ডের ওপর বিমান নামাতে পারবে না। রবারের ভেলাটা ব্যবহার করতে হবে সেক্ষেত্রে। বরফের এত সব সচল টুকরোর ভেতর দিয়ে স্রোতের বিপরীতে সামান্য একটা রবারের ভেলা বেয়ে আনা সোজা কথা নয়, তার ওপর যখন ঠিকমত দৃষ্টিগোচর না হবার ব্যাপারটা রয়েছে। মুসাদেরও মেসেজ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ওরা এসে বিমানটা না দেখলে চিন্তায় পড়ে যাবে। উল্টোপাল্টা কিছু করে বসলে ঝামেলা বাড়বে। অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখল না ওমর।

সামনে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে বরফের টুকরো। একটা টুকরোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ যেন সজাগ হয়ে উঠল ও। 'বিশেষজ্ঞরা ঠিকই বলেছেন, সামান্য উত্তরে সরে গিয়ে পুবমুখো বয়ে যায় স্রোত। তারমানে আমরা প্রথম যেখানে ক্যাম্প করেছিলাম, সেদিকে যাচ্ছে। কিশোর যে টুকরোটাতে রয়েছে, গলে না গেলে সেটা গিয়ে ঠেকবে গ্র্যাহাম পেনিনসুলায়।'

'আমারও তাই ধারণা,' মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন। 'স্রোত যেদিকে বইবে, ওতে ভাসমান সব কিছুই সেদিকে যাবে। বরফ গেলে, তাতে আটকে থাকা জিনিসও যাবে। বরফখণ্ডে আটকে থেকে বড় বড় পাথরও ভেসে যেতে দেখেছি আমি।'

'খোঁজার সময় মাথায় রাখতে হবে কথাটা,' ওপর দিকে তাকাল ওমর। 'কি ব্যাপার, মেঘ কি পরিষ্কার হচ্ছে নাকি?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। ওপরে উঠছে।' চারপাশে তাকাতে লাগলেন ক্যাম্পবেল। 'কিন্তু আমার অবাক লাগছে, জেনসেন গেল কোথায়? কোনখানে গিয়ে লুকাল?'

'আছে হয়তো কোন বরফের স্তূপের আড়ালে,' জবাব দিল ওমর, 'লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের দেখছে এখন। সোনার নেশা মানুষকে যে কি করে তোলে, দেখেছি আমি; জেনসেনের মাথা খারাপ হলেও ওকে বিশ্বাস নেই,কখন কি করে বসে। সতর্ক থাকতে হবে আমাদের। সময় যখন পেয়েছি, সামান্য নাস্তা আর এক কাপ চা খেয়ে নেয়া যেতে পারে। ততক্ষণে আকাশ আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। রবিন, চা বসাও।'

আধঘণ্টা পর বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল আকাশ। আরও হচ্ছে। থার্মোমিটারে নেমে যাচ্ছে তাপমাত্রা। দেখতে দেখতে ক্যাপ্টেন বললেন,

'রাতে ভাল বরফ জমবে আজ।'

'যত খুশি পড়ুকগে,' ওমর বলল। 'আমরা ঠিকমত সব দেখতে পেলেই হলো। রবিন, তুমি থাকো এখানে। আগুনটা উস্কে রেখো।' বিমানের দিকে এগিয়ে গেল সে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সাগরের দিকে তাকাল। স্থির হয়ে গেল। দূরে কোন কিছু চোখে পড়েছে তার। হাত নেড়ে ডাকল, 'ক্যাপ্টেন, এদিকে আসুন তো। আমি যা দেখছি, আপনিও কি দেখছেন?'

দেখতে দেখতে মাথা ঝাঁকালেন ক্যাম্পবেল, 'হ্যাঁ, বলা যায় আপনার চেয়ে বেশি দেখছি আমি, কারণ জাহাজটা আমার চেনা। ওটাই বেত্রাঘাই। তারমানে হাজির হয়ে গেছে পোত্রাঘাই।'

'সে-রকমই তো লাগছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে চোয়ালে হাত বোলাল ওমর। 'আমাদের প্ল্যানের পরিবর্তন করতে হতে পারে এখন।'

'কি করবেন?' কণ্ঠের উদ্বেগ চাপা দিতে পারলেন না ক্যাম্পবেল।

'কিছুই না।'

'সাবধান, ওরা কিন্তু ভয়ঙ্কর লোক।'

'ভয়ঙ্কর লোকের সঙ্গে আগেও সাক্ষাৎ হয়েছে আমার।'

'কিছু করা উচিত আমাদের,' জোর দিয়ে বললেন ক্যাম্পবেল। 'যদি মনে করে থাকেন, ওদের সঙ্গে বন্ধু হয়ে গিয়ে এক তাঁবুর নিচে বাস করব আমরা, ভুল করছেন। একপাল নেকড়ের সঙ্গে বাস করা বরং নিরাপদ, পোত্রাঘাইয়ের দলের চেয়ে। পোত্রাঘাই খারাপ লোক, খুব খারাপ।'

'কি করতে বলেন? পালাব?'

'না, তা বলছি না...'

'তাহলে চুপ করে থাকুন। এখানেই থাকব আমরা। দেখিই না, ওরা এসে কি বলে। যদি গোলমাল করে, আমরাও ছাড়ব না।'

'কিন্তু ওরা দলে অনেক ভারী, কি করব? যদি আগের দলটাকেই নিয়ে এসে থাকে পোত্রাঘাই, শঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে আমাদের।'

'ও ধরনের লোকের সঙ্গে পরিচয় আছে আমার,' সামান্যতম কাঁপন না ওমরের কণ্ঠ। 'কিছুই করতে পারবে না। পোত্রাঘাইকে এখানে না তে বাধা দেব না আমরা, দিতে পারবও না। সেটা বেআইনী হবে। এ জায়গায় আমাদের যেমন অধিকার, তারও ততখানিই অধিকার। ও যদি গিয়ে আদালতে নালিশ করে, আমরাই বেকায়দায় পড়ব। ওর প্রথম চিন্তা হবে এখন, সোনাগুলো খুঁজে পাওয়া। না পেলে তখন হয়তো মুখোশ খুলবে। খোলার আগে পর্যন্ত তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করব, ওর জাহাজটাকে ব্যবহার করে কিশোরকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখব। যা অঞ্চল, এ ধরনের কাজে প্লেনের চেয়ে জাহাজ অনেক ভাল, এমনকি বেত্রাঘাইয়ের মত নড়বড়ে জাহাজও।'

'ব্যাটার সাহসের তারিফ করতে হয়।'

'কোনদিক থেকে?'

'এই যে, বরফের তোয়াক্কা না করে চলে আসছে। ঢুকেছে সহজেই, কিন্তু বেরোনোটা সহজ না-ও হতে পারে। দুটো বরফখণ্ডের মধ্যে চাপা পড়লে

আমাদের পেছনের ওই জাহাজটার মতই অবস্থা হবে ওরটারও।'

'সোনার জন্যে যে কোন ঝুঁকি নিতে রাজি থাকে মানুষ।'

'তারপরেও আমি বলব, মস্ত ঝুঁকি নিয়েছে ও। আমি হলে সাবধান থাকতাম।'

'কোথায় আর থাকলেন?' হাসল ওমর। 'আমরা কি কম ঝুঁকি নিয়েছি? অতি সাধারণ একটা বিমানে করে মেরুসাগর পাড়ি দিয়ে কুমেরুতে যেভাবে ঢুকেছি, সেটাকে কি কেউ মগজের সুস্থতার লক্ষণ বলবে?'

'অ্যা...' জবাব খুঁজে না পেয়ে ক্যাপ্টেনও হেসে ফেললেন।

বরফের মাঝখান দিয়ে পথ করে করে অতি সাবধানে এগিয়ে আসতে লাগল বেত্রাঘাই। বিমানটাকে দেখতে পেয়েছে, তাই ডেকে এসে জটলা করছে নাবিকেরা। আরও কাছে এলে ওদের উদ্দেশে হাত তুলল ওমর।

সোজা এগিয়ে এল জাহাজটা। এখানে ডাঙা নেই যে নিচে পানির গভীরতা কমে যাবে, মাটিতে ঠেকবে তলা। বরফের কিনারে এসে থামল ওটা। দড়িতে বাঁধা টায়ার আর দড়ির মোটা মোটা বান্ডিল নামিয়ে দেয়া হলো, যাতে খোলটা বরফের সঙ্গে ঘষা না খায়।

'ওই যে পোত্রাঘাই, মাথায় পীক্ড্ ক্যাপ পরা লোকটা,' নিচুস্বরে ওমরকে বললেন ক্যাম্পবেল। 'আর বাকি যে দুটোর কথা বলেছিলাম—মুসার ঘেউ আর বোকা, ওর পাশে দাঁড়ানো দুজন। ওরা কথা বলে কম, তবে অকাজ কম করে না। এই অভিযানে খরচের বেশির ভাগটা ওরাই জোগাচ্ছে, কোন সন্দেহ নেই আমার।'

'পোত্রাঘাইকেও বোকা ভাবার কোন কারণ নেই,' বিড়বিড় করে বলল ওমর। 'জায়গা চিনে ঠিক চলে এসেছে...'

কথা বন্ধ হয়ে গেল ওমরের। ডেকে বেরিয়ে আসা আরেকজনের ওপর স্থির হয়ে গেছে দৃষ্টি। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। 'পেয়ে গেছে ওকে, আরি!'

'কে?'

'কিশোর। ওই যে, দেখছেন না। পথে তুলে নিয়েছে। এখন বুঝলাম, এত সরাসরি কি করে আসতে পারল ওরা। কিশোর বলেছে। আর কি কি বলেছে খোদাই জানে।'

'সোনার কথা নিশ্চয় বলেনি। তাহলে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট উড়তে শুরু করত এতক্ষণে।'

'সোনার কথা কিছু বলবে না ও, এত বোকা নয়।'

'তাহলে ওরা নিজেরাই সোনাগুলো পেয়ে গেছে। কিশোর তো ওগুলোর ওপরই বসে ছিল।'

'তা-ও নয়। সোনাগুলো পায়নি এখনও পোত্রাঘাই।'

'কি করে বুঝলেন?'

'এ তো সহজ কথা। সোনা পেলে এখানে আসতে যেত নাকি সে? কি ঠেকা পড়েছে। সোজা নাক ঘুরিয়ে উত্তরে রওনা হয়ে যেত। কিশোর

বাড়াবাড়ি করলে মাথায় একটা বাড়ি মেরে পানিতে ফেলে দিত, যেত ল্যাঠা চুকে। ওকে নামিয়ে দিতে আসার মত মহাপুরুষ কি পোত্রাঘাই, আপনার কি মনে হয়?'

হাসলেন ক্যাম্পবেল, 'হুঁ, তা বটে।'

দু'পাশে দুই জাপানীকে নিয়ে এগিয়ে এল পোত্রাঘাই। মুখে মাফলার জড়ানো থাকাতে ক্যাম্পবেলকে এখনও চিনতে পারেনি। ওমরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার এক সহকারীকে নিয়ে এলাম।'

'দেখতেই তো পাচ্ছি,' ভদ্রস্বরে জবাব দিল ওমর। 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। চিন্তায়ই পড়ে গিয়েছিলাম।'

'ও আমাকে বলল আমেরিকান সরকারের পক্ষ থেকে এখানে একটা অভিযানে এসেছেন আপনারা।'

মৃদু হাসল ওমর। 'ঠিকই বলেছে। সরকারের তরফ থেকেই এসেছি।'

ক্যাম্পবেলের ওপর চোখ পড়ল পোত্রাঘাইয়ের। চিনে ফেলল। তাতেই যা বোঝার বুঝে গেল সে। বদলে গেল কণ্ঠস্বর, 'ও, তুমিও এসেছ!'

'তাতে কি কোন অসুবিধে আছে আপনার?' মাফলার দিয়ে নিজেকে গোপন রাখার চেষ্টা করলেন না আর ক্যাম্পবেল।

মাথা ঝাঁকাল পোত্রাঘাই। 'এতক্ষণে বুঝলাম অভিযানটা কিসের। অহেতুক আর কথা বাড়ানোর কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। জাহাজটা কোথায়?'

হাত তুলে দেখালেন ক্যাম্পবেল, 'ওই যে। আগের বার যে রকম দেখে গিয়েছিলে, তারচেয়ে অবস্থা খারাপ হয়েছে বোধহয়। মাস্তুল ভেঙে পড়েছে, বরফ জমেছে আরও, তাই না?'

জাহাজটার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল পোত্রাঘাই, 'সোনাগুলো ভেতরেই আছে?'

'না।'

চোখের পাতা সরু হয়ে এল পোত্রাঘাইয়ের, 'কি করে বুঝব?'

'গিয়ে নিজের চোখেই দেখে এসো।'

'তাহলে কোথায় ওগুলো?'

ক্যাম্পবেল কিছু বলার আগেই তাড়াতাড়ি জবাব দিল ওমর, 'সেটাই তো জানার চেষ্টা করছি।'

'আপনি বলতে চাইছেন, পাননি ওগুলো?'

'পেলে কি এখনও বসে থাকতাম?'

'ভাঁওতা দিচ্ছেন না তো?' পোত্রাঘাইয়ের চোখে সন্দেহের কালো ছায়া।

একটা কাঁধ উঁচু করে ঝাঁকি দিল ওমর। 'জাহাজটাও আছে, আমার প্লেনটাও এখানেই, কোনটাতেই সোনাগুলো পাবেন না। যান, দেখার অনুমতি দিচ্ছি।'

'অনুমতি!' কঠিন হয়ে গেল পোত্রাঘাইয়ের কণ্ঠ। 'আপনি অনুমতি দেবার কে? এখানে আমার যা খুশি আমি করতে পারি।'

'তর্কের মধ্যে যাচ্ছি না আমি,' শান্তকণ্ঠে বলল ওমর। 'তবে আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, স্যালভেজ অপারেশনে এসেছি আমি, আর এটাতে সহযোগিতা করছে আমেরিকান সরকার। সরকারী নির্দেশে এসেছি আমি, প্লেন থেকে শুরু করে সমস্ত যন্ত্রপাতি, খরচ, সব দিচ্ছে সরকার। এর কোনটার কোন ক্ষতি হলে আপনি যে দেশের লোকই হোন না কেন আন্তর্জাতিক আদালতের সামনে হাজির হতেই হবে। সুতরাং সাবধান।'

ওমরের পাশে দাঁড়ানো কিশোরের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল পোত্রাঘাই। 'তোমার কথার সঙ্গে কিন্তু মিলছে না।'

'কোন কথাটা মিলছে না? যা যা জিজ্ঞেস করেছেন, সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছি আমি। কোন্‌টা ভুল, বলুন?'

চিন্তা করল পোত্রাঘাই। কোন্‌টা ভুল, বের করতে না পেরে চুপ হয়ে গেল। কিন্তু চেহারার ক্রূর ভঙ্গিটা দূর হলো না। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে বসাল। আগুন ধরিয়ে ম্যাচের কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। ভুরু নাচাল ওমরের দিকে চেয়ে, 'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন সোনাগুলো নেই?'

'নিজের চোখে দেখে আসতেই তো বলছি। তবে আমার পরামর্শ চাইলে বলব, দেখতে গিয়ে দেরি না করে সোজা নিজের জাহাজে উঠে সময় থাকতে থাকতে কেটে পড়ুন। বরফ এসে চেপে ধরলে আর দেশে ফেরা লাগবে না, ওই জাহাজটার অবস্থা হবে,' পেছনের ধ্বংসাবশেষটার দিকে আঙুল তুলল ওমর।

'আমি বাড়ি যাব? কিছুই না নিয়ে? কি যে বলেন।'

'সেটা আপনার ইচ্ছে। আর কথা বলার সময় নেই আমার। জরুরী কাজ আছে।'

'শুনুন, সোনাগুলো ভাগাভাগি করে নিতে পারি আমরা। আপনি চাইলে কিছুটা ছাড় দিতে পারি।'

'ছাড় কে চাইছে আপনার কাছে? আমি আপনার প্রস্তাবে রাজি নই। রাজি হওয়া সম্ভব নয়। ওই সোনার মালিক এখন আমেরিকান সরকার, আগেই বলেছি আপনাকে,' শীতল কণ্ঠে বলল ওমর। 'তা ছাড়া সোনা ওখানে থাকলে তো ভাগাভাগি করব।'

'ওই জাহাজটাতে নেই?'

'না।'

'তাহলে জেনসেন লুকিয়ে ফেলেছে কোথাও। এই ছেলেটা বলল,' কিশোরকে দেখাল পোত্রাঘাই, 'জেনসেন নাকি ওই ভাঙা জাহাজেই থাকে।'

'হ্যাঁ,' ওমর বলল। 'কুড়াল ছুঁড়ে আমার মাথা ফাঁক করে দিতে চেয়েছিল। তারপর দৌড়ে পালাল। বদ্ধ উন্মাদ। ওর ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন।'

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল পোত্রাঘাই। 'ও-নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না।'

'ভাবতে যাচ্ছিও না আমি। সাবধান করা প্রয়োজন, তাই করলাম। ওই

লোক যা খুশি ঘটিয়ে বসতে পারে। তবে এ-ও বলে দিচ্ছি, পাগল ঠেকানোর ছুতোয় যে কাউকে খুন করবেন, তা-ও চলবে না। খুনের চেষ্টা তাকে একবার করেছেন আপনি, শুনেছি। এখানে ফেলে রেখে গিয়েছিলেন মরার জন্যে। ওর পাগল হওয়ার জন্যে আপনিই দায়ী। সুতরাং এখন ভাল করার দায়িত্বও আপনার, নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দেয়ার।'

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়ল পোত্রাঘাই। 'কি ব্যবস্থা করতে হবে ভালই জানা আছে আমার, ওকে আগে পেয়ে তো নিই। এখন জাহাজটা দেখে আসি। অনুমতি তো পাওয়াই গেল, কি বলেন?'

ব্যঙ্গটা গায়ে মাখল না ওমর। 'হ্যাঁ, যান। তবে কোন জিনিস সরানোর অনুমতি দেয়া যাচ্ছে না।'

দু'পাশে দাঁড়ানো দুই সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করল পোত্রাঘাই। 'চলুন।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে ভাঙা জাহাজটার কাছে চলে গেল ওরা। বরফের সিঁড়ি বেয়ে উঠে নেমে গেল কম্প্যানিয়ন-ওয়েতে।

ওরা অদৃশ্য হয়ে গেলে আনমনে বিড়বিড় করল ওমর, 'জটিল হয়ে গেল পরিস্থিতি।' তারপর তাকাল কিশোরের দিকে, 'কি হয়েছিল তোমার?'

যা যা ঘটেছে সংক্ষেপে জানাল কিশোর।

'সোনাগুলো তাহলে বরফের মধ্যেই আছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল ওমর। 'আমরা তো ভেবেছিলাম সাগরেই পড়ে গেছে।'

'না, পড়েনি।'

'তোমাকে যখন তুলে নেয়া হলো, বরফখণ্ডটা কোনদিকে ভেসে যাচ্ছিল, বলতে পারবে?'

'পুবদিকে, কিছুটা উত্তর ঘেঁষে।'

'বরফখণ্ডটা কত বড় হবে?'

'বেশ বড়, তিন একরের কম না।'

'দেখতে কেমন?'

'একমাথা সরু, আরেক মাথা চওড়া। তবে ত্রিকোণ নয়, অনেকটা নাশপাতির মত।'

'প্লেন নামানো যাবে না?'

'না।'

'আবার দেখলে চিনতে পারবে?'

'পারব, যদি ওটার মত আরও না থেকে থাকে, কিংবা গলে আকৃতি অন্য রকম হয়ে না যায়। তবে কাছে থেকে দেখলে আকৃতি নষ্ট হলেও চিনব, সোনার স্তূপের ওপর কাঠের ফালি পুঁতে চিহ্ন দিয়ে রেখেছি। তুষারে ঢেকে গেছে বলে সোনাগুলো দেখতে পায়নি পোত্রাঘাই।'

জাহাজের খোল থেকে বেরিয়ে এল পোত্রাঘাই আর তার দুই সঙ্গী। ওমরদের কাছে এসে দাঁড়াল। 'না, নেই, আপনি ঠিকই বলেছেন। আগের বার আমরা দেখে যাওয়ার পর কেউ জাহাজে উঠেছে, সরিয়ে ফেলেছে ওগুলো।

মানুষ বাস করার চিহ্নও দেখে এলাম। খাবারের টিন খোলা, টেবিলে বাসন-পেয়ালা পড়ে আছে...'

'সে তো আপনাকে আমি বললামই।'

'তা বলেছেন, নিজের চোখে দেখে শিওর হয়ে নিলাম, ভাল হলো না?' বিমানটার দিকে তাকাল পোত্রাঘাই, 'ওটার মধ্যে নেই তো?'

'এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'এত টাকার সোনা, কি করে হবে বলুন?'

'আমি বলছি, নেই। তারপরেও যদি সন্দেহ না যায় আপনার, উঠে দেখতে পারেন, বাধা দেব না।'

বিমানের কেবিনটা দেখে এল পোত্রাঘাই।

'কি, আছে?' জিজ্ঞেস করল ওমর।

জবাব দিল না পোত্রাঘাই। দুই সঙ্গীকে বলল, 'চলুন, জাহাজে চলুন।'

বেত্রাঘাইয়ের দিকে এগোল তিনজনে।

নিচুস্বরে সঙ্গীদের বলল ওমর, 'চলো, আমাদের আলোচনাটাও সেরে ফেলি। প্লেনে বসে সারাটাই নিরাপদ।'

নয়

'দেখলে তো!' ওমর বলল। 'বলেছিলাম না, আমার জানামতে কোন স্যালভেজ অপারেশন নিরাপদে ঘটেনি। এবারও নিরাপদে সারা যাবে না। নইলে দেখো না, বরফের টুকরোটা ভাঙার যেন আর সময় পেল না। গতকালও ভাঙতে পারত, কিংবা আগামীকাল। ওটা ভেঙে ভেসে গেল, আর ঠিক সেই সময় যেন কিশোরকে উদ্ধার করে জট পাকানোর জন্যেই এসে হাজির হলো পোত্রাঘাই–আগেও না, পরেও না। দেখেশুনে মনে হয় আড়ালে বসে অদৃশ্য কেউ আমাদের নিয়ে খেলছে আর মুচকি মুচকি হাসছে...যাকগে, এরপর কি?'

'কি আর, সোনাগুলো খুঁজে বের করা,' কিশোর বলল।

'কিন্তু পোত্রাঘাইয়ের অলক্ষে করব কি ভাবে? এত সহজে হাল ছাড়বে না ও।'

'আমাদের কাছে তো সোনাগুলো নেই দেখলই, কি করবে বলে মনে হয় আপনার?'

সামান্য চিন্তা করে নিল ওমর। 'ও জানে, সোনাগুলো কাছাকাছিই আছে। তন্নতন্ন করে খুঁজবে। আমরা সরিয়েছি, এটা অবশ্য ভাবছে না এখনও। সন্দেহ করছে জেনসেনকে। পোত্রাঘাইয়ের জায়গায় আমরা হলে আমরাও একই সন্দেহ করতাম। জেনসেন একা এতগুলো ভারী সোনার বার বেশিদূরে সরাতে পারবে না, তাই জাহাজটার কাছাকাছিই আছে ধরে নিতাম। কিংবা জাহাজের ভেতরে কোথাও। সেক্ষেত্রে দরকার হলে জাহাজটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো

করতাম। করিনি দেখে অবাক হবে পোত্রাঘাই। ভাবতে ভাবতে হয়তো বেরও করে ফেলতে পারে আসল সত্যটা। তবে ওসব করার আগে জেনসেনকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে সে।'

'জেনসেন ওকে কিছু জানাতে পারবে না,' ক্যাম্পবেল বললেন। 'সে পাগল। পাগলামি করবে, উল্টোপাল্টা কথা বলবে। কোন উপকারে আসবে না পোত্রাঘাইয়ের।'

'আমাদের ওপর নজর রাখবে পোত্রাঘাই,' কিশোর বলল।

'তা তো রাখবেই,' মাথা ঝাঁকাল ওমর। 'সেজন্যেই তার নজরের আওতায় থাকতে চাই না আমি। পুরানো ক্যাম্পে ফিরে যাব। তাঁবুটা খাটানো আছে এখনও, ওজন কমানোর জন্যে খাবার আর অন্যান্য জিনিস বেশির ভাগই ফেলে এসেছি। আরও একটা কারণে ওখানে যেতে চাই, জায়গাটা পুবে, আর তুমি বলছ বরফখণ্ডটা ভেসে যাচ্ছে সেদিকেই।'

'কিন্তু সোনাগুলো পাওয়া গেলেও তুলে আনব কি করে?' রবিনের প্রশ্ন।

তার দিকে তাকাল ওমর, 'অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে সেটা। আদৌ পারব কিনা সেটাও প্রশ্ন। এমন হতে পারে মূল বরফখণ্ডের দিকে না গিয়ে সোজা খোলা সাগরের দিকে ভেসে গেল। কোনভাবেই তুলে আনতে পারব না আর তখন। প্লেন নামানো না গেলে নামব কি করে? খোলা সাগরে গেলে গরম বাতাসের সংস্পর্শে এসে গলতে শুরু করবে বরফ। টুপ টুপ করে পানিতে পড়ে যাবে বারগুলো। হারিয়ে যাবে চিরকালের জন্যে।'

'এখনই কিছু একটা করা দরকার,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন ক্যাম্পবেল। 'মুসাদের জন্যে অপেক্ষা করবেন তো?'

'তা তো করতেই হবে, খবর যখন পাঠিয়ে দিয়েছি। তবে এখানে নয়। পুরানো ক্যাম্পে গিয়ে। কোথায় নামতে হবে ধোঁয়া জ্বেলে সঙ্কেত দেব ওদের। এখানে আর দেরি করার কোন কারণ দেখি না। আর আধঘণ্টার মধ্যেই চলে আসবে মুসারা। যাওয়া যাক।'

'আমাদের যেতে দেখলে পোত্রাঘাই কি করবে?'

'যা ইচ্ছে করুক। আমাদের যেতে দেখলে বরং খুশিই হবে, নিরাপদে সোনা খুঁজতে পারবে ভেবে।'

বিমানের ইঞ্জিন গর্জে উঠতেই ডেকে দাঁড়ানো পোত্রাঘাই আর তার নাবিকের দল রেলিঙের কিনারে এসে দাঁড়াল। সব ক'টা চোখের নজর এদিকে। কিন্তু কিছুই করল না ওরা। চুপচাপ তাকিয়ে রইল।

আকাশ আরও পরিষ্কার হয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুরানো ক্যাম্পটা নজরে এল। সেদিকে চলল ওমর। কিশোর পাশে বসে আছে। রবিন আর ক্যাম্পবেল আগের মতই পেছনে। রেডিওতে মুসাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে রবিন। জানা গেল, কাছে চলে এসেছে ওরা।

ওমর বিমান নামাতেই দরজা খুলে নেমে গেল কিশোর আর রবিন। প্যাকিং বাক্সের কাঠ আর মলাট দিয়ে আগুন জ্বেলে ধোঁয়া করল মুসাদের সঙ্কেত দেবার জন্যে।

দশ মিনিট পরেই এসে হাজির হলো ওরা। ধোঁয়ার ওপর চক্কর মারল বার দুই। তারপর নেমে এল। নিরাপদেই নামল। কোন বিপদ ঘটল না। দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে ছুটে আসতে গেল মুসা। বরফের গুঁড়োয় পা ডেবে গিয়ে গতি কমে গেল। অবাক চোখে তাকাতে লাগল নিচের দিকে।

'খাইছে!' কাছে এসে ওমরের দিকে তাকিয়ে বলল সে, 'এরমধ্যে এতদিন হেঁটেছেন কি করে?'

'এসেছ, জিরাও। শান্ত হয়ে বসে এক কাপ চা খাও। সব বলছি। তবে আগেই একটা ভয় ধরিয়ে রাখি, দুটো প্লেনই এখন এখানে। কোন কারণে যদি উড়ানো না যায়, আটকা পড়ি, মরতে হবে। কেউ উদ্ধার করতে আসবে না আমাদের।'

'তাহলে আনালেন কেন?' রোজার বলল।

'প্রয়োজন আছে বলেই আনিয়েছি।'

'মাইল দুয়েক দূরে একটা জাহাজ দেখে এলাম,' মুসা বলল। 'কার ওটা?'

হাসল ওমর। 'বললামই তো শান্ত হয়ে বোসো, বলছি সব। যে ভাবে প্রশ্ন শুরু করলে দুজনে, কোনটা ছেড়ে কোনটার জবাব দেব?'

চায়ের পানি চড়িয়েই রাখা হয়েছিল। গরম বাষ্প উঠতে থাকা মগে চুমুক দিতে দিতে সোনা উদ্ধারের কাহিনী খুলে বলল ওমর। কি করে সেগুলো আবার হাতছাড়া হয়ে গেছে, তা-ও জানাল। সবশেষে বলল, 'এই হলো বর্তমান পরিস্থিতি। কোন বুদ্ধি বেরোলে বলতে পারো।'

ঘন ঘন কয়েকবার চুমুক দিল মুসা, 'আমার কোন বুদ্ধি নেই।'

'তাহলে সোনাগুলো ফেলেই চলে যেতে বলছ?'

'না, আপনি আর কিশোর থাকতে কোন বুদ্ধি বেরোবে না এটা আমি বিশ্বাস করি না। কি ভাবে উদ্ধার করবেন আপনারা জানেন। আমার সহজ কথাটা বলে দিই, এত কষ্ট করে এতদূর এসে ওই সোনা ফেলে আমি যাচ্ছি না। এক টন সোনা হরহামেশা মেলে না।'

শব্দ করে হাসল ওমর। 'উদ্ধার করতে গিয়ে তখন অন্য কথা বলবে। তোমরা বসো, আমি আর কিশোর গিয়ে দেখে আসি বরফখণ্ডটার অবস্থা।'

'আমার কি কিছু করার আছে?' জানতে চাইলেন ক্যাম্পবেল।

'আছে। আপনি আর রোজার পালা করে পাহারা দেবেন, নজর রাখবেন শত্রুশিবিরের ওপর। আপাতত কিছু করবে বলে মনে হয় না ওরা, তবু শত্রুকে বিশ্বাস নেই।' দু'শো গজ দূরে পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে আছে বরফ, সেটা দেখিয়ে বলল ওমর, 'ওটার মাথায় চড়ে বসলে জাহাজটা চোখে পড়বে সহজেই।'

ঘাড় কাত করলেন ক্যাপ্টেন, 'ঠিক আছে।'

আকাশের দিকে তাকাল ওমর। এত দ্রুত এতটা পরিষ্কার হবে, কল্পনাই করেনি। যে ভাবে তুষারপাত শুরু হয়েছিল, আদৌ বন্ধ হবে কিনা, সেটা নিয়েই ছিল দুশ্চিন্তা। আর এখন যে হারে সাফ হচ্ছে, কিছুক্ষণের মধ্যে ঝকঝকে হয়ে যাবে আকাশ, দিগন্তে সূর্য দেখা দিলেও অবাক হওয়ার কিছু

নেই। এর নাম কুমেরু। কখন যে কি ঘটবে এখানে, কেউ বলতে পারে না। তুষারপাতের সময় দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল মাত্র কয়েক গজ, তা-ও অস্পষ্ট; তারপর কয়েকশো গজ, এখন কয়েক মাইল দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে। জিনিস বলতে শুধুই বরফ–বরফের টুকরো, বরফের স্তূপ, বরফের টিলা, বরফের পাহাড়। একঘেয়ে দৃশ্য, কোন বৈচিত্র্য নেই।

আকাশে উড়ে কিছুদূর এগোতে না এগোতেই নিচের দিকে তাকিয়ে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'ওই যে টুকরোটা! ওটাই!'

'তুমি শিওর?'

'হ্যাঁ।'

গতি যতটা সম্ভব কমিয়ে সেদিকে উড়ে গেল ওমর। নাশপাতি আকারের টুকরোটার আশেপাশে ছোটবড় অনেকগুলো টুকরো ভাসছে। একই দিকে এগিয়ে চলেছে সবগুলো। তবে এতই ধীরে, চট করে বোঝার উপায় নেই।

কাছাকাছি এসে নিচে নামাল ওমর। কিশোরকে বলল, 'দেখো, তোমার চিহ্নটা চোখে পড়ে কিনা।'

'আরেকটু নামান।'

নামাল ওমর। এর বেশি আর নামানো সম্ভব না। চক্কর দিতে লাগল খণ্ডটার ওপর।

হঠাৎ আবার চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি! ওই যে, কাঠের টুকরোটা! যে ভাবে গেঁথেছিলাম সেভাবেই আছে!'

হাসি ফুটল ওমরের মুখে, 'ফাইন। একটা সমস্যা গেল। খুঁজে বের করাতে কোন ঝামেলা হলো না। এখন বোঝার চেষ্টা করো তো, কোনদিকে ভেসে যাচ্ছে?'

মিনিট দুয়েক টুকরোটার ওপর থেকে চোখ সরাল না কিশোর। তারপর মাথা নাড়ল, 'নাহ্, ওপর থেকে বোঝা যাচ্ছে না। আমরা সরছি অনেক দ্রুত। এ অবস্থায় বোঝা যাবেও না।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। পাওয়া যখন গেল, ক্যাম্পে ফিরে যাই বরং, ওখান থেকে নজর রাখব।'

বিমান নামতেই বরফের গুঁড়োর ওপর দিয়ে যতটা দ্রুত পারা গেল দৌড়ে এল মুসা। কিশোরকে দরজা খুলে নামতে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার? এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে? আমরা তো ভাবলাম অনেক সময় লাগবে।'

'ঠিকমত দেখতে পারা গেলে অনেক কিছুই খুব সহজ হয়ে যায়। ওপরে উঠেই দেখি টুকরোটা, এদিকেই আসছে। আকাশ এ রকম পরিষ্কার থাকলে, আর পোত্রাঘাই এসে নাক না গলালে বাকি কাজটা সারতেও খুব একটা কষ্ট হবে না।'

রবিনও এসে দাঁড়িয়েছে মুসার পেছনে। 'কি করতে চাও?'

'আপাতত কিছুই না। শুধু বরফখণ্ডটার ওপর নজর রাখব। কোন দিকে যায় ওটা, দেখব। কোন দিকে যাবে, সেটার ওপরই নির্ভর করছে এখন সবকিছু।'

'মত নির্ভরতার মধ্যে না গিয়ে রবারের ভেলাটায় করে গিয়ে নিয়ে আসা যায় না?' মুসার প্রশ্ন।

'বারগুলো তো আর হাতে নিয়ে দেখোনি, তাই বলছ,' ওমরও নেমে এসেছে। 'যা ভারীর ভারী, ভেলার মধ্যে একটার বেশি তোলাই যাবে না। মাইলখানেক দূরে রয়েছে এখনও খণ্ডটা। অতদূর ভেলা বেয়ে নিয়ে গিয়ে সোনার বার তুলে আবার ফিরে আসা, একবার যাতায়াত করলেই বুঝবে ঠেলা। তা-ও যদি ভাগ্য অতিরিক্ত ভাল হয়, বরফের খোঁচা থেকে বাঁচাতে পারো ভেলাটাকে, তাহলে ফিরে আসতে পারবে। একবার গিয়ে ফিরে এলে দ্বিতীয়বার আর ওমুখো হতে চাইবে না।'

'তারমানে সম্ভব না বলতে চাইছেন?'

'না, সম্ভব না। তবে কুমেরুর পানিতে সাঁতার কাটতে গিয়ে জমে মরার যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে, আমার আপত্তি নেই। তারচেয়ে অন্য প্রস্তাব দিচ্ছি, ভেবে দেখো। তাঁবুতে বসে গরম গরম কিছু খেয়ে নেয়া যাক। সাঁতার এবং খাবারের মধ্যে কোনটা বেশি লোভনীয়, তোমারটা তুমিই বিবেচনা করো।'

দশ

খেয়ে আর কথা বলে আধঘণ্টা পার করে দিল ওরা। ইতিমধ্যে আরও কাছে চলে এসেছে বরফখণ্ডটা। ক্রমাগত কানে আসছে ভাসমান বরফের পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ভাঙার গর্জন, কড়মড় শব্দ।

'পোত্রাঘাইটা হয় একটা গাধা, নয়তো সোনার লোভে অন্ধ হয়ে গেছে,' ভাসমান বরফখণ্ডগুলোকে দেখতে দেখতে বললেন ক্যাম্পবেল। 'বাতাসটা যে ভাবে বইছে, দুই-এক ডিগ্রি সরলেই আটকা পড়বে ও। জাহাজ নিয়ে বেরোনোর আশা শেষ।'

'সেটা না হলেই ভাল,' হালকা গলায় বলল ওমর। 'তাহলে প্লেনে করে ওকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে আমাদের।'

সে নিজেও তাকিয়ে আছে খণ্ডগুলোর দিকে। ক্যাম্পবেলের মত অতটা না বুঝলেও এটুকু বুঝল, তাঁর কথা ঠিক।

ক্রমেই এগিয়ে আসছে সোনা ভর্তি বরফখণ্ডটা। বাতাস আর স্রোতের কারণে দ্রুত এগোচ্ছে এখন। তবে মূল বরফখণ্ডের ওরা যেখানে রয়েছে তার কাছে ঠেকবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না এখনও। অপেক্ষা করে দেখা ছাড়া উপায় নেই।

বরফের পাহাড়ে চড়ে পালা করে পাহারা দিচ্ছেন ক্যাম্পবেল আর রোজার। পোত্রাঘাইয়ের গতিবিধির ওপর নজর রাখছেন। দূরবীনের সাহায্যে দেখা যাচ্ছে জাহাজটার আশেপাশে ছড়িয়ে পড়েছে লোকজন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সোনা খুঁজছে। হয়তো জেনসেনকেও খুঁজে বের করেছে।

খানিক পরে গুলির শব্দ শুনে ভুরু কোঁচকাল ওমর, 'কাকে গুলি করল?'

'ওদের আবার বাছবিচার আছে নাকি,' তিক্তকণ্ঠে জবাব দিলেন ক্যাম্পবেল। 'সীল, পাখি, যা সামনে পাবে, বিনা বিচারে গুলি চালাবে।'

'আপনার কথা সত্যি হলেই ভাল হয়,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বিড়বিড় করল ওমর।

বরফখণ্ডটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অধৈর্য হয়ে উঠেছে ওরা। স্নায়ুতে চাপ পড়ছে ভীষণ। পারলে হাত দিয়ে ধরে টেনে নিয়ে আসে ওটাকে। দূরবীন দিয়ে দেখছে কিশোর। বরফের মাঝখানে উঁচু হয়ে থাকা জায়গাটা দেখতে পাচ্ছে। গেঁথে রেখে আসা কাঠের ফলকটাও চোখে পড়ল।

একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে সিগারেট টানছে ওমর। বরফখণ্ডটা একশো গজ দূরে থাকতে উঠে দাঁড়াল সে। পোড়া সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'আর বেশি দেরি নেই,' বলল সে। 'প্রথমে মুসাদের প্লেনটা ভর্তি করব। রোজার ওটা নিয়ে চলে যাবে। মুসার যাওয়ার দরকার নেই। তাতে দুটো সুবিধে। এক, মুসার ওজনের সমান সোনা বেশি নিয়ে যেতে পারবে। আর দ্বিতীয়ত, মুসাকে এখানে আমরা কাজে লাগাতে পারব। এখন হোক, পরে হোক, পোত্রাঘাইয়ের সঙ্গে ঠোকর আমাদের লাগবেই। লোকবল বাড়িয়ে রাখা ভাল।'

রোজার বলল, 'আমার একা যেতে কোন অসুবিধে নেই।'

কাছে এসে গেল বরফখণ্ড। পাহাড়ের ওপরে পাহারা দিতে গেছে রোজার। বাকি সবাই তৈরি হলো সোনাগুলো তুলে আনার জন্যে। খুব ধীরে ঘুরতে ঘুরতে আসছে খণ্ডটা। মূল বরফখণ্ডের গায়ে ধাক্কা লেগে ঘুরপাক খাচ্ছে স্রোত, ঘুরছে তাতে ভাসমান বরফগুলোও। আস্তে করে এসে ধাক্কা খেল বরফখণ্ডটা, চওড়া অংশটা ঘুরে গিয়ে সরু দিকটা আটকে গেল মূল বরফখণ্ডের গায়ে। গর্জন, কড়মড়, চড়চড়, নানা রকম শব্দ তুলল। কয়েক গজ সরে গিয়ে আবার ধাক্কা খেল। আটকে গেল। আর সরল না।

সোনা আনতে যেতে তৈরি হচ্ছে ওরা, এই সময় দৌড়ে এল রোজার। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'পোত্রাঘাই আসছে। সঙ্গে ছয়জন লোক।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল ওমর, 'আসার আর সময় পেল না ব্যাটা। চুপ করে বসে থাকো সবাই। এখন সোনা আনতে গেলে দেখে ফেলবে। কোনমতেই দেখতে দেয়া চলবে না ওকে।'

আবার প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে পড়ে সিগারেট ধরাল সে। বাকি সবাই কেউ বা বসে, কেউ দাঁড়িয়ে রইল তাকে ঘিরে।

পাহাড় পেরিয়ে সদলবলে সোজা ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে এল পোত্রাঘাই। ওমরের সামনে এসে দাঁড়াল। ভয়ঙ্কর করে রেখেছে মুখ-চোখ। কোন ভূমিকার মধ্যে না গিয়ে কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল, 'সোনাগুলো কোথায়?'

চেহারায় বিরক্তি ফুটিয়ে তুলল ওমর, 'আমি কি জানি?'

'মিথ্যে বলে আর লাভ নেই, মিস্টার ওমর। আপনি যে জানেন, সেটা

আমরা জেনে ফেলেছি।'

একটা ভুরু উঁচু হলো ওমরের। 'ও। তাতেই বা এত উত্তেজিত হওয়ার কি আছে? সোনাগুলো তো আপনার নয়।'

'অবশ্যই আমার।'

'গায়ের জোরে? আপনার হলো কি করে?'

প্রশ্নটার জবাব দিতে না পেরে রেগে উঠল পোত্রাঘাই, 'আপনি বলেছেন আপনার কাছে নেই সোনাগুলো।'

'তা তো নেইই।'

'মিথ্যে কথা।'

মুখে কৃত্রিম বিষণ্ণ হাসি ফোটাল ওমর। 'আপনাকে চালাক মনে করেছিলাম, কিন্তু আপনি আসলেই বোকা লোক, পোত্রাঘাই। সোনাগুলো যদি পেয়েই থাকি বসে আছি কেন এখনও, বরফে সানবেদিং করার জন্যে?'

দ্বিধায় পড়ে গেল পোত্রাঘাই। কোন প্রশ্ন করেই সুবিধে করতে পারছে না। 'কি করেছেন ওগুলোকে?'

ভুরু কুঁচকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে রইল ওমর। 'আমার ক্যাম্পে এসে আমাকে এভাবে প্রশ্ন করার অধিকার কে দিল আপনাকে? আর কি করে ভাবলেন প্রশ্ন করলেই আমি জবাব দেব? শান্ত থাকার অনেক চেষ্টা করছি আমি, পোত্রাঘাই, কিন্তু আপনি আমাকে ধৈর্যের শেষ সীমায় ঠেলে দিচ্ছেন। আমি সরকারী লোক। ওগুলো উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছে আমাকে সরকার। প্রশ্ন করার অধিকার এখানে কারও যদি থাকে, সেটা একমাত্র আমার আছে, আপনার মোটা মাথায় ঢুকছে না কেন কথাটা? আমি জানি আপনি কে, কেন এসেছেন। গতবার এসে কি কাণ্ড করে গেছেন, তা-ও জানি।'

ওমরের কথায় দমল না পোত্রাঘাই। 'আর আমি জানি সোনাগুলো আপনার কাছে আছে।'

কৌতূহলী হলো ওমর। 'এত শিওর হলেন কি করে?'

'জেনসেন বলেছে। সোনাগুলো সরাতে দেখেছে সে।'

'ও, তারমানে ওকে খুঁজে ঠিকই বের করেছেন।'

'আপনি কি ভেবেছিলেন?'

'লোকটা পাগল।'

'পাগল হলেও এতটা নয় যে সোনা সরাতে দেখতে পাবে না, আর সেটা বলতে পারবে না।'

'তারমানে আমি যখন দেখেছি, তখনকার চেয়ে পাগলামি কমেছে ওর,' বিড়বিড় করল ওমর।

'কমানোর ওষুধ দিয়েছি, তাতেই কমেছে।'

'তাই?' চোখের পাতা সরু হয়ে এল ওমরের। 'কি ওষুধ?'

'সেটা আপনার জানার দরকার নেই।'

'আছে, দরকার আছে,' হাসি হাসি ভাবটা চলে গেল ওমরের কণ্ঠ থেকে, কঠিন হয়ে উঠল। 'ওর এ অবস্থার জন্যে আপনিই দায়ী। ওকে ফেলে গেছেন

বলেই মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওর। দেশে নিয়ে যাওয়া এখন আপনার কর্তব্য; যদিও আপনার হাতে ছেড়ে দেয়ার চেয়ে আমি নিয়ে গেলেই বেশি নিরাপদ থাকবে ও। কে নেবে ওকে, আপনি না আমি?'

'ওকে নিয়ে ভাবতে হবে না।'

'মানে!' সন্দেহ দেখা দিল ওমরের চোখে।

জবাব দিতে গিয়েও কি ভেবে দিল না পোত্রাঘাই। দেঁতো হাসি হাসল। বলল, 'ঠিক আছে, এতই যদি পরাণ কাঁদে, নিয়ে যাবেন আপনিই।'

'গুলির শব্দ শুনলাম। কিছু করেননি তো ওকে?'

'করলেই বা আপনার কি?'

'সাবধান হয়ে কথা বলুন, পোত্রাঘাই,' বরফের মত শীতল শোনাল ওমরের কণ্ঠ। 'এখানে অনেক লোককে সাক্ষী বানিয়ে ফেলছেন আপনি। ওর কোন ক্ষতি হলে খেসারত দিতে হবে আপনাকে। যদি ভেবে থাকেন এই দুর্গম এলাকায় একআধটা খুন করে ফেলে রেখে গেলে কে আর দেখতে যাচ্ছে, তাহলে ভুল করবেন। কোনভাবেই পার পেতে দেব না আমি আপনাকে, মনে রাখবেন। এখন ঘাড় ধরে বের করে দেয়ার আগেই বিদেয় হোন আমার ক্যাম্প থেকে।'

দাঁতে দাঁত চাপল পোত্রাঘাই। ভঙ্গি দেখে মনে হলো ঝাঁপিয়ে পড়বে ওমরের ওপর। কিন্তু সামলে নিল। 'ঠিক আছে ঠিক আছে, ভুল করেছি, যান; এ রকম করে কথা বলা উচিত হচ্ছে না আমার। এতে আমাদের কারোরই ভাল হবে না...'

'আপনার হবে না।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে ওমরের দিকে তাকিয়ে রইল পোত্রাঘাই। তারপর কণ্ঠস্বর নরম করে বলল, 'দেখুন, সোনা খুব দামী জিনিস। আমার যেমন কাজে লাগবে, আপনারও লাগবে। শুধু শুধু সরকারকে দিতে যাবেন কেন? ভাগাভাগি করে নিই, আপনার অর্ধেক, আমার অর্ধেক। এক টন সোনার অর্ধেক পেলেও আমি খুশি।'

'দুঃখিত, খুশি করতে পারলাম না আপনাকে,' চাঁছাছোলা জবাব দিল ওমর। 'আমার কাছে নেই। থাকলেও অর্ধেক তো দূরের কথা, একরতি সোনাও আপনাকে দিতাম না আমি। জেনসেন তো সোনাগুলো সরাতে দেখেছে। কোথায় রেখেছি বলেনি আপনাকে?'

'বলেছে। বরফের ওপর নাকি রেখেছেন।'

'তারপর কি ঘটেছে বলেনি?'

'না।'

'আমি বলব?'

'বলুন।'

'যেখানে রেখেছিলাম সেখানেই আছে এখনও।'

'কো-কো-কোথায় রেখেছিলেন?' প্রায় তোতলানো শুরু করল পোত্রাঘাই।

'বাকি কথাটাও আপনাকে বললে পারত জেনসেন। বোধহয় জানে না। তুষার পড়ছিল তো তখন, দেখেনি। ঠিক আছে, সে যখন বলেনি, আমিই বলছি। বলছি, আপনার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে। সোনাগুলোর পাহারায় একজনকে বসিয়ে রেখে আমি চলে গিয়েছিলাম প্লেন আনার জন্যে। ফিরে গিয়ে দেখি সে সেখানে নেই। কি ঘটেছিল জানেন? ও যেখানে বসেছিল, সেখানকার বরফ ভেঙে তাকে সহ ভেসে গিয়েছিল। যখন সে বুঝতে পারল, অনেক দেরি হয়ে গেছে। সরার আর সুযোগ পেল না। সোনা সহ ভাসতে ভাসতে চলে গেল। ওই সোনার স্তূপের ওপরই বসেছিল সে যখন আপনার জাহাজটা দেখতে পায়। পথে তাকেই তুলে নিয়েছিলেন। এখন বুঝতে পারছেন তো কেন সোনাগুলো নিতে পারছি না আমি এবং কেন বসে আছি এখনও? সব শুনলেন। যান, এখন বিদেয় হোন।'

ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল পোত্রাঘাইয়ের চেহারা, কিশোরকে হাতে পেলে নির্দ্বিধায় খুন করত ওকে। এতে বোঝা গেল ওমরের কথা বিশ্বাস করেছে সে। পুরো একটা মিনিট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুঁসল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, যাচ্ছি। তবে যদি মিথ্যে বলে থাকেন, আবার আসব আমি।'

'বরফখণ্ডটা খুঁজে বের করুনগে, তাহলেই বুঝবেন সত্যি বলেছি কিনা,' মোলায়েম স্বরে জবাব দিল ওমর।

'তা তো করবই,' দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস শব্দ করল পোত্রাঘাই। 'তবে দয়া করে তখন আমার সামনে পড়বেন না। তাহলে জেনসেনের যে অবস্থা করেছি, আপনাদেরও করব।'

'ঠিক আছে, মনে থাকবে আমার।'

গোড়ালিতে ভর দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল পোত্রাঘাই। দলবলকে ডেকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল পাহাড়ের দিকে।

ওদের যেতে দেখল ওমররা। পাহাড়ের আড়ালে ওরা হারিয়ে গেলে সঙ্গীদের দিকে ফিরে তাকাল ওমর। ঠোঁটে মৃদু হাসি।

'বললেন কেন ওকে?' ক্যাম্পবেল খুশি হতে পারেননি।

'ওর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে। সময় পেলাম। কাজটা শেষ করে ফেলতে পারব। আমার কথা বিশ্বাস করেছে ও। এখন গিয়ে বরফখণ্ডটা খুঁজে বেড়াবে। ওকে বিদেয় করতে না পারলে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকত, তর্কাতর্কি করতে করতে শেষে গোলাগুলি শুরু হতো। তারচেয়ে এটাই ভাল হলো না?'

'ভালই করেছেন,' কিশোর বলল। 'আমি তো ঘেমে গেছি রীতিমত। ভয় পাচ্ছিলাম, কোন সময় সোনার ওপর বসানো চিহ্নটা দেখে ফেলে। দুই দুইবার হাতের কাছে পেয়েও বোকামি করে ফেলে দিয়ে গেল যখন জানবে, নিজের হাত কামড়ে খেয়ে ফেলবে পোত্রাঘাই।'

'হাত খাওয়া পোত্রাঘাইকে কেমন লাগে দেখতে ইচ্ছে করছে আমার,' মুসা বলল।

'কথা বলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই,' উঠে দাঁড়াল ওমর। 'চলো, সেরে ফেলি।'

একটা ঘণ্টা এক নাগাড়ে কাজ চলল। অর্ধেক সোনা এনে তোলা হলো দ্বিতীয় বিমানটাতে। মোটেও সহজ হলো না কাজটা। মস্ত ঝুঁকি নিতে হয়েছে ওদের। বরফখণ্ডটা ঠিকমত লাগেনি মূল ভূখণ্ডের গায়ে। মাঝে মাঝেই সরে গেছে স্রোতের টানে, ঘুরে ধাক্কা খেয়ে আবার লেগেছে। ধাক্কা খাওয়ার সময়টা আরও বিপজ্জনক। কোন কারণে ওই ফাঁকের মধ্যে কেউ পিছলে পড়ে গেলে ভর্তা হয়ে একেবারে মিশে যেত। বাড়ি খেয়ে বরফের চটা ভেঙে ছিটকে পড়েছে চারদিকে। সেগুলো লাগলেও মারাত্মক জখম হতো। যা-ই হোক, ভাগ্য ভাল, ওরকম কোন বিপদ-টিপদ ঘটল না।

কাজ যখন চলছে, তখনও পালা করে গিয়ে পাহাড়ে বসে পাহারা দিয়েছে ওরা। এখান থেকে গিয়েই সোজা জাহাজে উঠেছে পোত্রাঘাইরা। ছেড়ে গেছে জাহাজটা। খোলা পানিতে খোঁজাখুঁজি করে ফিরে এসে নোঙর করেছে আবার আগের জায়গায়।

রবিন পাহারা দিয়ে এসে রিপোর্ট করেছে, জাহাজের প্রধান মাস্তুলের ওপরে ক্রো-নেস্ট থেকে মাঝে মাঝেই আলোর ঝিলিক চোখে পড়েছে তার। গম্ভীর হয়ে কিশোর বলেছে, নিশ্চয় ওখানে বসে পাহারা দিচ্ছিল কেউ। তার দূরবীনের কাঁচের ঝিলিক ছিল ওগুলো।

কিশোরের অনুমান যে ঠিক, সেটা প্রমাণ করার জন্যেই দৌড়ে এসে জানাল মুসা, 'আবার আসছে পোত্রাঘাই। এবার সঙ্গে একডজন লোক।'

'লড়াইটা আর ঠেকানো গেল না,' বরফে রয়ে যাওয়া সোনার বারগুলোর দিকে তাকাল ওমর। 'ওগুলো ওদের চোখে পড়তে দেয়া চলবে না। ফাঁকগুলো ঢেকে দিয়ে এসো, জলদি।'

'ওরা অনেক বেশি লোক,' চিন্তিত হয়ে পড়েছেন ক্যাম্পবেল। 'মারামারি বাধলে পারব না।'

তাঁর কথা যেন শুনতেই পায়নি ওমর। 'আধখানা বারও ওদের দেব না আমি। রোজার, তুমি প্লেনটা নিয়ে গাউ আইল্যান্ডে ফিরে যাও। সোনাগুলো নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করবে।'

'ও-কে, বস। সোনাগুলো রেখে, তেল ভরে যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসব। না কি বলেন?'

'ঠিক আছে।'

বিমানে গিয়ে উঠল রোজার। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল।

পাহাড় থেকে শেষবারের মত ফিরে এল মুসা। জানাল, লোকগুলোর হাতে অস্ত্র আছে। কারও হাতে রাইফেল, কারও বন্দুক।

'আসুক।'

চলতে শুরু করল রোজারের বিমান।

পাহাড় পেরোতে দেখা গেল দলটাকে। তাদের আসার ভঙ্গিতেই বোঝা যায়, এবার আর অত সহজে ফিরে যাবে না। তাঁবু থেকে পিস্তল বের করে আনার নির্দেশ দিল সবাইকে ওমর। পকেটে বা অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখতে বলল, যাতে শত্রুরা দেখতে না পায়। বাক্সের ওপর বসে একটা রাইফেল দুই

উরুর ওপর আড়াআড়ি ফেলে রাখল।

দশ গজ দূরে এসে সঙ্গের লোকগুলোকে থামতে ইশারা করল পোত্রাঘাই। লাইন দিয়ে দাঁড়াল ওরা।

'আবার কি কারণে এলেন?' কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইল ওমর।

'কেন এসেছি, ভাল করেই জানেন আপনি,' করাত দিয়ে কাঠ কাটার মত খসখস শব্দ বেরোল পোত্রাঘাইয়ের গলা থেকে।

'মাথা থেকে সোনার পোকা বেরোয়নি এখনও?'

'ভেবেছিলেন বোকা বানাবেন আমাকে! মাস্তুলের ওপর থেকে আপনাদের ওপর চোখ রেখেছিল আমার লোক। কি করেছেন দেখেছে।'

'দেখতে নিশ্চয় খুব ভাল লেগেছে ওর।'

'বাজে কথা রাখুন। সোনাগুলো প্লেনে তুলতে দেখেছে ও।'

'তাহলে তো আর কোন দুশ্চিন্তাই থাকল না আপনার। ওগুলো এখন আকাশপথে নির্দিষ্ট জায়গায় রওনা হয়ে গেছে।'

'সব যায়নি। একটা প্লেনে করে এত সোনা নেয়া সম্ভব না। যা গেছে গেছে। বাকিগুলো পেলেই আমি খুশি।'

'কিন্তু আমি খুশি নই।'

'তাহলে...'

বিমানের শব্দে থেমে গেল পোত্রাঘাই। গর্জন করে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল রোজারের প্লেনটা। ছোট একটা জিনিস উড়ে এসে বরফের ওপর পড়ল ওটা থেকে। তাড়াতাড়ি গিয়ে তুলে নিল কিশোর। একটা সিগারেটের টিন। খুলতে ভেতর থেকে বেরোল এক টুকরো কাগজ। পড়ে হাসি ফুটল মুখে। ফিরে এসে কানে কানে বলল ওমরকে। ওমরের মুখেও হাসি ফুটল। মাথা ঝাঁকাল সে। 'পোত্রাঘাই, কি যেন বলছিলেন? সোনা না দিলে কি যেন করবেন?'

'বলতে যাচ্ছিলাম, কেউ বেঁচে থাকবেন না।'

'ঠিক আছে, নাহয় দিয়েই দিলাম আপনাকে। কি করবেন ওগুলো নিয়ে?'

ওমরের প্রশ্নটা দ্বিধায় ফেলে দিল পোত্রাঘাইকে। 'কি করব মানে? নিয়ে আর একটা মুহূর্ত দেরি করব না। কেটে পড়ব এই নরক থেকে।'

মাথা নাড়তে নাড়তে ওমর বলল, 'তা আর পারছেন না। অনেক দেরি করে ফেলেছেন।'

হাসল পোত্রাঘাই। 'ঠেকাবেন আমাদের? ওই ক'টা ছেলেছোকরাকে সঙ্গে নিয়ে?'

'আমরা না ঠেকালেও বরফে ঠেকাবে। আপনার জাহাজটা আটকা পড়েছে। খোলা সাগরের পথ এখন আধ মাইল লম্বা এক আইসবার্গ দিয়ে বন্ধ। চারপাশ থেকে আরও বরফ এসে ওটার আয়তন বাড়াচ্ছে এখন।'

হাসিটা মুছল না পোত্রাঘাইয়ের। 'কোন কথা বলেই আর ফাঁকি দিতে পারবেন না আমাকে।'

কাঁধ ঝাঁকাল ওমর। 'আমার সাবধান করা করলাম, বিশ্বাস করা না করা

আপানার ইচ্ছে।'

'আপনি জানলেন কি করে?'

'আকাশ থেকে মেসেজটা পড়তে দেখলেন না? পাইলট ওপর থেকে সব দেখতে পেয়েছে। সেই খবরটাই জানিয়ে গেল আমাদের। স্টারি ক্রাউনের মত একই দুর্ভাগ্য বরণ করতে চলেছে আপনার বেত্রাঘাইও।'

শুকনো ঠোঁটে জিভ বোলাল পোত্রাঘাই। ওমরের শান্ত ভঙ্গি সতর্ক করে তুলল তাকে।

'আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে লাভ নেই,' ওমর বলল। 'বরং গিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারেন, কোনমতে জাহাজটাকে এখনও খোলা সাগরে বের করে নিতে পারেন কিনা। বাতাস কোন্ দিক থেকে বইছে জানেন তো? ওদিক থেকেই বরফ ঠেলে আনছে।'

'সরে এসে মাথাগুলো মূল বরফখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হলেই শেষ, আটকে গিয়ে প্রবাল প্রাচীরের মত বরফ প্রাচীর তৈরি করবে,' ক্যাম্পবেল বললেন, 'কোন জাহাজের সাধ্য নেই তখন আর ওই দেয়াল ভেদ করে।'

চট করে বিমানটার দিকে চোখ চলে গেল পোত্রাঘাইয়ের, ফিরে এসে স্থির হলো আবার ওমরের ওপর। ওর মনের কথা বোঝা কঠিন। 'আমি আটকা পড়লে আপনারাও পড়বেন। গুলি করে ঝাঁজরা করে দেব আপনার ওই বাহনটাকে, যাতে কোন দিন আর ডানা মেলতে না পারে।'

'আপনি গুলি করবেন, আর আমরা তখন বসে বসে আঙুল চুষব নাকি?'

ভয় দেখিয়ে কাবু করতে না পেরে অন্যপথে চেষ্টা করে দেখল পোত্রাঘাই, 'গোলাগুলি করলে দুই দলেরই ক্ষতি হবে...'

'বুঝতে তাহলে পারছেন।'

'জাহাজটা আটকা পড়লে আপনি কি আমাদের এখানে মরার জন্যে ফেলে যাবেন?'

হেসে উঠল ওমর, 'তো আর কি করব? কতগুলো ডাকাতকে প্লেনে পুরে ঝামেলা বাধাতে যাব কেন? আপনারা বরফের মধ্যে জমে মরলে আমার কি ক্ষতি? বোকামি করে ফেলেছেন, পোত্রাঘাই। বেশি চালাকি করতে গিয়ে নিজের ফাঁদে নিজে পড়ে গেছেন। তবে এখনও আমার কথা যদি মেনে চলেন, বাঁচার একটা সুযোগ আমি করে দিতে পারি। জাহাজে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকুন। নিশ্চয় যথেষ্ট খাবার নিয়ে এসেছেন, না খেয়ে মরবেন না। আমি ফিরে গিয়ে সাহায্য পাঠাব। নেভির জাহাজ এসে যাতে আপনাদের তুলে নিয়ে যায়, সে-ব্যবস্থা করব। এখানে যা যা ঘটেছে, সব জানাব আমি কর্তৃপক্ষকে। কি করবেন, ভেবে দেখুন। যা সিদ্ধান্ত নেবার, জলদি নিন।'

জ্বলন্ত চোখে রাজ্যের ঘৃণা নিয়ে ওমরের দিকে তাকিয়ে রইল পোত্রাঘাই। আর একটা কথাও না বলে ঘুরে দাঁড়াল। এগিয়ে চলল পাহাড়ের দিকে। পেছনে চলল তার দলবল। পাহাড়ের কাছে পৌঁছে দাঁড়িয়ে গেল। ঘিরে দাঁড়াল তাকে বারোজন লোক। নিশ্চয় আলোচনা করছে। মিনিটখানেক পর ছয়জন লোক নিয়ে জাহাজের দিকে চলে গেল পোত্রাঘাই। বাকি ছয়জন এদিকে মুখ

রুয়ে বসে পড়ল পাহাড়ের মাথায়।

বিড়বিড় করল ওমর, 'এত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয় পোত্রাঘাই।'

এগারো

'কি করব আমরা এখন?' জানতে চাইল মুসা।

বাক্সের ওপর বসে দলটার দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে থেকে জবাব দিল ওমর, 'সেটাই ভাবছি।'

'পাহাড়ে বসে আছে কেন ওরা?'

'আমাদের পাহারা দিচ্ছে।'

'কতক্ষণ দেবে?'

'যতক্ষণ আমরা না নড়ব।'

'মানে সোনা তুলে আনতে না যাব?'

'হ্যাঁ।'

'গেলে খুব কি সমস্যা হবে?'

'গিয়ে দেখো।'

হতাশ ভঙ্গিতে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'কিশোর, কিছু বলো!'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে গভীর মনোযোগে চিন্তা করছিল কিশোর। মুসার কথায় ফিরে তাকাল, 'সব সমস্যারই সমাধান আছে।'

'তা তো বুঝলাম,' অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল মুসা, 'এখনকার সমস্যাটার সমাধান কি? বরফে জাহাজ আটকা পড়ার কথা শুনে আমি তো ভেবেছিলাম পোত্রাঘাইয়ের কোমর ভেঙে গেছে।'

মুচকি হাসল কিশোর, 'তা তুমি ভাবতেই পারো। তবে অত দুর্বল মনের মানুষ হলে একটা ভাঙা জাহাজ নিয়ে কুমেরুতে আসার সাহস করত না সে। যে কোন মূল্যেই হোক, সোনাগুলো হাতানোর চেষ্টা করবে। লোকবল আছে তার। প্রয়োজন মনে করলে নির্দ্বিধায় গুলি করে মারবে আমাদের সবাইকে। সেটাই করতে এসেছিল। কিন্তু জাহাজ আটকা পড়ার খবর শুনে কাজটা স্থগিত রেখে ফিরে গেছে। আবার আসবে, জানা কথা।'

'এলেও প্লেন কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করবে বলে মনে হয় না,' রবিন বলল। 'ওর জাহাজে নিশ্চয় এমন কেউ নেই যে প্লেন চালাতে জানে। আমাদের ওপর নির্ভর করতেই হবে তাকে। অন্তত একজনকে হলেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্যে। পুলিশের কাছে রিপোর্ট করে ওকে ফাঁসানোর জন্যে ওই একজনই যথেষ্ট।'

'সেটাও করবে কিনা সন্দেহ আছে। সবশেষে চিন্তা করবে আমাদের কাউকে নিয়ে যাওয়ার কথা, যদি অন্য সব উপায় ফেল করে। তার প্রথম কাজ এখন গিয়ে দেখা সত্যি সত্যি বরফে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে কিনা। জাহাজ

বেরোনোর পথ বন্ধ হয়ে গেলেই যে এখানে আটকে থাকতে হবে তাকে, এমন কোন কথা নেই। সাময়িকভাবে আটকে গেলেও আবার চলা শুরু করতে পারে বরফ। পথ খুলে যেতে পারে। না গেলে বোমা মেরে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করবে। আমার মনে হয় না ডিনামাইট না নিয়ে এই অঞ্চলে এসেছে সে।'

'নিয়েই এসেছে,' ক্যাম্পবেল বললেন। 'আমি যখন ছিলাম, তখনও ডিনামাইট ছিল জাহাজে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'বোমা মেরে যদি রাস্তা করতে না পারে, লাস্ট যা করেছিল সেই কাজ করবে। ডিঙিগুলো বরফের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে চলে যাবে খোলা সাগরের পাড়ে। পানিতে নামিয়ে ভেসে পড়বে। মাত্র একটা ভাঙা নৌকা নিয়ে লাস্ট একা যদি সাগর পাড়ি দিতে পারে, কয়েকটা ডিঙি আর বিশজন লোক নিয়ে পোত্রাঘাই কেন পারবে না? রোজারের কথা ঠিক কিনা দেখতে গেছে সে। ঠিক হোক বা না হোক, ভয় পাবে না। পরের বার আসবে আমাদের সবাইকে খুন করে সোনাগুলো ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে।'

'আমরা কি তখন চুপ করে বসে থাকব নাকি?' ঝাঁজাল কণ্ঠে মুসা বলল, 'ওর লোকও মারা যাবে।'

'হাহ্!' ওমর বলল, 'ওসবের তোয়াক্কা সে থোড়াই করে। নিজের জীবন ছাড়া দুনিয়ার আর কারও কথা ভাবে কিনা ওই লোক, সন্দেহ।'

কিশোর বলল, 'আমাদের ওপর গুলি চালানো নিয়ে অত চিন্তা করছি না আমি। ভাবছি, আরও সহজ কাজটা করবে কিনা সে। প্লেনের ট্যাংকে কয়েকটা ফুটো করে দিলেই ওর চেয়ে বেশি বিপদে পড়ব আমরা। আটকাটা তখন আমরা পড়ব, ও নয়। এবং ও সেটা জানে। যদি দেখে জাহাজটা নিয়ে বেরোনোর সামান্যতম আশাও আছে, সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে প্রথমে ট্যাংক ফুটো করবে, তারপর আমাদের খতম করার চেষ্টা করবে।'

'সময় থাকতে থাকতেই কেটে পড়ছি না কেন তাহলে আমরা?' ক্যাম্পবেলের প্রশ্ন।

'ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়ে সোনাগুলো দিয়ে যাব ওই শয়তানটাকে? তাহলে তো ও-ই জিতল,' রেগে উঠল ওমর। 'মাথায়ও আনবেন না ও-কথা।'

'তারচেয়ে বরং সোনাগুলো তুলে নিয়ে আসি,' প্রস্তাব দিল মুসা। 'এ ভাবে বসে থাকলে আমরাও বরফের টুকরো হয়ে যাব।'

'সোনাগুলো আনতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোলাগুলি শুরু হয়ে যাবে,' কিশোর বলল। 'এক মিনিট বোসো। আরেকটু ভেবে নিই।'

সবাই চুপ হয়ে গেল। আরেকটা সিগারেট ধরাল ওমর। দিগন্তের দিকে চোখ। লাল সূর্যটার মত ওদিককার বরফও রক্তলাল হয়ে গেছে।

'ধরা যাক,' আচমকা কথা বলে উঠল কিশোর, 'নৌকা নিয়েই সাগর পাড়ি দেয়ার কথা চিন্তা করল পোত্রাঘাই। কোনদিকে যাবে? গাউ আইল্যান্ড? গেলেই তো ক্যাঁক করে ধরবে।'

'যাবে না ওখানে,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলে

পৌঁছানোর চেষ্টা করবে। পারবেও সেটা, যদি সাগরে বড় ধরনের ঝড় না ওঠে। রসদপত্রের অভাব নেই তার। খোলা নৌকায় করে এর চেয়ে দূরে চলে যাওয়ার রেকর্ড আছে মানুষের। সে-ও পারবে।'

আবার নীরবতা। বসে থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে উঠল মুসা। আর থাকতে না পেরে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। দুই হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'আমি আর বসে থাকতে পারছি না। ওফ্, কি ঠাণ্ডারে বাবা। জমে একেবারে বরফ হয়ে গেলাম।'

ভারী দম নিয়ে কিশোর বলল, 'হ্যাঁ, কিছু একটা করা উচিত আমাদের। সোনাগুলো প্লেনে তোলার চেষ্টা করব। তাতে অ্যাকশনে চলে যাবে শত্রুপক্ষ। যায়, যাক। এ ছাড়া আর কিছু করার নেই আমাদের।' ওমরের দিকে তাকাল সে, 'ওমরভাই, আমরা সোনা আনতে গেলেই গুলি শুরু করবে, তাই না?'

'কোন সন্দেহ নেই,' জবাব দিল ওমর। 'নইলে ছয়জন লোককে বসিয়ে রেখে গেল কেন? পাহারা দেয়ার জন্যে হলে একজনকে রেখে যাওয়াই যথেষ্ট ছিল।'

'ধরা যাক, সোনাগুলো তুলে আনতে পারলাম আমরা,' মুসা বলল, 'এখনই কি চলে যাব?'

'একটা অসুবিধে আছে,' ওমর বলল।

'খাইছে! খালি অসুবিধার কথা। আবার কি অসুবিধে?'

'জেনসেন। ওকে মরার জন্যে ফেলে রেখে যেতে পারি না আমরা। তবে সেটা পরের কথা। সোনাগুলো আনার পর ওকে উদ্ধার করার কথা ভাবব।'

'ওরা গুলি শুরু করলে আমরাও তো তার জবাব দিতে পারি,' ক্যাম্পবেল বললেন।

'পারি, এবং সেটা করবও। তবে একই সঙ্গে সোনা তুলে আনা, আবার গুলির জবাব দেয়া—কঠিন হয়ে যাবে আমাদের জন্যে। তা হোক। মুসা, তোমাকে দিয়েই শুরু করা যাক। তোমার যখন এতই ইচ্ছে, দৌড়ে গিয়ে একটা বার তুলে আনতে পারবে? দেখতে চাই ওরা কি করে।'

'পারব।'

'ঝুঁকি আছে কিন্তু।'

'এখানে আসাটাই তো একটা মস্ত ঝুঁকির ব্যাপার। আরেকটুতে কিছু এসে যাবে না। আমার দিকে গুলি করে করুক, কিন্তু যদি প্লেনের ট্যাংক ফুটো করতে শুরু করে?'

'এক কাজ করতে পারি,' রবিন বলল, 'আপনারা বারগুলো তুলে এনে এখানে জমা করতে থাকুন, আমি ততক্ষণ প্লেনটা নিয়ে আকাশে চক্কর দিই, তাহলেই আর ওটার ক্ষতি করতে পারবে না।'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল ওমর, 'এ ভাবে তেল খরচ করাটা ঠিক হবে না। আর চক্কর দিলেই বা লাভ কি? সোনাগুলো নেয়ার জন্যে নিচে নামতেই হবে আবার। ফুটো করার চিন্তাই যদি থাকে, তখন করবে।' দূরবীনটা নিয়ে চোখে লাগাল সে। 'জাহাজ থেকে একটা ডিঙি নামিয়ে আইসবার্গের দিকে যাচ্ছে

ওরা। মুসা, দৌড় দাও। যদি দেখো অবস্থা বেগতিক, দেরি না করে ফিরে আসবে।'

মুসাকে সোনাগুলোর দিকে এগোতে দেখার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল লোকগুলো। একজন দৌড় দিল জাহাজের দিকে।

'ওর বসকে জানাতে যাচ্ছে,' আনমনে বলল ওমর।

বাকি পাঁচজন নিজেদের মধ্যে দ্রুত আলোচনা করে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল পাহাড়ের ওপাশে। তবে মুহূর্ত পরেই এক এক করে উঁকি দিতে শুরু করল আবার মাথাগুলো। অস্ত্রগুলো বেরিয়ে এল। গুলির শব্দ হলো। মুসার কয়েক গজ দূরে তুষার ওড়াল বুলেট।

'ও করছে কি?' শঙ্কিত হলো ওমর। 'গুলি চলার সঙ্গে সঙ্গে তো ওকে ফিরে আসতে বলেছিলাম।'

'না নিয়ে ফিরবে না,' ক্যাপ্টেনও উদ্বিগ্ন। 'বড্ড একগুঁয়ে ছেলে। ধরে গিয়ে নিয়ে আসব নাকি?'

নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটা চলেছে কিশোরের। কারও কথাই যেন কানে যায়নি। বলতে লাগল, 'এখানকার আলো বড় অদ্ভুত, নানা রকম কারসাজি করে; তা ছাড়া তুষারে গুলি করে লাগানো বড় শক্ত।'

'কিন্তু তাই বলে চুপচাপ বসে থেকে ওদের গুলি করে যাওয়ার সুযোগ দেয়া যায় না,' ওমর বলল। 'বাধা দেয়া দরকার। রবিন, দেখো হামাগুড়ি দিয়ে ওদের একপাশে চলে যেতে পারো নাকি। বরফের স্তূপের আড়ালে বসে তাহলে ঘামিয়ে তুলতে পারবে ব্যাটাদের। আমরা ওদের মাথা নামিয়ে রাখার বন্দোবস্ত করছি। শুধু পিস্তল নিয়ে যেয়ো না। রাইফেল নিয়ে এসো তাঁবু থেকে।'

দৌড়ে গিয়ে তিনটা রাইফেল বের করে আনল কিশোর আর রবিন। দুজনে দুটো নিয়ে তৃতীয়টা দিল ক্যাম্পবেলকে।

পাহাড়ের ওপরে আবার গুলির শব্দ হলো। এবারও মুসার কয়েক গজ দূরে তুষার ছিটকে উঠল।

গম্ভীর কণ্ঠে বলল ওমর, 'সবাই মাথা নিচু করে রাখো। আমি বললেই গুলি শুরু করবে। অহেতুক গুলি নষ্ট কোরো না। তবে লাগুক আর না লাগুক, মাথা তুলতে দেবে না ব্যাটাদের।'

যে বাক্সটার ওপর বসে ছিল ওমর, সেটার আড়ালে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। গুলি করল একটা মাথা সই করে।

ঝট করে মাথা নামিয়ে ফেলল লোকটা। তার মাথার কাছে তুষার ওড়াল না বুলেট। 'ওপর দিয়ে চলে গেছে। টার্গেটের ফুটখানেক নিচে এইম করবে।'

আবার গুলি করল সে। নেমে গেল মাথাটা। গুলি লেগেছে কিনা বোঝার উপায় নেই।

কিশোর আর ক্যাপ্টেনও গুলি শুরু করলেন। পাহাড়ের ওপরে একজনও আর আগের মত মাথা তুলে রাখতে পারল না।

'চমৎকার,' হাসিমুখে বলল ওমর, 'এটা বজায় রাখতে পারলে সোনা নিয়েই ফিরে আসতে পারবে মুসা।'

থেমে থেমে গুলি চলল।

কাঁধে একটা বার নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল মুসা।

'ভেরি গুড। প্লেনের কাছে রাখো ওটা, কেবিনের দরজার নিচে,' ওমর বলল। 'আর আনতে পারবে?'

'পারব না মানে?' ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল মুসার। বারটা রেখে আবার দৌড় দিল।

পাহাড়ের দিকে কড়া নজর রেখেছে ওমর। মাথা উঠতে দেখলেই গুলি করে।

আরেকটা বার নিয়ে ফিরে এল মুসা। ওমরের বলার অপেক্ষায় রইল না আর। বারটা নামিয়ে রেখেই আরেকটা আনতে ছুটল।

আবার আগের মতই থেমে থেমে গুলি করতে লাগল ওমর। কিশোর আর ক্যাপ্টেনও করছেন। হঠাৎ শোনা গেল পাহাড়ের একপাশ থেকে গুলির শব্দ। পৌঁছে গেছে রবিন।

'পরিস্থিতি এখন আমাদের আয়ত্তে,' ওমর বলল। 'ক্যাপ্টেন, আপনার আর এখানে থাকার দরকার নেই। মুসাকে সাহায্য করুনগে। কিশোর, তুমিও যাও। আমি আর রবিন আটকে রাখতে পারব ওদের।'

রাইফেল ফেলে রেখে ছুটল কিশোর আর ক্যাম্পবেল।

পরের একঘণ্টা একভাবে কাজ চলল। ওমরের নজর পাহাড়ের দিকে। কেবিনের দরজার নিচে সোনার স্তূপ জমছে। অবস্থার পরিবর্তন ঘটল যখন সোনার একটা বার নিয়ে ফিরে এসে কিশোর জানাল, সাগরের দিক থেকে নৌকায় করেও লোক আসছে।

ফিরে তাকাল ওমর। যে বরফখণ্ডতে সোনাগুলো রয়েছে, তার ওপাশে দেখা যাচ্ছে নৌকাটাকে। কি ঘটেছে বুঝতে অসুবিধে হলো না। আইসবার্গ দেখতে গিয়েছিল পোত্রাঘাই। গুলির শব্দ শুনে জাহাজে না ফিরে সরাসরি এদিকে চলে এসেছে। বরফখণ্ডটার ওপরই নামবে। বিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে সে। দুদিক থেকে আক্রান্ত হবে তখন ওমররা। কুলাতে পারবে না। প্রথমে অবশিষ্ট সোনাগুলো তুলে নেয়ার চেষ্টা করবে পোত্রাঘাই। তারপর প্লেনটাকে আক্রমণ করবে। এত কাছে থেকে মিস করার কথা নয়। একবার প্লেনটাকে অকেজো করে দিতে পারলে বাকি কাজ সারার জন্যে তাড়াহুড়ো করা লাগবে না আর ওর, ধীরে সুস্থেও করতে পারবে।

দেরি করার উপায় নেই। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে এখন। চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল ওমর, 'তোমাদের কদ্দূর?'

'গোটা ছয়েক বার রয়ে গেছে এখনও,' জবাব দিল কিশোর।

'বাদ দাও, থাক ওগুলো। যেগুলো আনা হয়েছে প্লেনে তুলে ফেলো। তাড়াতাড়ি করো।'

কেবিনে দ্রুত বারগুলো তুলে ফেলতে লাগল কিশোররা।

রাইফেল হাতে আগের মতই পাহারায় রইল ওমর। পাহাড়ের ওপর কেউ মাথা তুললেই গুলি করে। প্লেন আর কিশোরদের কভার করে রাখল সে।

নৌকা থেকে গোলাগুলি শুরু হয়নি এখনও। নিখুঁত নিশানা করা সম্ভব না বলেই বোধহয় করছে না। কিন্তু ওমর জানে, বরফের ওপর পা রাখামাত্র গুলি শুরু করবে ওরা। এ সময় ফিরে এল রবিন। জানাল, জাহাজ থেকে নেমে ছুটে আসছে জনা সাতেক লোক। এখন সে কি করবে জানার জন্যে এসেছে।

'সাত, না?' জোরে জোরে গোণা শুরু করল কিশোর। 'পাহাড়ের ওপর ছয়, আর নৌকায় পাঁচ, তারমানে আঠারো।' ক্যাম্পবেলের দিকে তাকাল সে। ব্যস্ত হয়ে কেবিনে সোনা তুলছেন। 'ক্যাপ্টেন, বেত্রাঘাইয়ে ক'জন লোক ছিল?'

'আমি যখন ছিলাম, উনিশজন।'

'আপনি আর জেনসেন সহ?'

'না।'

'তারমানে জাহাজ খালি করে সবাই চলে আসছে।'

কাজ করতে করতে জবাব দিলেন ক্যাম্পবেল, 'জাহাজে থেকে আর কি করবে, এখানেই লোক দরকার ওদের। তবে মনে হয় একজনকে রেখে এসেছে, এক চীনা বাবুর্চি, অবশ্য যদি এবারেও সেই লোকটা এসে থাকে। বুড়ো মানুষ, কানেও শোনে না। ওর এখানে এসে লাভ নেই, কিছু করতে পারবে না।'

'গুড,' কি যেন ভাবছে কিশোর। 'ওমরভাই, মনে হয় তুলে আনা যাবে লোকটাকে।'

'কোন লোক?' ভুরু কুঁচকাল মুসা।

মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'জেনসেনের কথা কি ভুলে গেলে? বেচারা। গুলি খেয়ে হয়তো মরেই গেছে। তাইলে আর কিছু করার থাকবে না আমাদের। কিন্তু জখম হয়ে পড়ে থাকলে ওকে বাঁচাতেই হবে। এখানে রেখে গেলে মেরে ফেলবে পোত্রাঘাই। কুকীর্তি ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে কোনমতেই তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না পোত্রাঘাই।'

সোনা তোলা শেষ। পোত্রাঘাইয়ের নৌকাটাও পৌঁছে গেছে। বরফের ওপর নামতে শুরু করেছে ওরা। দুশো গজ দূরে রয়েছে এখনও।

পাহাড়ের দিকে ঘন ঘন কয়েকটা গুলি করে ওদের মাথা কিছুক্ষণের জন্যে নামিয়ে দিল ওমর। তারপর দৌড়ে গিয়ে প্লেনে চড়ে নিজের সীটে বসল। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। বাকি সবাই উঠল। দরজা লাগিয়ে দিল মুসা। কিশোর গিয়ে বসল জানালার ধারে। জানাল, দৌড় দিয়েছে পোত্রাঘাই আর তার সঙ্গীরা। প্লেনটাকে ধরার জন্যে মরিয়া।

'ওরা ভাবছে আমরা বাড়ি যাচ্ছি,' হেসে বলল রবিন। 'কিন্তু যখন দেখবে জাহাজটার কাছে গিয়ে নেমেছি, আমাদের আটকানোর জন্যে লোক রেখে আসেনি বলে কপাল চাপড়াতে থাকবে।'

'কিন্তু লাভ হবে না কোনও,' হেসে বলল মুসা। 'কপাল চাপড়ানোই সার।'

বারো

নিরাপদেই আকাশে উড়ল বিমান। বড় একটা চক্কর দিল ওমর। ওপর থেকে নিচের দৃশ্য অনেক বেশি দূর পর্যন্ত একবারে চোখে পড়ে। শত্রুপক্ষের প্রতিটি লোককে দেখতে পাচ্ছে। নৌকা থেকে যারা নেমেছে–পোত্রাঘাই আর তার সঙ্গের লোকগুলো, হাঁ করে তাকিয়ে রইল প্লেনটার দিকে। ওদের ওপর দিয়ে পার হয়ে আসার সময় পটাপট রাইফেলগুলো উঁচু হয়ে গেল। গুলি করছে বোঝা গেল, কিন্তু এত ওপরের সচল একটা টার্গেটকে লাগানো সহজ নয়।

ওদের গুলির পরোয়া করল না ওমর। তার একমাত্র লক্ষ, ভারী বোঝা নিয়ে বিমানটাকে অক্ষত রেখে ঠিকমত ল্যান্ড করানো। সাধারণ অবস্থায় এত সতর্ক হতো না সে। কিন্তু এখন বিমানটা ভাল থাকার ওপরই নির্ভর করছে ওদের বাঁচামরা। সবাই বুঝতে পারছে সেটা। কেউ কথা বলছে না।

যাই হোক, আবার নিরাপদেই অবতরণ করল বিমান। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সবাই। বেত্রাঘাইয়ের দুশো গজ দূরে এসে থামল। জাহাজের ডেকে একজন লোককেও দেখা গেল না।

সঙ্গে করে প্যাকিং বাক্সের তক্তা নিয়ে আসা হয়েছে। লাফিয়ে নেমে দৌড়ে গিয়ে স্কি'র নিচে সেগুলো ঢুকিয়ে দিল রবিন।

অন্যেরাও নেমে পড়ল। রবিনকে ওখানে থেকে বিমান পাহারা দিতে বলে দ্রুতপায়ে জাহাজের দিকে এগোল ওমর। বরফে খুঁটি গেড়ে তার আর মোটা কাছি দিয়ে জাহাজটাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। জেনসেন যদি কোথাও থাকে, জাহাজেই আছে। ওকে পাওয়ার ব্যাপারে মিথ্যে বলেনি পোত্রাঘাই। জেনসেন না বললে সোনাগুলো নামানোর কথা সত্যি জানত না সে।

হাত নেড়ে ক্যাম্পবেলকে ডাকল ওমর। 'ক্যাপ্টেন, তাড়াতাড়ি আসুন। জাহাজটার কোথায় কি আছে, ভাল জানেন আপনি। জেনসেনকে কোথায় বন্দি করে রাখা যেতে পারে, বলতে পারবেন। কিশোর, আমাদের পেছনে থাকো। কভার দিতে দিতে এগোবে। মুসা, তুমি জাহাজটার সামনে থাকো। কেউ কিছু করতে এলে নির্দ্বিধায় গুলি চালাবে।'

এতক্ষণেও কেউ বেরিয়ে এল না ডেকে। তারমানে কোন লোক নেই, সবাই নেমে চলে গেছে। পাশ থেকে ঝুলছে একটা দড়ির সিঁড়ি। ওটা বেয়ে দ্রুত উঠে গেল ওমর। নিচের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ক্যাম্পবেল আর কিশোর না ওঠা পর্যন্ত।

'অ্যাই, কেউ আছো?' হাঁক দিল ওমর।

জবাব এল না।

কম্প্যানিয়ন-ওয়ে ধরে হেঁটে গেল ওমর। নিচে নামার আগে দূরে পোত্রাঘাইয়ের নৌকাটার দিকে তাকাল। যারা নেমে গিয়েছিল, তারা আবার

ফিরে এসে নৌকায় নামতে শুরু করেছে। নিশ্চয় জাহাজে ফিরে আসবে।

আপনমনে হাসল ওমর। 'আর কিছু না হোক, পোত্রাঘাইকে জন্মের ভয় দেখান দেখিয়েছি। ও নিশ্চয় ভাবছে জাহাজটায় আগুন ধরানোর জন্যে নেমেছি আমরা। আচ্ছা শিক্ষা হয়েছে ব্যাটার।...ক্যাপ্টেন, চলুন নিচে যাওয়া যাক। পথ দেখান।'

আগে আগে চললেন ক্যাম্পবেল। সিঁড়ির মাথায় এসে থামলেন। 'এখানে দাঁড়ান। সবার যাওয়ার দরকার নেই। আমি নিচে থেকে দেখে আসি।'

সিঁড়িতে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি।

পাঁচ মিনিট পরেই ফিরে এলেন। রাগে লাল হয়ে গেছে চোখমুখ। কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'যা ভেবেছিলাম। ওকে তালা আটকে রেখেছে শয়তানটা।'

'চাবিটা পাওয়া যাবে না?'

'পেয়েছি। পোত্রাঘাইয়ের কেবিনে। আসুন, বের করে নিয়ে আসি।'

'অবস্থা কেমন ওর?'

'খুব খারাপ। জখম হয়েছে। রক্ত ঝরে ঝরে কাহিল, আধমরা। রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে শার্ট। কাঁধে গুলি খেয়েছে। পালানোর জন্যে দৌড় দিয়েছিল বোধহয়, গুলি করে থামিয়েছে। বাঁচবে বলে মনে হয় না।'

লম্বা দম নিল ওমর। শান্তকণ্ঠে বলল, 'তা-ও চলুন, চেষ্টা করে দেখা যাক। প্লেনে তুলে নিয়ে যাব। কপাল ভাল হলে বাঁচবে। কিশোর, তুমি এখানেই থাকো।'

পকেট থেকে পিস্তল বের করে হাতে নিল কিশোর। ওমরকে নিয়ে আবার নিচে চলে গেলেন ক্যাপ্টেন। ফিরে আসতে দেরি হলো না। প্রায় বয়ে আনতে হয়েছে জেনসেনকে। ওদের আসতে দেখেই আর দাঁড়াল না কিশোর, দড়ির সিঁড়ির দিকে হাঁটা দিল।

ওপর থেকে জেনসেনকে নামাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হলো। ভীষণ ভারী লোকটা, তার ওপর পরেছে কুমেরুর জবরজং পোশাক। চারজনে মিলে অনেক কায়দা-কসরত করে তারপর নামাল। বয়ে নিয়ে চলল প্লেনে তোলার জন্যে।

নৌকা নিয়ে প্রাণপণ বেগে ছুটে আসছে পোত্রাঘাই। ডাঙায় যারা ছিল, তারাও দৌড়ে আসছে। নৌকাটার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল কিশোর। তারপর বলল, 'ওমরভাই, আপনারা উঠুন, আমি আসছি।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'জাহাজটার দড়ি কেটে দিতে।'

আঁতকে উঠলেন ক্যাপ্টেন, 'সর্বনাশ, বলো কি! তীরের দিক থেকে হাওয়া বইছে। দড়ি কেটে দিলে ভেসে যাবে তো জাহাজটা। বরফে বাড়ি লেগে ডুবে যাবে।'

'যাওয়ার জন্যেই তো কাটব। এখন জাহাজের জন্যে মায়া দেখানোর সময় নেই, তা-ও শত্রুর জাহাজ। ভেসে গেলে ওটা বাঁচাতে ছুটবে পোত্রাঘাই,

আমরা কিছুটা বেশি সময় পাব। নিশ্চিন্তে প্লেনটা ওড়াতে পারব।'

বলে আর দাঁড়াল না কিশোর। দৌড়ে গিয়ে হান্টিং নাইফ দিয়ে পোঁচ মেরে দড়ি কেটে দিল। তারগুলো খুলে দিল খুঁটি থেকে। জাহাজটা সরতে শুরু করল কিনা দেখার প্রয়োজন বোধ করল না। দৌড়ে ফিরে এল বিমানের কাছে।

অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছে ততক্ষণে পোত্রাঘাই। পড়িমরি করে ছুটে আসছে ডাঙায় যারা আছে তারা।

'তাড়াতাড়ি পালানো দরকার,' ওমর বলল। 'ওঠো, ওঠো সব।'

জেনসেনকে প্লেনে তোলাটাও কম কষ্টকর হলো না। কেবিনের মেঝেতে কম্বল বিছিয়ে তাতে আরাম করে শুইয়ে দেয়া হলো।

'ফার্স্ট এইড দেয়া দরকার,' ওমর বলল। 'নইলে গাউ আইল্যান্ড পর্যন্তও পাড়ি দিতে পারবে না, তার আগেই শেষ হয়ে যাবে।'

ওষুধের বাক্স বের করা হলো। ওটা খুলতে গিয়ে নাক কুঁচকে বাতাস শুঁকতে লাগল ওমর। ভাঁজ পড়ল কপালে। 'পেট্রলের গন্ধ মনে হচ্ছে না?'

মুসাও পেয়েছে গন্ধটা, 'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'দেখো তো, কোনখান থেকে আসছে।'

বেরিয়ে গেল মুসা।

জেনসেনের সেবা করতে বসল ওমর। তাকে সাহায্য করলেন ক্যাম্পবেল। কাপড় খুলে ক্ষতটা বের করা হলো। ওষুধ লাগানো তো দূরের কথা, সাধারণ একটা ব্যান্ডেজও বেঁধে দেয়নি পোত্রাঘাই।

দুঃসংবাদ নিয়ে ফিরে এল মুসা। জানাল, গুলি লেগে পেট্রলের ট্যাংক ফুটো হয়ে গেছে। পেট্রল বেশি পড়তে পারেনি। 'চিউয়িং গাম দিয়ে ফুটোটা বন্ধ করে দিয়ে এসেছি,' বলল সে।

একটা মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলল না। তারপর জেনসেনের দিক থেকে মুখ না ফিরিয়েই ওমর বলল, 'এতে হবে না। ভালমত বন্ধ করোগে।'

'কিন্তু সময় লাগবে তো। ততক্ষণে যদি লোকগুলো এসে পড়ে?'

'কিছু করার নেই। আকাশে পেট্রল শেষ হলে মরতে হবে। ফুটো ট্যাংক নিয়ে মেরুসাগরের ওপর দিয়ে উড়তে রাজি নই আমি। যত তাড়াতাড়ি পারো...' বেরিয়ে যাচ্ছিল মুসা, হাত তুলে তাকে থামাল ওমর, 'দাঁড়াও। এখানে থেকে ফুটো বন্ধ করেও লাভ হবে না। ওরা চলে আসবে। আরও অসংখ্য ফুটো করে দেবে ট্যাংকে। তারচেয়ে বরং পুরানো ক্যাম্পে ফিরে যাই। আমাদের যেতে দেখলে আবার ওদিকে যাবে ওরা। সময় লাগবে। এই সুযোগে ট্যাংকটা মেরামত করে ফেলতে পারব আমরা।'

'সেটাই ভাল হবে,' কিশোর বলল। 'যান, আপনি স্টার্ট দিনগে। জেনসেনকে আমরা দেখছি।'

'আবহাওয়াও কিন্তু আবার খারাপ হওয়ার পথে,' আরেকটা দুঃসংবাদ দিলেন ক্যাপ্টেন। 'ব্যারোমিটার নিচে নামছে। ঠাণ্ডাটা টের পাচ্ছেন?'

'পাচ্ছি,' বলে চলে গেল ওমর।
জানালার কাছ থেকে মুসা জানাল, জাহাজের কাছে পৌঁছে গেছে নৌকাটা। বরফ মাড়িয়ে হেঁটে আসছে যারা, তারা রয়েছে পাঁচশো গজ দূরে। তবে দৌড়ানো বন্ধ হয়ে গেছে। পা টেনে টেনে আসছে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বোঝা যায়।
স্টার্ট নিল ইঞ্জিন। গরম হওয়ার জন্যে মিনিট দুয়েক সময় দিল ওমর। তারপর উড়ল। সোজা রওনা হলো পুরানো ক্যাম্পের দিকে। বড় একটা চক্কর দিয়ে দেখে নিশ্চিত হয়ে নিল শত্রুরা সব চলে গেছে, নাকি কেউ পাহারা দেয়ার জন্যে রয়ে গেছে এখনও। ল্যান্ড করেই মুসাকে বলল, 'জলদি যাও, মেরামত করে ফেলো ফুটোটা।...কিশোর, সময় তো আছে হাতে। আপদগুলোও বিদেয় হয়েছে। বাকি সোনার বারগুলোই বা ফেলে যাই কেন?'
হাসিমুখে কিশোর বলল, 'কোন কারণ নেই ফেলে যাওয়ার।'
দরজা খুলে নামতে শুরু করল সবাই।
লাফ দিয়ে বরফের ওপর নেমে আকাশের দিকে তাকাল ওমর। আবার মেঘ জমতে আরম্ভ করেছে। নিঃশ্বাসের বাতাস একটা মুহূর্ত ধোঁয়ার মত ঝুলে থাকছে বাতাসে, তারপর বরফের কুচি হয়ে ঝরে পড়ছে।
বাকি সোনার বারগুলোও তুলে আনা হলো। প্রতিটি মিনিট যাচ্ছে-আর অবনতি ঘটছে আবহাওয়ার। কাজ শেষ হয়নি এখনও মুসার। তাকে সাহায্য করতে গেল কিশোর। দুজনে মিলেও শেষ করতে পারছে না। ভয়াবহ ঠাণ্ডা কাজে দেরি করিয়ে দিচ্ছে ওদের। হাত থেকে দস্তানা খুলে নিতে পারলে আরও তাড়াতাড়ি হত, কিন্তু ফ্রস্টবাইটের ভয়ে খুলতে পারছে না। আর ধাতু যে রকম ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, হাত ছোঁয়ালেই চামড়া খুলে আসবে, গরম ধাতুতে ছোঁয়ানোর মত। দু'জনেই হাত ঝাড়ছে, বাড়ি মারছে তালুতে তালুতে, রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখার জন্যে। গরম কফি বানিয়ে ওদের এনে দিল রবিন। রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছে ওমর।
ইতিমধ্যে শত্রুরাও বসে নেই। শেষবারের মত মরিয়া আক্রমণ চালিয়ে সোনাগুলো কেড়ে নিতে আসছে পোত্রাঘাই। বার বার হাঁটাহাঁটি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ওর লোকেরা। জাহাজটাকে আবার কিনারে ভিড়াল সে। ডাঙায় যারা ছিল তাদের তুলে নিল। তারপর সোজা ছুটে আসতে লাগল জাহাজ নিয়ে, নৌকা নিয়ে এসে যেখানে নেমেছিল সেই জায়গাটা লক্ষ করে। সামনে ছোট ছোট বরফের চাঙড় পড়ছে। ওগুলোও বিপজ্জনক। কিন্তু পরোয়াই করছে না সে। ঘুরপথে গেলে দেরি হবে, তাই সেসব বরফ ছিন্নভিন্ন করে সরাসরি ছুটে আসছে। সোনার নেশা পাগল করে তুলেছে ওকে। হিতাহিত জ্ঞানও নেই যেন আর।
দু'দিক থেকে আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা করেছে পোত্রাঘাই, সেটা বোঝা গেল যখন আধমাইল দূরে থাকতে আধডজন লোককে তীরে নামিয়ে দিল সে। রাইফেল হাতে অর্ধচন্দ্রাকারে সারি দিয়ে এগোতে শুরু করল

লোকগুলো। কিছুটা ঘুরে যে বরফখণ্ডটায় সোনা ছিল সেটার সরু প্রান্তের দিকে এগোতে লাগল জাহাজ। ওদিকে ভিড়িয়ে হেঁটে এলে তাড়াতাড়িও হবে, ভিন্ন দিক থেকে হামলাও চালাতে পারবে বিমানের ওপর।

'আবার গরম হয়ে উঠছে পরিস্থিতি,' দেখতে দেখতে বললেন ক্যাম্পবেল। 'গুলির রেঞ্জের মধ্যে আসার আগেই পালাতে না পারলে বিপদে পড়ে যাব।'

এই সময় মুসা আর কিশোর এসে জানাল, ফুটো মেরামত হয়ে গেছে।

'উঠে পড়ো,' বলেই বিমানে উঠে পড়ল ওমর।

'বাপরে বাপ, যা ঠাণ্ডা!' হাত দুটো বাড়ি মারতে মারতে বলল মুসা। 'এত ঠাণ্ডায় এ সব কাজ করা যায় নাকি!'

ককপিটে বসল ওমর। স্টার্ট দিল। কো-পাইলটের সীটে বসল মুসা। একটা ইঞ্জিন গর্জে উঠল, কিন্তু অন্যটা চুপ করে রইল। কোন শব্দই নেই। আবার চেষ্টা করল ওমর। চালু হলো না ইঞ্জিনটা। মুসার দিকে তাকাল, 'ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।' আবার চেষ্টা করল। এবারেও নীরব হয়ে রইল ইঞ্জিন। আরও একবার চেষ্টা করার পর বলল, 'হবে না। হীটার চালাও।'

মুখটাকে বিকৃত করে ফেলল মুসা, যেন নিম চিবিয়ে ফেলেছে, 'বন্ধ হওয়ার আর সময় পেল না! চলে আসবে তো পোত্রাঘাইরা।'

কাঁধ ঝাঁকাল ওমর। 'কিছু করার নেই। এত ভারী বোঝা নিয়ে এক ইঞ্জিনে ওপরে ওঠা যাবে না।'

কি ঘটেছে জানার জন্যে দরজায় উঁকি দিয়েছিল কিশোর। বলল, 'তাপমাত্রা শূন্যের আটাশ ডিগ্রি নিচে। যতই দেরি হবে, আরও ঠাণ্ডা হতে থাকবে ইঞ্জিন।'

'তার আগেই একটা ব্যবস্থা করা দরকার,' ওমরের কণ্ঠেও উদ্বেগ প্রকাশ পেতে শুরু করেছে, শান্ত থাকতে পারছে না আর। 'ভুলটা হয়ে গেছে তখনই। এতটা ঠাণ্ডা হবে বুঝতে পারিনি, তাহলে রাইফেল নিয়ে পাহারায় না থেকে ইঞ্জিন গরম করার ব্যবস্থা করতাম। কথা বলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। কাজ সেরে ফেলো। আমি পাহারা দিচ্ছি, তোমরা গরম করতে থাকো।'

দমে গেছেন ক্যাপ্টেন। তীরে এসে তরী ডুবতে যাচ্ছে। সব যখন শেষ তখনই কিনা ইঞ্জিনটা বিগড়াল।

সীট থেকে নেমে গেল মুসা। গরম করার যন্ত্রপাতিগুলো বের করতে লাগল। যত তাড়াতাড়িই করুক, গরম করতে বেশ কয়েক মিনিট তো খরচ হবেই।

গুলির শব্দ হলো। থ্যাক করে বিমানের গায়েই কোন্খানে ঢুকল যেন বুলেটটা। এর জন্যে তৈরি ছিল না সে। চমকে উঠল।

আবার শোনা গেল গুলির শব্দ। তবে এবার আর পোত্রাঘাইয়ের লোক নয়, গুলি করেছে ওমর। জবাব এল তার গুলির। সে-ও পাল্টা গুলি চালাল

আবার। রবিনও নেমে গেছে। সে-ও গুলি করল।

দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল কিশোর। রাইফেলটা নিয়ে সে-ও নামবে কিনা ভাবছে; নাকি মুসাকে সাহায্য করতে যাবে। সিদ্ধান্ত নিতে পারল না।

শত্রুপক্ষের কারও গায়ে গুলি লেগেছে বলে মনে হলো না। বরফের দেশ বলেই এত গুলি চলার পরও হতাহত হয়নি এখনও কেউ, দূর থেকে গুলি করে লাগাতে পারছে না; বেঁচে যাচ্ছে অদ্ভুত সাদা আলোর কারণে। এই আলোয় কিছুতেই নিশানা ঠিক থাকছে না। আকাশ সাদা, মাটি সাদা, যেদিকে তাকানো যাচ্ছে সেদিকেই সাদা। কিছুক্ষণ আগেও এতটা সাদা ছিল না, তাপমাত্রা নেমে যাওয়াতে এই অবস্থা হয়েছে আরও; সূর্য দেখা যাচ্ছে না যে আর, তাই।

বরফের ওপর দিয়ে এক ঝলক বাতাস বয়ে এসে মুখে লাগল। ঠাণ্ডার চোটে সঙ্গে সঙ্গে পানি বেরিয়ে এল চোখে। বিচিত্র এই পরিবেশে এখন দুই দল মানুষের গোলাগুলি চালিয়ে একে অন্যকে ধ্বংস করে দেয়ার কথাটা ভাবতে কেমন অদ্ভুত লাগল তার। রীতিমত পাগলামি মনে হলো। সত্যি পাগল হয়ে গেছে যেন পোত্রাঘাই। নিজের গায়ে গুলি লাগার পরোয়াও করছে না আর। সোজা এগিয়ে আসছে বিমানটার দিকে। একটাই লক্ষ্য তার এখন, সোনাগুলো ছিনিয়ে নেয়া।

ক্রমেই কমে আসছে দূরত্ব। বেশিক্ষণ অক্ষত থাকতে পারবে না আর কেউ। কাছে এসে গেলে দু'পক্ষই গুলি খাওয়া শুরু করবে। তার আগে এখান থেকে পালাতে না পারলে ভয়ানক রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যাবে।

ওমরও বুঝতে পারছে সেটা। উদ্বেগে কালো হয়ে গেছে মুখ। মুসাকে তাড়াতাড়ি করার জন্যে চেঁচাতে লাগল।

গরম করছে আর একটু পর পরই ইঞ্জিনটা স্টার্ট নেয়ানোর চেষ্টা করছে মুসা। কোন কাজ হচ্ছে না। হঠাৎ একটা গুলির শব্দের পর রবিনের আর্তনাদ শোনা গেল। ধড়াস করে উঠল বুকের মধ্যে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখে, ডান হাতে বাঁ হাত চেপে ধরে ধীরে ধীরে বরফের ওপর বসে পড়ছে রবিন।

'এই, কি হলো!' চিৎকার করে উঠল ওমর, 'লেগেছে!'

দরজা থেকে লাফ দিয়ে নেমে গেল কিশোর। টেনে-হিঁচড়ে সরিয়ে আনল রবিনকে।

কিশোর আর ক্যাপ্টেন মিলে প্লেনের ভেতরে তুলে আনল ওকে। মুসা ইঞ্জিন চালু করার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা আরও কমেছে। চোখে দেখা না গেলেও বলে দেয়া যায় তাপমাত্রার সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়ারও অবনতি ঘটছে। শুরু হবে ভয়াবহ তুষার ঝড়।

রবিনের হাতটা পরীক্ষা করে দেখল কিশোর। ভাগ্য ভাল, হাড়ে লাগেনি। চামড়ার সামান্য নিচে মাংস ফুটো করে বেরিয়ে গেছে। তবে প্রচুর রক্ত পড়ছে। তাড়াতাড়ি ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে রাইফেল তুলে নিল কিশোর। লড়াইটা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। থ্যাক করে এসে বিমানের গায়ে লাগল

বুলেট। আর যেখানেই লাগুক, পেট্রল ট্যাংক ফুটো হলে এখন আর রক্ষা নেই। জিতে যাবে পোত্রাঘাইয়ের দল।

দরজা দিয়ে সবে বেরিয়েছে কিশোর, নতুন বিপদ এসে হাজির হলো। মাথার ওপর শোনা গেল প্লেনের ইঞ্জিনের শব্দ। উড়ে আসছে আরেকটা প্লেন। উত্তেজনা আর ব্যস্ততার কারণে রোজারের কথা ভুলেই গিয়েছিল ওরা।

রোজার আসাতে কোথায় খুশি হওয়ার কথা, তা না হয়ে হলো শঙ্কিত নিচে কি ঘটছে পুরোপুরি বুঝতে পারবে না রোজার, নিচে নামবে। দুটো বিমানই পড়বে বিপদে। কোনটা নিয়েই উড়ে যাওয়ার আর উপায় থাকবে না হয়তো।

কিশোরকে দেখে রোজারকে সঙ্কেত দিতে বলল ওমর, এখন যে কোনমতেই না নামে। ওর নিজের এখন কোনদিকে নজর দেয়ার সময় নেই, শত্রুদের ঠেকাতেই ব্যস্ত। আরও কাছে চলে এসেছে পোত্রাঘাইয়ের লোকেরা।

কি করে সঙ্কেত দেবে বুঝতে পারল না কিশোর। রেডিওতে জানানোর সময় নেই। চক্কর দিয়ে নামতে শুরু করেছে রোজারের প্লেন। রাইফেলটা বরফের ওপর ফেলে দিয়ে একটামাত্র কাজই করতে পারল কিশোর, দুই হাত ওপরে তুলে টারজানের জংলীদের মত লাফানো শুরু করল, সেই সঙ্গে গলা ফাটিয়ে চিৎকার। কোন কাজ হলো না তাতে। রোজার দেখল বলেও মনে হলো না। বরং খোলা জায়গায় বেরোনোতে শত্রুর গুলি থেকে অল্পের জন্যে বাঁচল কিশোর। বেশ কয়েকটা বুলেট শিস কেটে চলে গেল আশপাশ দিয়ে।

রোজারকে থামানোর আশা বাদ দিয়ে মাটিতে ডাইভ দিয়ে পড়ল সে। হাতে তুলে নিল আবার রাইফেল। অসহায় চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগল দ্রুত উচ্চতা হারাচ্ছে বিমান। চাকাগুলো বরফ স্পর্শ করল। তারপর স্কি দুটো। রান করে ছুটে গেল একেবারে পোত্রাঘাইদের লক্ষ করে। যেন ওদের কাছে যাওয়ার জন্যে খেপে গেছে রোজার। মাথাটা কি বিগড়ে গেল নাকি ওর! চিৎকার করে ওকে সাবধান করতে গেল কিশোর। এক চিৎকার দিয়েই থেমে গেল। জানে, ওর চিৎকার প্লেনের ভেতরে বসা রোজারের কানে পৌঁছবে না কোনমতেই।

উল্লাসে চিৎকার করতে করতে প্লেনের দিকে ছুটে আসতে লাগল পোত্রাঘাইয়ের লোকেরা। কিছুই যে আর করার নেই, সেটা ওমরও বুঝতে পারছে। 'বোকা' ছেলেটার ওপর রাগ হতে লাগল। তবু হাল ছাড়ল না। কাছে চলে আসা লোকগুলোকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি করে চলল। এই প্রথম একটা লোক গুলি খেয়ে পড়ে গেল। কিন্তু তাতে থামল না বাকি লোকগুলো। একই ভাবে চিৎকার করতে করতে দৌড়ে যাচ্ছে প্লেনের দিকে। দরজা খুললেই চেপে ধরবে রোজারকে, কিংবা গুলি করে মারবে।

রাইফেল হাতে নেমে পড়েছেন ক্যাম্পবেল। আহত রবিনও বসে থাকতে

পারেনি। ব্যান্ডেজ বাঁধা হাত নিয়ে সে-ও নেমে এসেছে। রাইফেল দিয়ে গুলি করার জন্যে দুটো হাত দরকার, কিন্তু পিস্তল এক হাতেও চালাতে পারবে। অনবরত গুলি চালাতে লাগল চারজনে মিলে।

ঠিক এই সময় ইঞ্জিনটা স্টার্ট করে ফেলল মুসা। কিন্তু বেকায়দা অবস্থা হয়ে গেছে এখন। আর কয়েক মিনিট আগে করতে পারলেও এই ঘোরাল পরিস্থিতিটা এড়ানো যেত।

খুলে গেল রোজারের বিমানের দরজা। লাফ দিয়ে যাকে নামতে দেখল ওরা, হাঁ হয়ে গেল পাঁচজনেই।

থমকে গেছে পোত্রাঘাই আর দলবলও। রোজারের বিমান থেকে রোজার নামেনি, নেমেছেন নেভাল পুলিশের পোশাক পরা একজন অফিসার। তাঁর পেছন পেছন টপাটপ লাফিয়ে নেমে এল আরও কয়েকজন পুলিশ। সবার হাতে অস্ত্র।

পুলিশের আর গুলি চালানোর প্রয়োজন পড়ল না। দেখেই শামুকের মত গুটিয়ে গেছে পোত্রাঘাইয়ের বীর যোদ্ধারা। পোত্রাঘাই নিজেও হতভম্ব। গুলি করা দূরে থাক, কি করবে বুঝেই উঠতে পারছে না। হঠাৎ নড়ে উঠল সে। পেছন ফিরে দৌড় মারল জাহাজের দিকে। নেতার বেহাল অবস্থা দেখে দলের লোকেরাও সাহস হারাল। যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে অস্ত্র ফেলে ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারল দৌড়াতে শুরু করল।

আদেশ শোনা গেল বাজখাঁই কণ্ঠে। থামতে বলা হলো ওদের। নইলে গুলি করা হবে।

কি আর করে বেচারারা। সোনা তো পেলই না, শুধু শুধু পুলিশের গুলিতে বেঘোরে প্রাণটা হারিয়ে বরফের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ার ঝুঁকি নিল না আর কেউ। এক এক করে ফিরে আসতে শুরু করল। তবে পোত্রাঘাই থামল না। সে ছুটতেই থাকল। হাস্যকর ভঙ্গিতে তার দুই পাশে ব্যাঙের মত লাফাতে লাফাতে ছুটছে তার দুই জাপানী মালিক ঘেউ আর বোকা।

রোজার নেমে ছুটে আসছে ওমরদের দিকে। ওরাও এগোল।

রোজারের হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল ওমর। 'তুমি যে পুলিশ নিয়ে আসবে, কল্পনাই করিনি। খুব ভাল করেছ। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।'

মুহূর্তে বদলে গেছে পুরো পরিস্থিতি। মরতে মরতে বেঁচে গেছে গোয়েন্দারা।

পোত্রাঘাই আর দুই সাঙ্গাতকে ধরে আনতে যাচ্ছিল কয়েকজন পুলিশ, বাধা দিল ওমর, 'অহেতুক কষ্ট করবেন। বরফের বাধা ডিঙিয়ে জাহাজ বের করতে পারবে না ওরা। এখন ধরে নেবেনই বা কিসে করে? থাক ব্যাটারা। পরে যখন খুশি জাহাজে করে এসে ধরে নিয়ে যেতে পারবেন। ধরে নেয়ারও দরকার পড়বে না। নিজেরাই সুড়সুড় করে গিয়ে জাহাজে উঠবে। বরফে থেকে মরার চেয়ে জেলখানা অনেক ভাল।'

সহকারীদের বাধা দিলেন অফিসার। যেতে মানা করলেন। ওমরের দিকে

ফিরে বললেন, 'সাগরের মুখটা বরফের দেয়ালে আটকে দিয়েছে, তাই না? ঠিক আছে ফিরেই যাই। জাহাজ নিয়ে আসব, পরে।'

'হ্যাঁ, সে-ই ভাল। এখন দুটো প্লেনে বোঝা ভাগাভাগি করে পালানো দরকার। দুজন জখমী মানুষ আছে সঙ্গে। আবহাওয়ার মতিগতিও সুবিধের না। ঝড় আসবে মনে হচ্ছে।'

তেরো

দুটো বিমানই নিরাপদে ফিরে এল গাউ আইল্যান্ডে। নামার সঙ্গে সঙ্গে রবিন আর জেনসেনকে নিয়ে গিয়ে ঢোকানো হলো চার বেডের খুদে হাসপাতালটায়। রবিনের ক্ষতটা ধুয়ে-মুছে ব্যান্ডেজ বেঁধে তাকে ছেড়ে দেয়া হলো। কিন্তু জেনসেনের অবস্থা অত সহজে ছাড়ার মত নয়। তাকে রেখে দেয়া হলো।

যে দপ্তরের কাছ থেকে অভিযানের খরচ নিয়েছিল ওমর, তাদের সঙ্গে রেডিওতে যোগাযোগ করল। নৈভাল পুলিশের দায়িত্বে সোনাগুলো রেখে আসতে বলল তারা। একটা জাহাজ পাঠানো হচ্ছে সেগুলো নেয়ার জন্যে। খুশিই হলো ওমর, সোনা বড়ই বিপজ্জনক জিনিস। সঙ্গে থাকলে কোন দিক থেকে যে বিপদ এসে হাজির হয়, টেরও পাওয়া যায় না। তা ছাড়া ওজন কমে যাওয়ায় প্লেন ওড়ানো যাবে সহজে। বহু পথ পাড়ি দিতে হবে এখনও।

গাউ আইল্যান্ডে বসেই প্লেন দুটোর ওভারহলিং করা হলো। কোন রকম যান্ত্রিক গোলযোগ ঘটে কিনা পরীক্ষা করে দেখে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর একদিন দেশে রওনা হলো ওরা। রবিনের হাত ভাল হয়ে এসেছে, তবু সারাক্ষণ একটা স্লিঙে ঝুলিয়ে রাখার পরামর্শ দিলেন ডাক্তার। জেনসেনের জীবনের ঝুঁকি আর নেই, তবে শরীর পুরোপুরি সুস্থ ও মাথা ঠিক হতে আরও অনেক সময় লাগবে। আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে তাকে বড় হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।

নিরাপদে আমেরিকায় ফিরে এল ওরা। সময় কাটতে লাগল। কয়েক মাস কেটে গেল দেখতে দেখতে।

পোত্রাঘাই আর তার দলের কোন খোঁজ পায়নি বহুদিন। না পাওয়ার কারণ আছে। কিশোররা আসার পর পরই ভয়াবহ তুষার ঝড় শুরু হয়েছিল, যেটা আর থামতেই চাইছিল না। সামান্য কমে তো আবার শুরু হয়। তার ওপর নেমে এসেছিল কুমেরুর ভয়াবহ, দীর্ঘ মেরুরাত্রি। জাহাজ নিয়ে বা অন্য কোনভাবেই ওখানে পৌঁছানো যাচ্ছিল না। অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল, নেভিও সাহস করেনি যেতে। কাজেই পোত্রাঘাইদের তুলে আনতে পারেনি।

দুর্যোগ কমে যাওয়ার পর নেভির একটা স্লুপ জাহাজ তুলে আনতে গেল ওদের। আঠারো জনের মধ্যে এগারো জন অবশিষ্ট আছে তখন। বেঁচে

থাকাদের মধ্যে পোত্রাঘাইও নেই, নেই তার দুই সাঙ্গাত ঘেউয়া আর বোকাশুয়া। যারা বেঁচে ফিরল, স্বাভাবিকভাবেই মৃতদের ওপর দোষ চাপাল তারা; বলল, ওদের মৃত্যুর জন্যে ওরা নিজেরাই দায়ী।

কাহিনীটা এ রকম : বরফের দেয়ালে সাগর-পথ রুদ্ধ করে দেয়ায় আর বেরোতে পারেনি বেত্রাঘাই। ধীরে ধীরে মাঝখানের খোলা অংশটুকুতেও বরফ জমে পানি একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়। স্টারি ক্রাউনের মত দুর্ভাগ্যের শিকার হয় জাহাজটা। জাহাজেই বাস করতে থাকে নাবিকেরা। যে চরিত্রের মানুষ ওরা, তাতে স্বাভাবিক ভাবে যা ঘটার তা-ই ঘটে। যখন তখন ঝগড়াঝাঁটি থেকে মারামারি এবং সবশেষে খুনোখুনি। গুলি খেয়ে মরল পোত্রাঘাই। ও এত অত্যাচার শুরু করেছিল, ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে ধরে একদিন জাহাজ থেকে ফেলে দেয় কয়েকজন নাবিক। পোত্রাঘাইয়ের পক্ষের লোকেরা বাধা দেয়। শুরু হয় গোলাগুলি। তাতে প্রাণ হারায় পোত্রাঘাই, ঘেউয়া আর বোকাশুয়া সহ আরও একজন। পোত্রাঘাইয়ের পক্ষের বাকি তিনজনের দু'জন মারা যায় অসুখে, আর তৃতীয়জনের মাথা খারাপ হয়ে গিয়ে জাহাজ থেকে নেমে দৌড় দেয় তুষার ঝড়ের মধ্যে। আর ফিরে আসেনি সে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার কোন হদিস পাওয়া যায়নি।

ক্যাপ্টেন ক্যাম্পবেল তাঁর ভাগের টাকা ছেলের হাতে তুলে দিয়ে একটা জাহাজের দায়িত্ব নিয়ে চলে গেছেন আবার সমুদ্রে। নিজের টাকা আর বাবার টাকা এক করে, সাইকেলের ব্যবসা তুলে দিয়ে গাড়ির ব্যবসা শুরু করেছে রোজার। ভালই আছে সে। সাইকেল ব্যবসার মত আর একঘেয়ে লাগে না।

কুমেরু অভিযানের কথা প্রায় ভুলতে বসেছে তিন গোয়েন্দা, এই সময় একটা চিঠি এল ওদের নামে। জেনসেন লিখেছে। সুস্থ হয়ে আবার জাহাজেই চাকরি নিয়েছে সে, হপ্তাখানেকের মধ্যেই আমেরিকা ছাড়বে। তাকে বাঁচানোর জন্যে তিন গোয়েন্দা আর ওমর শরীফকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। আরও একটা গোপন কথা জানিয়েছে চিঠিতে কয়েক মন সোনার বার এখনও স্টারি ক্রাউনের ভেতরেই পড়ে আছে। সে সরিয়ে রেখেছিল। কারও চোখে পড়েনি বলে আনতে পারেনি। যেখানে রেখেছিল, সেখানেই রয়ে গেছে। তিন গোয়েন্দা আর ওমর যদি ইচ্ছে করে, কোথায় আছে জানাতে পারে সে। তবে ওগুলোর জন্যে সে নিজে আর যেতে রাজি নয় কোনমতেই। কোথায় যোগাযোগ করতে হবে তার সঙ্গে, ঠিকানা দিয়েছে। আর করলে সাতদিনের মধ্যে করতে হবে, তার জাহাজ লস অ্যাঞ্জেলেস ত্যাগ করার আগেই।

'আরও সোনা!' দুই হাত নেড়ে বলল মুসা, 'আমি আর এর মধ্যে নেই। মুরুব্বিদের অনেক দোয়া ছিল, তাই এ যাত্রা প্রাণে বেঁচে এসেছি। কি বলো, কিশোর?'

মৃদু হাসল কিশোর, 'আর কোন রহস্য নেই ওতে। শুধু কয়েক মন সোনার জন্যে প্রাণের ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে নেই।'

ওমরও মুচকি হাসল, 'খরচেও পোষাবে না।'

'তার চেয়ে যেখানে আছে সেখানেই পড়ে থাক,' মুসা বলল, 'ঘেউ আর বোকা যক্ষ হয়ে পাহারা দিক। সর্দার ভূতটা হবে পোত্রাঘাই।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'তারপর কেউ সেই সোনা আনতে গেলেই যাতে একটা করে চোখ দেখিয়ে প্যান্ট খারাপ করাতে পারে।'

আফসোস করতে লাগল মুসা, 'ইস্, তোমার দৌড়টা দেখতে পারলাম না। তাহলে অন্তত অনুমান করতে পারতাম, ভূতের ভয়ে দৌড় দিলে আমার চেহারাটা কেমন হয়!'

—: শেষ :—

গ্রেট রবিনিয়োসো

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

ছাত থেকে সুতোয় ঝুলে নেমে আসছে মাকড়সাটা। একফালি রোদ এসে পড়েছে চকচকে শরীরে। হঠাৎ আট পা বাড়িয়ে দিয়ে আটকে থাকার চেষ্টা করল সুতো ধরে। পারল না। ছিঁড়ে পড়ল সাদা বালিশে।

তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে বাংক থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ল রবিন। টান লেগে পড়ে গেল ডাফেল ব্যাগটা। বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে। বিছানার পাশ দিয়ে মুখ উঁচু করে ভাল করে দেখতে লাগল মাকড়সাটাকে। একটা সিকির সমান।

'সর্, সর্!' ধমক দিল ওটাকে।

'যেখান থেকে এসেছিস, সেখানে যা।'

তার কথা কানেও তুলল না মাকড়সা। যেখানে পড়েছে, সেখানেই গ্যাট হয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেন, পুরো গ্রীষ্মকালটা না হোক, অন্তত বাকি দিনটা।

'জঘন্য!' জোরে জোরে বলে সাবধানে বাংকের দিকে এগোল আবার রবিন। নিজেকে বোঝাল, 'নাহ্, এটা বিষাক্ত নয়, সাধারণ মাকড়সা। কোন ক্ষতি করবে না।'

তাই বলে বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। শুনেছে, এই এলাকায় বিষাক্ত সাপ আর মাকড়সার আড্ডা। আস্তে করে বালিশটা তুলে নিয়ে মাকড়সাটাকে সহ ছুঁড়ে ফেলে দিল আরেকটা বাংকে। চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ছেড়ে দিয়ে আবার ব্যাগটা তুলে আনল বাংকে, জিনিসপত্র খোলায় মনোযোগ দিল, মাকড়সাটা পড়ার আগে যে কাজটা করছিল।

কাপড়-চোপড় আর অন্যান্য জিনিস খুলে খুলে ভরতে লাগল ছোট্ট ওয়্যারড্রোবটার ড্রয়ারে। সারা সকাল থেকে একশোবারের মত জিজ্ঞেস করে ফেলেছে নিজেকে—এখানে কি করতে এসেছ!

আসার ইচ্ছে অবশ্য তার ছিল না। কিন্তু এমন চাপাচাপি শুরু করলেন আঙ্কেল জেড, না এসে আর পারেনি। দুই হপ্তা আগে ফোন করেছিলেন তিনি। আঙ্কেল জেড তার মামা, তার মায়ের সৎভাই, পছন্দ করে রবিন। ফোনেও তাঁকে উদ্বিগ্ন মনে হয়েছে, যদিও ব্যাপারটাকে হালকাভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন তিনি। তাঁর সামারক্যাম্প—ক্যাম্প গোল্ডেন ড্রীম-এ রবিনকে কাউন্সেলরের চাকরি নেয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

'ওখানে তো শুনেছি প্রচুর বিষাক্ত পোকামাকড় আর সাপখোপের বাস,' না যাওয়ার জন্যে ছুতোনাতা খুঁজেছে রবিন।

'ওরকম সব জায়গাতেই কমবেশি আছে। তোদের রকি বীচে কি কম আছে নাকি? আর গোস্ট লেনের বাড়িটার আশেপাশে তো বিষাক্ত ভূত পর্যন্ত আছে,' রসিকতা করেছেন মামা। 'আয়, এসে দেখ। এখানে তোর ভাল লাগবে। তাজা বাতাসে, প্রকৃতির কোলে এসে, শরীর-স্বাস্থ্য সব ভাল হয়ে যাবে।'

'কিন্তু আমি কাউন্সেলর হব কি করে? কিছুই তো জানি না।'

'শিখে নিবি,' স্বভাবসুলভ আন্তরিক, ভারী গলা টেলিফোনেও গমগম করে উঠেছে আঙ্কেল জেডের। 'তা ছাড়া বেশ কিছু যোগ্যতা রয়েছে তোর, কাউন্সেলর হতে যেগুলো কাজে লাগবে। পাহাড়ে চড়তে পারিস, নৌকা বাইতে পারিস, সাঁতার জানিস–গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে বহু কিছু শিখেছিস, যেগুলো অন্যকে শেখাতে পারবি।...তোর মা আছে নাকি কাছাকাছি?'

'আছে।'

'দে, তোর মাকে দে।'

বোনের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন আঙ্কেল জেড। বুঝতে পারছে রবিন, মাকে দিয়েই তাকে রাজি করাতে চাইছেন তিনি।

অনেকক্ষণ কথা বলে কপালে ভাঁজ নিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন মিসেস মিলফোর্ড। 'আসলে তোর সাহায্য চায় জেডি। যাবি না কেন? গরমের ছুটিটা কি করে কাটাবি ভাবছিস?'

'কিন্তু মা, মুসা আর কিশোর...'

'মুসার তো যাওয়ারই অবস্থা নেই। কিশোরকে হয়তো নিতে পারতি, কিন্তু জেডির ক্যাম্পের অবস্থা ভাল না। অতিরিক্ত লোককে চাকরি দিতে পারবে না।'

'কিন্তু ওদের ছাড়া...এই ছুটি...'

'জেডির নাকি তোকে খুব প্রয়োজন, বলেছে আমাকে। নইলে এভাবে চাপাচাপি করত না। যা আগে, গিয়ে অবস্থাটা দেখ। তোর মামার সঙ্গে কথা বলে কিশোরকে নেয়ার ব্যবস্থা যদি করতে পারিস, একটা ফোন করে দিবি ওকে।'

তা বটে। আঙ্কেল জেড তার প্রিয় মামা। তিনিও তাকে ভালবাসেন খুব। ভাল লোক। কিন্তু সব সময়ই একটা দুর্ভাগ্য কাজ করে মামার, বিশেষ করে কোন ব্যবসায় হাত দিলে। তিন বছর ধরে ক্যাম্পটা চালাচ্ছেন–কোন ব্যবসায় এটাই তাঁর দীর্ঘ দিন টিকে থাকা। পরিবারের সবাই দোয়া করছে যেন দাঁড়িয়ে যায় ব্যবসাটা। কিন্তু গোলমাল শুরু হয়ে গেছে। শুরুটা হয়েছে প্রথম বছর থেকেই। বজ্রপাতে আগুন ধরে গিয়ে রেক হলটা পুড়েছে। দ্বিতীয় বছরে হয়েছে বন্যা। তারপর ট্যুরিস্টদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে জলবসন্ত। তিন হপ্তার জন্যে ক্যাম্প বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। আর তৃতীয়, অর্থাৎ গত বছর নৌকা দুর্ঘটনায় মারা গেছে একজন ক্যাম্পার।

এত সব গণ্ডগোলের পর ক্যাম্পটা টিকিয়ে রাখাই কঠিন হয়ে পড়েছে জেডের জন্যে। অন্য ক্যাম্পের মত বেতন দেয়ার সামর্থ্য নেই

কাউন্সেলরদেরকে, এত লোক রাখাও সাধ্যের বাইরে।

'এবারও যদি কোনমতে ক্ষতিটা পূরণ করতে না পারে, গেল!' মিসেস মিলফোর্ড বললেন, 'রবিন, তোর য়াওয়াই উচিত। ভাল করে ভেবে দেখ।'

রীতিমত ফাঁদে পড়ে গিয়ে শেষমেষ রাজি হয়েছে রবিন।

'এই, রবিন!'

ডাক শুনে দিবাস্বপ্ন থেকে যেন চমকে বাস্তবে ফিরে এল রবিন।

কেবিনের খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে বব রিচার্ডস। ঝাঁকি দিয়ে কপালে এসে পড়া চুল সরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কালা হয়ে গেছ নাকি?'

'বব!' আনন্দে চিৎকার করে উঠল রবিন। 'তুমি কখন এলে?'

'এই তো, কয়েক মিনিট,' বব রবিনের বন্ধু। গোস্ট লেনে একই গলিতে থাকে। 'এক সঙ্গেই আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমাদের বাড়িতে যখন ফোন করলাম, তুমি বেরিয়ে গেছ।'

'আমি এসেছি মা'র সঙ্গে। এক কাজে দুই কাজ–গাড়িতে করে আমাকেও নামিয়ে দিয়ে গেল, ভাইয়ের সঙ্গেও দেখা করে গেল।'

'আঙ্কেল জেড যে তোমার মামা, জানতামই না। তোমার আম্মা বললেন, রবিনের জিনিস গোছানো দেখছে বব। 'গতবারও তো এখানে কাজ করে গেছি। একবারও তোমার কথা বলেননি। আসলে এত ব্যস্ত থাকেন, গল্প করার মত সময়ও পান না। তবে খুব ভাল মানুষ। মজার মানুষ। সবাই আঙ্কেল বলে ডাকে।'

'ওরকম একজন মামা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। বব, তোমাকে একটা অনুরোধ করব, উনি যে আমার মামা দয়া করে ক্যাম্পের কাউকে বোলো না এ কথা। জানলে আমার সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণ করতে চাইবে না কেউ।'

'ঠিক আছে, বলব না।' রবিনের ব্যাগটা বিছানার ওপর উপুড় করে ঝাঁকি দিয়ে দেখল বব আর কিছু আছে কিনা।

'নেই। রাখব কোথায় এটা?'

'রেখে দাও বাংকের নিচে,' রবিন বলল।

'কাউন্সেলর হতে এলে তাহলে শেষ পর্যন্ত।'

'দেখি, কতটা পারি। ভাল লাগলে পুরো গরমকালটা কাটিয়ে যাব।'

'ভাল না লাগার তো কোন কারণ দেখি না। কাউন্সেলর হওয়ার সমস্ত যোগ্যতাই তোমার আছে। অভিজ্ঞতাটা কেবল দরকার।'

'হুঁ। কাউন্সেলর আর কে কে আছে এখানে?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল বব। 'অনেকেই আছে। গত বছর যারা যারা কাজ করে গেছে, তাদের বেশিরভাগই আসার কথা এবারেও। কেউ কেউ চলেও এসেছে। নৌকা বাওয়া শেখানোর নতুন একজন ইনস্ট্রাক্টর রাখা হয়েছে…'

কথা শেষ করতে পারল না বব। তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল, 'এই কে আছ! জলদি এসো!'

দুই

পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল রবিনের।

চিৎকারটা তার মামার।

আবার শোনা গেল চিৎকার। সাহায্যের জন্যে ডাকাডাকি করছেন তিনি।

'চলো তো দেখি,' বলেই একছুটে কেবিন ফাইভ থেকে বেরিয়ে এল রবিন। রাস্তার ওপারের মেইন বিল্ডিংটার দিকে দৌড় দিল।

চিৎকারটা আসছে রেক রুম থেকে। মেস হলের একধারের বড় বেড়া দেয়া একটা ঘর।

'এই যে এদিকে,' ববকে বলল রবিন।

একটানে খুলে ফেলল বড় স্ক্রীন ডোরটা। হুড়মুড় করে দুজনে ঢুকে পড়ল ভেতরে। প্রথমে চোখে পড়ল শুধু স্তূপ করে রাখা খেলাধুলার সরঞ্জাম। ক্যাচার মিট, টেনিস র‍্যাকেট, ভলিবল আর ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট, নানা ধরনের নানা আকারের বল জট পাকিয়ে আছে ঘরের মাঝখানে মেঝেতে।

তার ওপর টলটলায়মান অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে একটা লোহার কেবিনেট, একটা পাশ দেয়ালে আটকানো, অন্য পাশটা ছুটে গেছে পুরোপুরি। খেলার সরঞ্জামের স্তূপে চাপা পড়ে আছেন আঙ্কেল জেড, পা আটকা পড়েছে কেবিনেটের খুলে যাওয়া অংশটার নিচে।

মামা বলে ডাকতে গিয়েও ডাকল না রবিন। অন্য সবার মতই 'আঙ্কেল জেড' বলে চিৎকার দিয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল তাঁর পাশে।

'কোথাও লেগেছে নাকি আপনার? কি হয়েছে?'

মুখ বিকৃত করে ফেললেন আঙ্কেল জেড। 'বেরোতে পারছি না। আমাকে বের করো। জিনিসগুলো চেক করছিলাম, হঠাৎ কোন কারণ ছাড়াই কেবিনেটের একটা ধার ছুটে গেল। টানাটানি করে বেরোনোর চেষ্টা করছি না ভয়ে, অন্য দিকটাও খুলে গিয়ে যদি আস্তটাই এসে গায়ের ওপর পড়ে!'

'চুপ করে থাকুন, নড়াচড়া করবেন না,' রবিন বলল। 'সরিয়ে দিচ্ছি।'

বব আর সে মিলে প্রথমে খেলার সরঞ্জামগুলো ঠেলে সরাল। তারপর কেবিনেটের খোলা অংশটা ধরে গায়ের জোরে ঠেলতে লাগল। দাঁড় করিয়ে দিল জায়গামত। খালি কেবিনেটটার ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখল রবিন: বল্টু ছুটে গেছে।

আর যাতে ওটা না পড়ে সেই ব্যবস্থা করতে লাগল বব। মামাকে ধরে ধরে তুলল রবিন। এক পায়ের পেছনের নরম মাংসে বড় একটা লাল দাগ, কেবিনেটের চাপ লেগে হয়েছে। পা'টা ফেলতে গিয়ে উহ্ করে উঠলেন তিনি।

'কি, খুব খারাপ?' জানতে চাইল রবিন। 'ডাক্তার লাগবে?'

'না না, সামান্য একটু চাপ লেগেছে মাত্র। সেরে যাবে। থ্যাংক ইউ। তোমরা না শুনলে সারাটা দিনই হয়তো এই মেঝেতে পড়ে থাকা লাগত।' ববের পাশে কেবিনেটটার কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি। 'পড়ল কেন?'

দাঁড়িয়ে রইল বব আর রবিন। খোলা অংশটা সামনে-পেছনে টানাটানি করে দেখতে লাগলেন আঙ্কেল। বিড়বিড় করলেন, 'অবাক কাণ্ড! খুলল কি করে? দেখো, চারকোণায়ই বল্টু লাগানোর ব্যবস্থা রয়েছে।'

মাথা ঝাঁকাল বব আর রবিন।

'এমন করেই লাগাতে বলেছিলাম মিস্ত্রিকে,' আঙ্কেল বললেন, 'যাতে দেয়াল থেকে খুলে না আসে। ঝড়টর হয় তো খুব, তাই ওভাবে আটকানোর ব্যবস্থা করেছিলাম, যত ঝড়ই হোক, বাতাসে ঝাপটা দিক, খুলে যেন না আসে। অথচ আপনাআপনি খুলে গেল! এক দিকের বল্টুগুলো ঢিলা হয়ে গিয়েছিল। মাথায় ঢুকছে না কিছু!'

'টাইট দেয়া ছিল না হয়তো ঠিকমত,' বব বলল।

'আমি নিজে টাইট দিয়েছি, গত হপ্তায় ক্যাম্পটা খোলার পর। যে কোন জিনিস কমপক্ষে দু'বার চেক করি আমি, ভুল যাতে না হয়।'

'কপাল ভাল আপনার, সবগুলো বল্টু যে খুলে যায়নি,' রবিন বলল। 'সব খুলে উপুড় হয়ে গায়ের ওপর পড়লে বাঁচা লাগত না আর।'

'সেই কথাই তো ভাবছি!' বিমূঢ় কণ্ঠে বললেন আঙ্কেল জেড। রবিনের দিকে তাকিয়ে হাসি ফুটল মুখে। 'কিন্তু প্রিন্স, বড় বেশি দুশ্চিন্তা করছ আমার জন্যে। তবে ঠিকই বলেছ, সবগুলো খুলে এলে...এপাশ-ওপাশ ভালমত সব চেক করতে হবে আরেকবার।'

'আঙ্কেল জেড,' রবিন বলল, 'প্লীজ, আপনি যে আমার মামা এ কথা এখানকার কাউকে জানাবেন না। ববকেও আমি নিষেধ করে দিয়েছি।'

'সরি, ভুলে গিয়েছিলাম।'

ভারী একটা টেবিল ঠেলে নিয়ে গিয়ে কেবিনেটটায় ঠেস দিলেন আঙ্কেল জেড। সোজা করে রাখার ব্যবস্থা করলেন। 'যাই, যন্ত্রপাতি নিয়ে আসি। লাগিয়ে ফেলা দরকার।'

'যান। আমরা এগুলো গুছিয়ে ফেলি,' খেলার সরঞ্জামগুলো দেখাল রবিন।

'ফেলো।'

ঝুঁকে বসে একটা ভলিবল নেটের জট ছাড়ানো শুরু করল রবিন। 'অনেক বেশি সরঞ্জাম,' হাসল সে। 'অলিম্পিক খেলা যাবে।'

'হ্যাঁ, ক্যাম্প হিসেবে গোল্ডেন ড্রীমের তুলনা হয় না,' বব বলল। 'সেজন্যেই তো গতবারের প্রায় সব কাউন্সেলরই ফিরে আসছে এবারেও।'

আঙ্কেল জেডের বিপদের কথা ভাবতে লাগল রবিন।

'রাখব কোথায় এ সব?' হঠাৎ নীরবতা ভাঙল বব।

'তা তো জানি না। ঠিক আছে, টেবিলের ওপরই রাখি। আঙ্কেল এলে জিজ্ঞেস করব।'

জালটাকে সুন্দর করে গুটিয়ে কাঁধে তুলে নিল রবিন। টেবিলে এনে

ফেলল। আরেকবার ভাল করে দেখল কেবিনেটটা। প্রায় ছাত সমান উঁচু। পুরোটা কাত হয়ে কারও গায়ে পড়লে কি ঘটবে সেটা আর ভাবতে চাইল না।

পিংপং প্যাড্‌ল্ আর টেনিস র‍্যাকেটে বোঝাই বড় একটা বাক্স বয়ে নিয়ে এল বব।

'গোছাতেই তো সারাদিন লেগে যাবে।' বাক্সটা টেবিলে নামিয়ে রাখল। 'ওটা কি?'

'কোনটা?'

'ওই যে। কেবিনেটের পেছনে।'

কেবিনেটের পেছনে উঁকি দিয়ে লাল রঙের একটা জিনিস দেখতে পেল রবিন। ওপরের দিকে এক কোণে, বল্টুটা যেখান থেকে খুলে এসেছে, সেখানে গোঁজা রয়েছে ছোট একটা লাল পালক।

'অদ্ভুত তো,' বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে পালকটা টেনে খুলে আনল সে। হাতে নিয়ে দেখতে লাগল। 'এটা এখানে এল কোত্থেকে?'

'কি করে বলব? পাখিটা এসে বসেছিল হয়তো ওখানে...'

'আরে দূর, রসিকতা ভাল্লাগছে না! ওই চিপার মধ্যে যাবে কি করে?'

'ক্র্যাফটস কেবিন থেকে এসে পড়েছে হয়তো কোনভাবে,' বব বলল। 'এ ধরনের প্রচুর জিনিস আছে ওখানে–পালক, পুঁতি, চামড়ার ফালি।'

'কিন্তু ওখানে ঢুকল কি করে?' কিভাবে বল্টুর গর্তে গেল ওটা, মাথায় এল না রবিনের।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমস্ত জিনিস সুন্দর করে টেবিলে সাজিয়ে ফেলল দুজনে, বলগুলো বাদে। বড় একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স নিয়ে তার মধ্যে বলগুলো ফেলতে লাগল রবিন। বেজবল, বাস্কেট বল, রবারের বাউন্সিং বল, বীচ বল, ফুটবল, টেনিস বল, মোট কথা যত রকমের বল আছে, সব আছে। সারাঘরে ছড়িয়ে আছে ওগুলো। সবগুলো খুঁজে বের করাটাই কঠিন। বকর বকর করছে বব। কান পেতে শুনছে আর কাজ করছে রবিন।

'আঙ্কেল জেড এখনও ফিরছেন না কেন?' ববকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আবার কি হলো তাঁর? গেছেন তো অনেকক্ষণ।'

'অন্য কোন কাজে আটকে গেছেন হয়তো। কয়েক মিনিট আগে একটা ফুড ডেলিভারি ট্রাক ঢুকতে দেখে এলাম।'

বেচারা আঙ্কেল জেড, রবিন ভাবছে। ক্যাম্পের প্রায় সব কাজেই থাকতে হয় তাঁকে, দেখাশোনা করতে হয়।

'ওই যে এসে গেছে আরেকজন কাউন্সেলর,' হঠাৎ বলে উঠল বব।

ফিরে তাকাল রবিন। বড় বড় হয়ে গেল চোখ। ও এখানে!

তিন

খোয়া বিছানো পথ ধরে ধীরে ধীরে রেক রুমের দিকে হেঁটে আসছে টেরিয়ার ডয়েল। তিন গোয়েন্দার চিরশত্রু শুঁটকি টেরি। সে-ও গোল্ডেন ড্রীমের কাউন্সেলর।

'কি হলো?' ভুরু নাচাল বব। 'ভূত দেখলে নাকি?'

'ও এখানে আসবে, কল্পনাই করতে পারিনি!'

'চেনো নাকি?'

'চিনব না মানে!'

বাইরে হাসাহাসি, হই-চই শোনা গেল।

'মনে হয় বাকি কাউন্সেলররাও এসে গেছে,' বব বলল। 'চলো, দেখে আসি।'

বাইরে বেরোতেই রবিনকে দেখে থমকে দাঁড়াল টেরি। ধীরে ধীরে হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে। 'বা-বা-বা-বা, নথি-শার্লকও হাজির। বাকি দুটো কই?'

জবাব দিল না রবিন। মুখটা গম্ভীর করে রেখে পাশ কাটিয়ে এল টেরির। অবাক হয়ে একবার রবিনের দিকে একবার টেরির দিকে তাকাতে লাগল বব। দুজনের মধ্যে শত্রুতাটা আঁচ করে ফেলেছে টেরির একটা কথাতেই।

শেষ বিকেল। আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। বল লোফালুফি করছে তিনটে ছেলে, ওদের চেয়ে বছর দু'তিনের বেশি আরেকটা লম্বা ছেলে দাঁড়িয়ে দেখছে। খানিক দূরে একটা পিকনিক টেবিলে বসে সুন্দর চেহারার একটা ছেলে মনোযোগ দিয়ে কি লিখছে। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল রবিন, রেক রুম থেকে বেরিয়ে আসছে টেরি। কাউকে না পেয়েই বোধহয় চলে আসছে। পিকনিক টেবিলে যে ছেলেটা লিখছে তার মুখোমুখি গিয়ে বসল। মুখ তুলে তাকাল ছেলেটা। কি যেন বলল টেরি। জবাব দিল ছেলেটা।

সামনের দিকে হাত তুলে একটা গাছ দেখাল বব, 'ওই যে, ডবি। গাছে উঠে বসে আছে ভাঁড়টা।'

তাকাল সেদিকে রবিন। ম্যাপল গাছের ডালে বসে থাকতে দেখল লম্বা একটা ছেলেকে।

'পাগল নাকি ও?'

হাসল বব, 'কাণ্ড-কারখানা দেখলে সেরকমই মনে হয়।'

বল খেলা দেখছিল যে লম্বা ছেলেটা, সে এগিয়ে এল ওদের দিকে। উচ্চ কণ্ঠে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'হাই, বব। তোমার সঙ্গে কে? রবিন নাকি?'

ছেলেটার চোখা চেহারা, রোদে পোড়া চামড়া। লম্বা চুলগুলোকে পেছন দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে ঝুঁটি করে বেঁধেছে মেয়েদের মত। গলায় স্টেনলেস স্টীলের মোটা একটা চেন। সেটা থেকে বুকের কাছে ঝুলছে একটা পাথরের

পেঁচা।

তাকিয়ে আছে রবিন। ওর কয়েক বছরের বড় হবে ছেলেটা।

কাছে এসে দাঁড়াল সে। হাত বাড়িয়ে দিল, 'আমি স্টিভ মার্সেল। সিনিয়ার কাউন্সেলর। তোমার কেবিনেই থাকব।'

হাতটা ধরল রবিন। আন্তরিক ভঙ্গিতে ঝাঁকিয়ে দিল স্টিভ।

কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল রবিন। গৎ বাঁধা কথা বলল, 'গ্ল্যাড টু মীট ইউ। তারমানে আমি তোমার অ্যাসিসট্যান্ট।'

'হ্যাঁ। আর্ট, ক্র্যাফট আর নৌকা বাওয়া শেখাবে আমার সঙ্গে থেকে। এ কাজ আর করেছ নাকি? অভিজ্ঞতা আছে?'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল রবিন, 'এই প্রথম এলাম কাউন্সেলরগিরি করতে।'

'ও।'

রবিনের মনে হলো কণ্ঠস্বরটা আচমকা শীতল হয়ে গেছে স্টিভের। নাকি ওর অনুমান? তাড়াতাড়ি বলল, 'কাউকে শেখাইনি বটে, তবে নিজে নিজে নৌকা বেয়েছি অনেক। সেইলবোটে করে বাবার সঙ্গে প্রথম বেরিয়েছিলাম সেই তিন বছর বয়েসে।'

'আমাদের এখানে সেইলবোট নেই,' একই রকম শীতল কণ্ঠে বলল স্টিভ। 'শুধু ক্যানু আর বৈঠাওয়ালা নৌকা।'

আমাকে ছাগল ভাবছে ও, চিন্তাটা মন খারাপ করে দিল রবিনের। জেনে যায়নি তো, সে আঙ্কেল জেডের ভাগ্নে? ভাগ্নে বলে অকর্মা লোককেও চাকরি দিয়ে বসে আছেন?

'আসল ব্যাপার হলো কঠিন পরিশ্রম করতে পারা আর শেখার আগ্রহ থাকা,' আবার উষ্ণতা ফিরে এল স্টিভের কণ্ঠে। 'এটা যদি মনে রাখো, তোমাকে নিয়ে আমাদের কোন অসুবিধে হবে না আর।'

ঘুরে অফিসের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল সে।

'কঠিন ঠাঁই,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বিড়বিড় করল রবিন।

'কঠিনতম,' বব বলল। 'তবে মানুষ খারাপ না। ওর মন মত যদি কাজ করতে পারো, সমস্যা হবে না।'

'যাই, কেবিনে গিয়ে বাকি জিনিসগুলো গুছিয়ে ফেলি,' স্টিভের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল রবিন। জিনিসপত্র অগোছাল দেখলে আবার কি করে বসে কে জানে!

'চলো। তোমার কেবিনের পেছনেই আমারটা। আমার জিনিসপত্রও সব বাংকে ছড়ানো।'

পিকনিক টেবিলটার পাশ দিয়ে এগোনোর সময় বাঁকা চোখে রবিনের দিকে তাকাল টেরি। মুখে ব্যঙ্গের হাসি। এড়ানোর জন্যে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিতে যাচ্ছিল রবিন, হাত ধরে টেনে ওকে থামাল বব, 'এক মিনিট।' টেবিলে বসে থাকা অন্য ছেলেটার পেছনে গিয়ে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'হাই ল্যানি, আসতে না আসতেই বাড়িতে চিঠি লেখা শুরু করে দিয়েছ?'

ল্যানির মাথায় সোনালি চুল। টিভির কোন্ একজন অভিনেতার মত লাগে,

মনে করতে পারল না রবিন।

তাড়াতাড়ি চিঠিটায় হাত রেখে লেখাগুলো আড়াল করে ফেলল ল্যানি, 'হ্যাঁ, মা বলে দিয়েছে এসেই যেন জানাই। তারপর প্রতি হপ্তায় একটা করে লিখি। সেজন্যে সারা গ্রীষ্মের লেখা একবারেই লিখে জমিয়ে ফেলছি। সাত দিন পর পর একটা করে পাঠিয়ে দেব।'

'কখন কি ঘটবে কি করে জানছ?' হেসে জিজ্ঞেস করল বব।

'বানিয়ে নিচ্ছি, ভবিষ্যদ্বাণী বলতে পারো। এখন সরো, আমাকে লিখতে দাও। নইলে মাকে লিখে দেব, তোমাকে ভালুকে খেয়ে ফেলেছে।'

ওর এই উদ্ভট রসিকতার মানে বুঝতে পারল না রবিন। তাকে ল্যানির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল বব।

'নাইস টু মীট ইউ,' ল্যানি বলল। 'মাকে লিখে দেব, রবিন নামে একটা ছেলের সঙ্গে আমার গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।'

হাসল রবিন। ছেলেটা আন্তরিক আর হাসিখুসি হলেও তার সঙ্গে সহজ হতে পারল না সে। কোথায় যেন একটা খটকা রয়ে গেছে। মনে হলো কোন ব্যাপারে ওর ওপর ভরসা করা যায় না। চেনা নেই জানা নেই কেন মনে হলো এ কথা, বলতে পারবে না। টেরির দিকে একটিবারও না তাকিয়ে, ল্যানিকে 'পরে দেখা হবে বলে' ববের হাত ধরে টান দিল, 'চলো।'

'হবে তো অবশ্যই,' হাসিমুখে বলল ল্যানি।

কেবিনের কাছে এসে বব বলল, 'ক্যাম্পফায়ারের কাছে দেখা হবে।'

'হ্যাঁ,' বলে চিন্তিত ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকল রবিন। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে লেকের ওপর বিছিয়ে থাকা কমলা রঙের রোদ একধার থেকে সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। জায়গাটা সত্যি চমৎকার। শুধু টেরিটা যদি না থাকত, মুসা আর কিশোর সঙ্গে আসত, খুবই ভাল কাটত এবারের গ্রীষ্মকালটা। মুসার কথা ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। কয়েক দিন থাকার পর এখানকার অবস্থাটা বুঝে নিয়ে কিশোরকে ফোন করবে, ভাবল। চাকরি ছাড়াও আসতে পারবে সে এখানে, ক্যাম্পার হিসেবে। টাকার সমস্যা হবে না। কিশোরের খরচটা নাহয় কাউন্সেলরের চাকরির বেতন থেকে রবিনই দিয়ে দেবে।

পাশের বাংক থেকে ছুঁড়ে ফেলে যাওয়া বালিশটা তুলে, পোকামাকড় আছে কিনা ভাল করে দেখে নিয়ে নিজের বাংকে রাখল। তারপর অগোছাল বাকি জিনিসগুলো গোছাতে শুরু করল।

সূর্যাস্তের সময় এখন অন্ধকার হয়ে গেছে কেবিনের ভেতরটা। ছাতের কাছে মৃদু শব্দ হতেই ঘাড় কাত করে তাকাল।

জমে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

বিশাল কালো একটা ছায়া ফড়ফড় করতে করতে সোজা নেমে আসতে লাগল তার দিকে।

চার

মাথার ওপর চলে এসেছে ওটা।

আপনাআপনি চোখ দুটো বুজে গেল তার। আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে দু'হাত উঠে গেল মাথার ওপর। কিছু না ঘটাতে আবার যখন চোখ মেলল, দেখে কিছু নেই। বুকের মধ্যে এত জোরে লাফানো শুরু করেছে হৃৎপিণ্ডটা, মনে হচ্ছে খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে আসবে।

সত্যি দেখলাম? ভাবছে সে। নাকি কল্পনা?

ঠিক এই সময় চোখের কোণে আবার দেখতে পেল নড়াচড়া। ফিরে তাকাল ভালমত দেখার জন্যে। একটা বাদুড়।

ভ্যাম্পায়ার নাকি!

না, সাধারণ বাদুড়ই ওটা। বাদামী রঙের অনেক বড় বাদুড়। বোঝা যাচ্ছে এখানকার বনে প্রচুর আছে, নইলে এ ভাবে ঘরে ঢুকে বসে থাকত না।

কিন্তু বেশি ভাবনার সময় পেল না। মুখ হাঁ করে আবার ওর দিকে ডাইভ দিয়ে নেমে এল ওটা। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় ডানার বাতাস আর নখের ছোঁয়া লাগল চুলে।

লাফ দিয়ে সরে গেল সে। একই সঙ্গে চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে। আর কিছু না দেখে ওয়্যারড্রোবের ওপর থেকে টান মেরে তুলে নিল বড় তোয়ালেটা। বাড়ি মারতে লাগল ওটা দিয়েই। কিন্তু একটা বাড়িও লাগাতে পারল বলে মনে হলো না।

আবার ছাতের দিকে চলে গেল বাদুড়টা।

বাদুড়ে কামড়াতে আসে! জলাতঙ্ক হয়নি তো? এই রোগ হলেই কেবল বাদুড়ে আক্রমণ করে মানুষকে। কোনমতে যদি দাঁত কিংবা নখের ছোঁয়া লাগে চামড়ায়, রক্ত বেরোয়, সর্বনাশ হয়ে যাবে···তাড়ানো দরকার ওটাকে। যে ভাবেই হোক, বের করা দরকার।

তোয়ালে দিয়ে হবে না। কোন একটা অস্ত্রের জন্যে চারপাশে তাকাল। কিছুই চোখে পড়ল না। এক কোণে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা ক্যানুর একটা দাঁড় চোখে পড়ল হঠাৎ। বাদুড়টা আবার নেমে আসার আগেই ছুটে গিয়ে তুলে নিল ওটা। কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি মারতে শুরু করল। ঠিকমত লাগলে এক বাড়িতেই পড়ে যেত। কিন্তু লাগল না। এক ডানায় সামান্য একটু লাগল। আবার ছাতে চলে গেল বাদুড়টা।

আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে রবিন। সাধারণ বাদুড়কে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কিন্তু জলাতঙ্ক হওয়া বাদুড়, ভ্যাম্পায়ারের চেয়ে ভয়ঙ্কর। ভ্যাম্পায়ার কল্পিত, আর এটা বাস্তব।

ডানায় ব্যথা পেয়ে সহজে নামছে না আর বাদুড়টা। তবে পাগল হয়ে

যাওয়া প্রাণীকে বিশ্বাস নেই। সুযোগ পেলেই আবার নামবে। বৈঠাটা তুলে খোঁচাতে লাগল রবিন। হাত কাঁপছে। বিশাল চক্কর দিয়ে উড়তে শুরু করেছে প্রাণীটা। তীক্ষ্ণ চিৎকার ছাড়তে শুরু করেছে। নিচে নামছে না। লাগানো যাচ্ছে না তার ফলে।

বাদুড়টার সঙ্গে সঙ্গে সারা ঘরে ছুটাছুটি করে বেড়াতে লাগল সে। এখন আর বের করতে চায় না। মেরে ফেলাটা জরুরী। জলাতঙ্ক রোগী, রাত-বিরাতে আবার কাকে কামড়ে দেবে, সর্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়বে। আটকা যেহেতু পড়েছে, ওকে আর বেরোতে দেয়া উচিত না।

আচমকা কোন রকম ইঙ্গিত না দিয়েই ডাইভ দিল আবার বাদুড়টা। শাঁ করে কোনাকুনি রবিনের মুখ লক্ষ্য করে নেমে এল।

রবিনও চিৎকার করে উঠল। বাড়ি মারল দাঁড় দিয়ে। সরে গেল দরজার দিকে। ধাক্কা লাগল কারও গায়ে।

চেঁচামেচি শুনে দেখতে এসেছিল টেরি। দরজা দিয়ে ঢুকেই রবিনের ধাক্কা খেয়ে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিল। রবিনকে বাদুড় খোঁচাতে দেখে, ক্রূর হাসি হেসে ইয়ার্কি মারার ভঙ্গিতে চিৎকার করতে লাগল, 'দেখে যাও কাণ্ড! কাউন্সেলর সাহেব বাদুড়ের সঙ্গে লড়াই করছেন বৈঠা নিয়ে।'

আরও দুজন ঘরে ঢুকল। একজনকে দেখে লাল হয়ে গেল রবিনের গাল। স্টিভ। তার পেছনে অন্য আরেকজন কাউন্সেলর।

'কি করছ?' কঠিন স্বরে জানতে চাইল স্টিভ।

'বাদুড়! বিশাল এক বাদুড় কেবিনের মধ্যে ঢুকেছে!'

হেসে উঠল সঙ্গের অন্য ছেলেটা। 'বাদুড়কে ভয় পায়?'

'তুমি কী, রবিন!' চেঁচিয়ে উঠল স্টিভ। 'সামান্য একটা বাদুড় দেখে এ রকম করছ! বের করে দিলেই হয়। দেখি, দাও দাঁড়টা...'

'স্টিভ, সাবধান!' রবিন বলল। 'বাদুড়টা সাধারণ বাদুড় নয়...'

খিকখিক করে হাসল টেরি, 'তবে কি ড্রাকুলা? দেখো দেখো, রক্তচোষার ভয়ে কেমন কাবু হয়ে গেছে আমাদের আক্কেল জেডের বিশিষ্ট ভাগ্নে, নথি-গোয়েন্দা...'

ওর কথা কানে তুলল না রবিন। 'স্টিভ, আমার ধারণা, ওটার জলাতঙ্ক হয়েছে...'

রবিনের কথাও কানে তুলল না স্টিভ। 'দাও তো দেখি!' দাঁড়টা কেড়ে নিল সে। ওপর দিকে মুখ তুলে বাদুড়টাকে খুঁজতে লাগল। সবাইকে বলল দরজার কাছ থেকে সরে দাঁড়াতে।

বোঝানোর চেষ্টা করছে রবিন, 'জলাতঙ্ক রোগ নিয়ে ওটা বেরিয়ে গেলে বনের অন্য প্রাণীদের কামড়াবে। মানুষকেও কামড়াতে পারে।'

কে শোনে কার কথা। খোঁচাতে খোঁচাতে দরজার কাছে এনে বাদুড়টাকে বের করে দিল স্টিভ। বনের দিকে উড়ে চলে গেল ওটা।

রবিনের দিকে তাকাল স্টিভ। দাঁড়টা বাড়িয়ে দিয়ে আদেশের সুরে বলল, 'যেখান থেকে নিয়েছ, সেখানেই রেখে দাও। তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না

বাপু। বনের মধ্যে কেবিন, বাদুড় তো ঢুকবেই। বাদুড়ের অভাব নেই এখানকার বনে, নানা রকমের বাদুড়। এ ভাবে ভিরমি খেতে থাকলে বাস করবে কিভাবে?' সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, 'চলো। এখানে দাঁড়িয়ে বকবক করলে ক্যাম্পফায়ারে যেতে দেরি হয়ে যাবে।'

মুখ বুজে স্টিভের তিরস্কার আর লেকচার সহ্য করল রবিন। অনেক কষ্টে দমন করল রাগটা।

পাঁচ

বনের কিনারে খানিকটা জায়গা সাফ করে আগুনের কুণ্ড জ্বালানো হয়েছে, ক্যাম্পফায়ার। স্টিভের সঙ্গে রবিন এসে দেখল, বেশির ভাগ কাউন্সেলরই এসে বসে আছে। ববকে দেখে স্বস্তি বোধ করল। গনগনে আগুনে হট ডগ গরম করছে। সূর্য ডুবে গেছে সেই কখন। গোধূলির ম্লান সবজে আলোটুকুও বিলীন হওয়ার পথে।

সহজ হওয়ার জন্যে চেনা-অচেনা সবাইকে 'হাই' বলে সম্বোধন জানিয়ে রবিনও বসে পড়ল একটা পাথরের ওপর। চোখা করা সবুজ একটা সরু ডালে হট ডগ গাঁথতে শুরু করল।

'হাই,' বলে তার সম্বোধনের জবাব দিল বব। অন্যদের কেউ কেউ সামান্য একটু হাসল, কেউ মাথা ঝাঁকাল।

এক ধার থেকে উঠে ল্যানি এসে বসল দুজনের মাঝখানে। উজ্জ্বল হাসি হেসে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, 'মৌসুমের প্রথম ডিনারে সবাইকে স্বাগতম। আমি শুরু করে দিই, ভাই; আমার আর সহ্য হচ্ছে না।'

'দারুণ গন্ধ বেরোচ্ছে কিন্তু,' হেসে তার জবাব দিল রবিন।

'পট্যাটো স্যালাডটা চেখে দেখো, তাহলেই বুঝবে। আঙ্কেল জেডের স্পেশাল জিনিস। আরেকটা স্পেশালিটি তাঁর, দেরি করে আসা।'

আবার হাসল রবিন।

আঙ্কেল জেড এখনও আসেননি। সব সময়ই দেরি করে আসেন তিনি। কি করবেন, সব কাজ একহাতে করা লাগে।

'অতএব থাকো বসে,' ল্যানি বলল। 'ভিসিআর থাকলে কাজ হত, ছবি দেখে সময় কাটাতে পারতাম।'

'আমিও তোমার সঙ্গে একমত,' বব বলল। 'তবে আঙ্কেলের ইচ্ছে, এখানে এই ক্যাম্পে এলে আধুনিকতা থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে থাকো, আদিম জীবনের স্বাদ নাও। নিজেরাই যদি আধুনিকতা নিয়ে পড়ে থাকো, ক্যাম্পারদের শেখাবে কি?'

'আদিম ছবি দেখলেই হয়,' যুক্তি দেখানো শুরু করল ল্যানি। 'আগুন ঘিরে বসে যদি ভূতের গল্প বলা যায়, ছবি দেখা যাবে না কেন? আর হরর

ছবিগুলো তো যা বানায় তার মধ্যে মানুষের আদিমতাই বেশি।'

'হরর ছবি আমার ভাল লাগে না,' রবিন বলল।

'কি বলছ! ফ্রাইডে দা থার্টিন্থ দেখোনি?'

'না, হরর আমি দেখি না।'

'বিশ্বাস হচ্ছে না! ওই সিরিজ দেখেনি এমন কেউ আছে নাকি? কম পক্ষে আটটা খণ্ড বেরিয়ে গেছে।'

'বলছে যখন, নিশ্চয় দেখেনি,' রবিনের হয়ে বব বলল। 'মিথ্যে বলতে যাবে কেন? ছবিটবি তেমন দেখে না ও, তারচেয়ে বই পড়ে আনন্দ পায় বেশি।'

'তুমি জানো না তুমি কি মিস করছ!' ল্যানি বলল। 'সাংঘাতিক ছবি। আর গল্পগুলো কি! হকি মাস্ক পরে ভয়ঙ্কর ওই লোকটা ক্যাম্পারদের খুন করে বেড়ায়...'

'ধূর!' হাত নেড়ে থামিয়ে দিতে চাইল রবিন।

'দেখোনি তো তাই বলছ। এত উত্তেজনা, বাপরে বাপ! প্রথমটার কথাই ধরো না; একা একা বনে ঘুরতে যায় একটা মেয়ে, জানে না হকি মাস্ক পরা লোকটা কুড়াল নিয়ে ঘাপটি মেরে আছে ওখানে...'

'বুঝেছি, আর বলতে হবে না।'

'না, বোঝনি। বুঝতে হলে তোমাকে ছবিটা দেখতে হবে।' প্লেটের দিকে তাকাল ল্যানি। 'আরেকটু স্যালাড নিই।'

ববের দিকে তাকাল রবিন, 'এ সব পচা হরর ছবিগুলো তোমার ভাল লাগে?'

'লাগে,' তেমন জোর নেই ববের গলায়, 'মাঝেসাঝে ভয় পাওয়াটা বেশ মজারই মনে হয়।' হট-ডগে সরিষা মাখাতে মাখাতে হাসল সে।

ভয় পাওয়াটা মজার!...বনের কিনারে মাথা উঁচু করে থাকা গাছগুলোর দিকে তাকাল রবিন। অন্ধকারে এখন আর হাতছানি দিয়ে ডাকছে না বনটা, বরং রহস্যময় লাগছে, মনে হচ্ছে নানা রকম ভয়ানক সব আকৃতি ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্ধকার ছায়ার মধ্যে।

আগুনের দিকে তাকাল আবার। হাসিখুশি, কেমন আন্তরিক মনে হলো আগুনটাকে। উল্টোদিকে, আগুনের অন্যপাশে বসেছে টেরি। জুনিয়ার কাউন্সেলরদের সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি, হাসাহাসি করছে।

নাহ্, অনুরোধে ঢেঁকি গেলাটা অন্যায় হয়ে গেছে। আসাটাই ভুল হয়েছে এখানে। কি করে কাটাবে পুরো গ্রীষ্মকাল?

হঠাৎ শিস শোনা গেল। মুহূর্তে মনটা ভাল হয়ে গেল ওর। আঙ্কেল জেড আসছেন। বিরাট একটা কুলার হাতে নিয়ে হাজির হলেন তিনি।

'সোডা নিয়ে এলাম,' কুলারটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন তিনি। 'অনেক আছে। যার যত খুশি নাও।'

সোডা বের করার জন্যে উঠে গেল কয়েকজন কাউন্সেলর। বড় একটা পাথরের ওপর বসে পড়লেন আঙ্কেল জেড। ববের দিকে তাকিয়ে সবার

অলক্ষে চোখ টিপলেন। তারপর গমগমে আন্তরিক কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন, 'ক্যাম্প গোল্ডেন ড্রীমে কাজ করতে এসেছ তোমরা, আমি খুব খুশি হয়েছি। নতুন যারা এসেছ, এখনও আমার সঙ্গে পরিচয় হয়নি, তাদেরকে বলছি, আমার নাম জেড হুফারসন। তবে সবাই আমাকে আঙ্কেল জেড বলে ডাকে। কাল থেকে ক্যাম্পাররা আসতে শুরু করবে। তৈরি থাকবে তোমরা। কিভাবে কি করতে হবে, কি কি মেনে চলতে হবে, এখানকার নিয়ম-কানুন ছাপা একটা লিস্ট পেয়ে যাবে শীঘ্রি; তবে কয়েকটা প্রধান প্রধান নিয়মের কথা বলছি এখনই...'

আঙ্কেল জেডের পেছনে বনের মধ্যে খসখস শব্দ হলো।

এক মুহূর্তের জন্যে থেমে গেলেন তিনি। তারপর বলতে লাগলেন, 'নতুনদের বলছি, রাতের বেলা বনের মধ্যে নানা রকম শব্দ হয় এখানে, তবে তাতে ভয়ের কিছু নেই। গ্রীষ্মকাল কাটানোর জন্যে এই ক্যাম্পের মত এত স্বাস্থ্যকর আর আনন্দদায়ক জায়গা খুব কমই পাবে।'

আবার শোনা গেল খসখস শব্দ। আগের চেয়ে জোরে। কাউন্সেলররা সবাই তাকাল এবার সেদিকে।

কিসের শব্দ? ভাবছে রবিন। ভালুক? আঙ্কেল জেডের কথায় মনোযোগ রাখতে পারছে না।

'আরও কিছু বলার আগে,' আঙ্কেল বললেন, 'এসো, সবার সঙ্গে সবাই পরিচিত হয়ে নিই। আমি কে, সবাইকে বলেছি। এবার তোমরা যার যার পরিচয় দাও। একধার থেকে শুরু করো। স্টিভ?'

'আমি স্টিভ মার্সেল,' বলল কালো চুলওয়ালা লম্বা ছেলেটা। 'এই ক্যাম্পে আমি তৃতীয়বার এলাম। আমি একজন বোটিং এক্সপার্ট। আর্টস আর ক্র্যাফ্‌ট্‌স জানা আছে।'

স্টিভের পর তার পাশের ছেলেটা পরিচয় দিতে গেল। কিন্তু মুখ খোলার আগেই রক্ত পানি করা তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এল বনের ভেতর থেকে। মুহূর্ত পরেই ঝোপের ডালপালা ফাঁক করে আগুনের সামনে লাফিয়ে এসে পড়ল একটা মূর্তি। কালো শার্ট আর প্যান্ট পরনে, মুখে লাগানো হকি মাস্ক। আতঙ্কিত হয়ে দেখছে রবিন, কোমরের বেল্ট থেকে একটা কুড়াল খুলে নিয়ে তাকে কোপ মারতে আসছে মূর্তিটা।

ছয়

হাঁ করে তাকিয়ে আছে রবিন। কথা নেই মুখে।

কুড়ালটা ঝাঁকাল মুখোশ পরা মূর্তিটা।

চিৎকার করে উঠল আগুনের পাশে বসা একজন নতুন কাউন্সেলর।

'খব মজা পেলাম, ডবি,' বাতাস কাঁপিয়ে দিল যেন আঙ্কেল জেডের ভারী,

গমগমে, শান্ত কণ্ঠ। 'আমার প্রিয় ছবিটার কথা মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ।'

'স্বীকার করতে দোষ কি?' মুখোশ পরা মূর্তিটা বলল। 'আপনার চেহারাই তো বলছে, সবার মত আপনিও ভয় পেয়েছেন।'

'না, ভয় পাইনি,' আঙ্কেল বললেন, 'তবে আতঙ্কিত হচ্ছি, সারাটা গ্রীষ্মকাল তোমার ওই গাধার মত রসিকতাগুলো সইতে হবে ভেবে।'

হেসে উঠল কয়েকজন।

মুখোশ খুলে নিল ডবি। বেরিয়ে পড়ল তার মুখের তিলে ভর্তি ফ্যাকাসে চামড়া আর নীল চোখ।

'যারা ওকে চেনো না,' আঙ্কেল বললেন, 'তাদেরকে বলছি, ভয়ঙ্কর এই কুড়ালওয়ালা খুনীটির নাম ডবি জনসন। ওর ব্যাপারে সাবধান থাকবে, বলে দিলাম।'

রবিনের দিকে কাত হয়ে কানে কানে বলল বব, 'ডবি মনে করে, তার রসিকতাগুলো অসাধারণ। আমার ধারণা, মাথায় ছিট।'

'ছিট?' ফিসফিস করেই বলল রবিন।

'গত গ্রীষ্মে দুটো ছেলেকে এমন ভয় দেখানো দেখিয়েছিল, শেষমেষ ওকে বের করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন আঙ্কেল জেড। এ বছর যে আবার নেবেন ওকে, কল্পনাই করিনি।'

জবাব দিল না রবিন। আঙ্কেল জেডের দুরবস্থাটা পরিষ্কার হলো আরও। নেহায়েত বাধ্য না হলে ডবিকে ঢুকতে দিতেন না। বেশি বেতন দিয়ে ভাল স্টাফ রাখার ক্ষমতা নেই তাঁর।

খাটো, গোলগাল—হোঁৎকাই বলা চলে, একটা ছেলে নিজের পরিচয় দিল এরপর। কিন্তু এতই অস্পষ্ট ওর কথা, কিছুই বুঝতে পারল না রবিন। ডবির দিকে তাকিয়ে আছে। টেরির পাশে গিয়ে বসেছে ও। পাত্তা দিল না টেরি।

'তবে দেবে,' ভাবল রবিন, 'রতনে রতন চেনে তো। ঠিক বেছে নিয়েছে।' দুজনে মিলে কি জ্বালানটা জ্বালাবে ক্যাম্পের লোকদের ভেবে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে।

হোঁৎকা ছেলেটার পর পরিচয় দিল ল্যানি। তার শেষ হলে শুরু করল লম্বা, সুদর্শন, সোনালি চুলওয়ালা ছেলেটা।

'আমি টনি ব্রিজাক,' বলল সে। 'ইয়েলোভিল থেকে এসেছি আমি। নৌকা বাওয়া আর বন-বাদাড়ে কি করে বাস করতে হয়, শেখাব।'

'নতুন এসেছে ও,' নিচুগলায় রবিনকে বলল বব। 'বিকেলবেলা ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম। সাড়াশব্দ করল না তেমন।'

'বোধহয় লাজুক স্বভাবের।'

'হতে পারে। বাপের টাকা আছে মনে হয়। সানগ্লাসটা বোধহয় দেখনি। পোরশে সানগ্লাস। অনেক দাম। কম করে হলেও দুশো ডলার। এত দামের সানগ্লাস যে পরতে পারে, সে এখানে চাকরি করতে এল কেন, অবাক লাগছে আমার।'

'বড়লোকের ছেলে, বন-বাদাড়, খোলা অঞ্চল ভাল লাগে, আনন্দ করতে এসেছে,' মৃদু হেসে বলল রবিন। 'ভাল লাগলে থাকবে, নইলে চলে যাবে; আঙ্কেল জেডের সমস্যার কথা একটিবারও ভাববে না।'

লোকের জন্যে কতটা মরিয়া হয়ে উঠেছেন আঙ্কেল জেড, টনি তার আরেক প্রমাণ।

'আর ও রোজার,' কাটঅফ জিনস আর সবুজ রাগবি শার্ট পরা আরেকটা সুন্দর চেহারার ছেলেকে দেখাল বব।

ওর কথা শেষ না হতেই বলে উঠল ছেলেটা, 'আমি রোজার ব্যাকম্যান।' কথা বলার সময় কারও চোখের দিকে তাকাচ্ছে না সে।

'এ-ও কি লাজুক নাকি?' ববের কানে কানে জিজ্ঞেস করল রবিন।

মাথা নাড়ল বব, 'না, লাজুক না। তবে কিছু একটা হয়েছে ওর। অন্যমনস্ক থাকে। কি যেন ভাবে মনে হয়। কথাটতা বিশেষ বলল না আমার সঙ্গে।'

পরিচয়ের পালা শেষ হলো।

'দেরি হয়ে যাচ্ছে,' আঙ্কেল জেড বললেন। 'আর বেশিক্ষণ আটকে রাখব না তোমাদের। নিয়ম-কানুন সব প্রিন্টআউট পড়েই জানতে পারবে। তবু জরুরী কয়েকটা নিয়ম জানিয়ে দিই। ঠিক ন'টায় আলো নিভে যাবে ক্যাম্পারদের জন্যে, কাউন্সেলরদের সাড়ে দশটায়।'

প্রতিবাদের গোঙানি শোনা গেল দু'তিনজনের। ল্যানি তো জিজ্ঞেসই করে ফেলল, 'কিন্তু উইকএন্ড আর ছুটির দিনে কি হবে?'

'সবদিনে একই রকম,' আঙ্কেল বললেন।

'হেরফের করে দেখেছি, অসুবিধে হয়। শেষে সকালবেলা আর ঘুম থেকে উঠতে চায় না, ডিউটি যেদিন থাকে সেদিনও না।'

'অন্য ক্যাম্পের সঙ্গে তুলনা করলে এখানকার নিয়ম-কানুন খারাপ বলা যাবে না,' রবিনের দিকে কাত হয়ে ফিসফিস করে বলল বব। 'তবে ওসব জায়গায় নিয়ম মাঝেসাঝে শিথিল হয়, কিন্তু আঙ্কেলের হয় না। একেবারে মিলিটারি আইন।'

'আরেকটা কথা,' আঙ্কেল জেড বললেন, 'আমার ক্যাম্পে ডেটিং-ফেটিং চলবে না, কাউন্সেলরদের তো নয়ই, ক্যাম্পারদেরও না; খেয়াল রাখতে হবে সেদিকে। ডেটিং মানেই হাত ধরাধরি, ঢলাঢলি, নাচানাচি…। আমাকে আউটডেটেড বলো আর যা-ই বলো, ওসব আমার একদম পছন্দ না। ডেটিং করতে হলে অন্য কোথাও বেড়াতে যাওয়া উচিত, ক্যাম্পিং নয়। কারও বিরুদ্ধে ডেটিঙের অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বের করে দেয়া হবে ক্যাম্প থেকে। কোন প্রশ্ন আছে?'

'আমি নাহয় আটকে রাখলাম নিজেকে,' রসিকতা করল ডবি, 'কিন্তু কোন মেয়ে যদি যেচে-পড়ে আমার সঙ্গে ভাব করতে আসে, তখন?'

'রিপ্লির বিলিভ ইট অর নট কোম্পানিকে খবর দেবে,' ব্যঙ্গ করল ল্যানি। 'দেশে কি ছেলের আকাল পড়ল নাকি?'

হেসে উঠল সবাই।

ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল ডবি।

বেচারা! ওর জন্যে খারাপই লাগল রবিনের। দুই দুইবার রসিকতা করার চেষ্টা করেও বিফল হলো। কেউ তাকে পাত্তা দিল না।

উঠে দাঁড়ালেন আঙ্কেল জেড। কথা শেষ।

'বেশি রাত কোরো না। কাল সকাল সকাল উঠতে হবে।'

সবার দিকে তাকিয়ে একবার হেসে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি।

আঙ্কেল চলে গেলে কয়েকজন কাউন্সেলর উঠে যার যার কেবিনের দিকে রওনা হয়ে গেল। বাকিরা বসে রইল আগুনের ধারে। এত তাড়াতাড়ি ঘরে যেতে ইচ্ছে করছে না বোধহয়।

এতক্ষণ আলোচনার মধ্যে থাকায় খেয়াল করেনি, ক্লান্তিটা টের পেল এখন রবিন। সকাল সকাল শুয়ে পড়া দরকার।

বুঝতে পারল বব। 'যাবে?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'হ্যাঁ। তুমি যাবে?'

'চলো।'

উঠে দাঁড়াল দুজনে। খানিক দূরে আগুনের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে আছে রোজার। ওর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে কাশি দিল বব। মুখ তুলে তাকাল রোজার। চোখের দৃষ্টিটা কেমন প্রাণহীন।

ওর চিন্তামগ্ন ভঙ্গিটা রবিনকে দেখানোর জন্যেই কাশিটা দিয়েছিল বব। দেখা হয়ে গেলে বলল, 'চলো।'

কয়েক পা সরে এসে রবিন বলল, 'ওর এই অবস্থা কেন? চোখ দেখেছ? ভূত নাকি?'

হাসল বব, 'জলজ্যান্ত মানুষ।'

'অদ্ভুত সব চরিত্র এনে ঢুকিয়েছেন এখানে আঙ্কেল জেড!'

কথা বলতে বলতে চলেছে দুজনে। হঠাৎ নিঃশব্দে পেছন থেকে এসে রবিনের হাত খামচে ধরল ল্যানি।

চমকে গেল রবিন। ফিরে তাকাতেই হেসে বলল ল্যানি, 'বনে ঢুকবে?'

'আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'নাকি ভয় পাচ্ছ? ভয় পেলে বলো, চাপাচাপি করব না।'

রাগ লাগল রবিনের। ভীতু বললে সহ্য হয় না ওর। 'না, ভয় পাচ্ছি না। তবে প্রথম রাতেই আঙ্কেলের নিয়ম অমান্য করেছি দেখলে দুঃখ পাবেন তিনি। তাঁকে দুঃখ দিতে চাই না।'

'ঠিক আছে, যেদিন যেতে ইচ্ছে করবে, বোলো, নিয়ে যাব। পুরোটা গরমকালই পড়ে আছে। যাওয়ার অনেক সুযোগ মিলবে।'

চলে গেল ল্যানি।

আবার এগিয়ে চলল দুজনে। খানিক দূরে একটা গাছের নিচে টেরিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রবিন। ওরা পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অকারণেই হাসল, তার পিত্তি জ্বালানো খিকখিক হাসি। রবিন বুঝল, তাকে খুঁচিয়ে রাগাতে চাইছে 'শুঁটকিটা'। ফিরেও তাকাল না সেজন্যে। চুপচাপ হেঁটে চলল ববের সঙ্গে।

রেগে গিয়ে মজা পেতে দিল না টেরিকে।

সাত

হাজার পাখির কলকাকলীতে ঘুম ভাঙল রবিনের। ছ'টা বাজেনি এখনও। বাড়িতে থাকলে এত সকালে বিছানা ছাড়ে না সে, ছাড়তে ইচ্ছে করে না। কিন্তু জানালা দিয়ে এসে পড়া সোনালি রোদ আর পাইনের সুবাস বিছানায় থাকতে দিল না তাকে। নেমে পড়ল বাইরেটা কেমন উঁকি দিয়ে দেখার জন্যে। খুব তাজা আর ঝরঝরে লাগছে শরীরটা।

ঘরের আরেক প্রান্তের বাংকটায় এখনও ঘুমাচ্ছে স্টিভ। তার ঘুম না ভাঙিয়ে নিঃশব্দে বেদিং স্যুটটা বের করে পরে নিল রবিন। বড় একটা তোয়ালে কাঁধে ফেলে বেরিয়ে এল বাইরে।

পুবের বনের মাথায় ঝুলে রয়েছে যেন হালকা কুয়াশা। কেবিনের চারপাশ শিশিরে ভেজা। সুন্দর! কল্পনাতীত সুন্দর জায়গা! এ জন্যেই এর প্রেমে পড়ে গেছেন আঙ্কেল জেড।

রাস্তা ধরে খালিপায়ে লেকের দিকে হেঁটে চলল সে। পায়ের নিচে সুড়সুড়ি দিচ্ছে পাইন নীড্‌ল্‌।

তীরের কাছে পৌঁছে গেছে, এই সময় দুপদাপ শব্দ কানে এল। কেউ বোধহয় দৌড়ে আসছে এদিকেই।

ফিরে তাকাল সে। জগিং করতে করতে আসছে টনি। লাল রঙের ওয়ার্ম-আপ স্যুট পরনে। পায়ে নাইক রানিং-শূ। চোখে সেই দামী সানগ্লাস। এটার কথাই বলেছিল বোধহয় বব।

'হাই,' কাছে এসে গতি কমাল টনি। 'চমকে দিলাম নাকি তোমাকে? ভোরবেলা জগিং করা আমার অভ্যাস।'

'ভোরবেলা আমার কোন কিছু করতেই ইচ্ছে করে না,' হাই তুলল রবিন। 'আজ উঠে পড়লাম। সকালটা এত সুন্দর, মনে হলো কিছু একটা করি। সাঁতার কাটব ভাবছি।'

'চলো তাহলে বনের ভেতর যাই। এত সুন্দর সুন্দর পাখির বাসা আছে। কাল দেখে এসেছি। বাচ্চাগুলো বেশ বড় হয়েছে। ওড়ার চেষ্টা করে। দেখতে খুব ভাল লাগে।'

'তাই নাকি? দারুণ তো! ঠিক আছে, আরেকদিন যাওয়া যাবে; আজ তো তেমন সময় নেই।'

'ঠিক আছে,' এই প্রথম হাসল টনি। 'সাঁতার কাটতে যাচ্ছ তো, সাবধান, লেকটার তলা কিন্তু সমান না। পাড়ের কাছে হঠাৎ করেই গভীর হয়ে গেছে। আর যে পাড়টায় কাদা বেশি, সেদিকে নেমো না। জোঁকে ভরা।'

'জোঁক! বাপরে বাপ! ভুলেও যাব না ওদিকে।'

'সাঁতার জানলে অবশ্য গভীরতাকে ভয় নেই। তবু, বলা যায় না। চলি।' দৌড়াতে দৌড়াতে চলে গেল টনি। অন্য একটা রাস্তা ধরে ঢুকে গেল বনের মধ্যে। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল তার নাইকের শব্দ।

টনি দেখতে যেমন সুন্দর, হাসিটাও চমৎকার। কার সঙ্গে মিল? কোন্ অভিনেতা? না না, রক মিউজিকের একজন গায়ক। ভাবতে ভাবতে চলল রবিন।

'হাই, রবিন!' ধাক্কা খেয়ে যেন ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে এল সে। সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ল্যানি।

'তুমি কোনখান থেকে উদয় হলে? দেখলাম না তো!' ধীরে ধীরে কথাবার্তায় সহজ হয়ে আসছে রবিন।

'বনের ভেতর থেকে। চমকে গেছ মনে হয়?...রাস্তা দিয়ে বেরোইনি। সেজন্যে দেখোনি। রাস্তা ছেড়ে গাছপালার ভেতর দিয়ে বেরোতেই আমার ভাল লাগে। সাঁতার কাটতে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার স্যুটটা খুব সুন্দর,' দেখতে দেখতে বলল ল্যানি। 'চলো, আমিও যাই। সাঁতার কাটব না। বোটগুলো দেখব। চেক করে রাখা দরকার। ক্যাম্পাররা নৌকায় করে বেরোতে চাইতে পারে।'

'চলো। আমি তোমাকে সাহায্য করব। ক্যাম্পারদের নৌকা বাওয়া শেখানোর সময় স্টিভের সহকারী হতে হবে আমাকে।'

'ক্যানু আর দাঁড়-টানা নৌকা আছে আমাদের। তবে ক্যানুই বেশি পছন্দ করে অল্প বয়েসী ছেলেমেয়েরা। গতবার পাঁচটা নৌকা ছিল, এবার চারটে; অ্যাক্সিডেন্ট করে নষ্ট হয়ে গেছে একটা।'

লেকের দিকে মুখ করা ছোট একটা পাহাড়ের গোড়ায় বোট ডকটা। সকালের সোনালি রোদের ফালিগুলো গাছপালার ফাঁক দিয়ে বর্শার ফলার মত এসে পড়েছে পানিতে। ঝলমল করছে পানি।

'লেকটা খুব সুন্দর,' রবিন বলল। 'নাম আছে নাকি এটার?'

'ফেদার লেক। কারণটা কি জানো? প্রচুর পাখি। মাইগ্রেটরি বার্ডগুলো যাওয়ার পথে এখানে থেমে থেমে যায়। দাদার মুখে পাখির কত গল্প শুনেছি। আমার দাদা এই এলাকাতেই বড় হয়েছিল। পাখির গল্প করতে করতে তন্ময় হয়ে যেত। একবার বলেছিল...হায় হায়!' ডকের দিকে দৌড় দিল ল্যানি।

'কি হয়েছে?'

'ক্যানুগুলো কই? মাত্র তো একটা দেখতে পাচ্ছি...'

রবিনও দৌড়ে এসে দাঁড়াল তার পাশে, কাঠের তৈরি ছোট ডকটার কাছে। শেকলে বাঁধা তিনটে দাঁড়-টানা নৌকা, আর একটা ক্যানু। ক্যানুটার দশা বড় করুণ। পুরানো। জীর্ণ।

'ওই যে ক্যানুগুলো!' হাত তুলে দেখাল ল্যানি। 'ওইই যে!'

ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রবিনও দেখতে পেল, পরিষ্কার পানির নিচে তিনটে ক্যানু। বালিতে ঠেকে রয়েছে তলা। একপাশে একটা করে গোল গর্ত।

'কি করে ঘটল?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল ল্যানি। 'কিন্তু আপনাআপনি হয়নি ওই গর্ত।' গা থেকে ক্যানভাসের হাই-টপসটা খুলে নিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। কাট-অফ আর টি-শার্ট যে ভিজে গেল পরোয়াই করল না। 'এসো। হাত লাগাও আমার সঙ্গে।'

তোয়ালেটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে রবিনও ডাইভ দিয়ে পড়ল। কনকনে ঠাণ্ডা পানি। দুজনে মিলে ডুবন্ত একটা ক্যানু ঠেলে নিয়ে আসতে লাগল। টেনে তুলল ঘাসে ঢাকা ঢালু কিনারায়।

কাত করে নৌকার তলার পানি সব বের করে দিল ল্যানি। তারপর ফুটো পরীক্ষা করতে বসল।

'বাটালী দিয়ে ছেঁদা করে দিয়েছে কেউ,' গর্তের কিনারটা দেখতে দেখতে বলল সে। 'দেখো, হাত দিয়ে।'

আঙুলের মাথা লাগিয়ে ঘষে দেখল রবিন। তারপর এমন একটা জিনিস চোখে পড়ল, ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে গেল তার। ফুটোর কাছে, একটা সীটের ফাঁকে লাল রঙের একটা পালক গোঁজা। পানিতে ভিজে গেছে।

*

বাকি দুটো ক্যানু পানির নিচ থেকে তুলে আনতে আনতে বেশ বেলা হয়ে গেল। ভীষণ ভারী। রবিনের হাতের পেশী ব্যথা হয়ে গেছে। নাস্তা খেতে যাওয়ার সময় নেই আর। ক্যাম্পাররা আসা শুরু করেছে। ওদের স্বাগত জানাতে যেতে হলে তাড়াতাড়ি কেবিনে গিয়ে পোশাক বদলে দৌড় দিতে হবে।

কেবিনে ফেরার পথে ঘটনাটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে চলল সে। লাল পালকটা দেখল আবার। রেক রুমে পাওয়া পালকটার সঙ্গে মিল আছে। দুটো ঘটনা কি কাকতালীয়? নাকি ইচ্ছে করেই কেউ অঘটন ঘটিয়ে সাবধান করার জন্যে পালক রেখে যাচ্ছে?

'রবিন, কোথায় গিয়েছিলে?' কেবিনের দরজায় দেখা হয়ে গেল ববের সঙ্গে। 'স্টিভ তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। প্রথম বাসটা এসে গেছে।'

দ্রুত পোশাক পাল্টে নিল রবিন। নৌকায় পাওয়া পালকটা অন্য পালকটার সঙ্গে ড্রয়ারে রেখে দিয়ে ববের সঙ্গে দৌড় দিল। পার্কিং লটের বাঁধানো চত্বরটা ক্যাম্পার আর কাউন্সেলরে গিজগিজ করছে।

স্টিভ খুব ব্যস্ত। হাতে একটা লিস্ট। বাস থেকে নেমে আসা যাত্রীদের নাম দেখে দেখে টিক চিহ্ন দিচ্ছে। মাথা নাড়তে গেলে বিচিত্র ভঙ্গিতে ঝাঁকি খাচ্ছে তার চুলের ঝুঁটি।

'স্টিভ, আমি দুঃখিত,' রবিন বলল, 'কয়েকটা ক্যানু ডুবে গেছে। ল্যানি আর আমি তুলতে গিয়ে...'

'কৈফিয়ত শোনার সময় নেই,' রবিনের দিকে একটা তালিকা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'পাঁচ নম্বর কেবিনে ছয়টা মেয়ে আছে। ওদের নিয়ে গিয়ে ঘর দেখিয়ে দাও। ক্র্যাফটস টেন্টে মালপত্রের ডেলিভারি চেক করতে যাচ্ছি আমি।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই কেবিনে দেখা করব।'

কাগজটা হাতে নিল রবিন। মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। স্টিভ তার কথা শুনতে পর্যন্ত চাইল না। বিরক্তি নিয়ে তালিকাটার দিকে তাকাল। পার্কিং লটে ঘোরাফেরা করছে কয়েক ডজন ক্যাম্পার; ছেলে-মেয়ে, কিশোর-তরুণ–সব বয়েসের আছে। কেবিন ফাইভে কাদের কাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে কি করে জানবে?

'নাম ধরে ডাকো না, তাহলেই হয়ে যায়,' কানের কাছে শুনতে পেল পরিচিত একটা কণ্ঠ। মুখ ফিরিয়ে আঙ্কেল জেডের হাসিমুখ দেখতে পেল রবিন। সে তাকাতেই বললেন, 'চিন্তার কিছু নেই। নতুন আসা ক্যাম্পারদের কেউই প্রথমে চিনতে পারে না।'

রাগ অনেকটা কমল রবিনের। তালিকা দেখে জোরে জোরে নাম ধরে ডাকতে শুরু করল। এগিয়ে আসতে লাগল ক্যাম্পাররা। মিনিটখানেকের মধ্যেই ছয়জনকে পেয়ে গেল সে। কেবিন ফাইভে যারা উঠেছে, তাদের সবাই মেয়ে। বয়েস খুব কম। সবচেয়ে বেশি যার, তারও আট-এর বেশি হবে না। এতটাই হাসিখুশি আর উত্তেজিত হয়ে আছে মেয়েগুলো, ওদের সঙ্গে কেবিনে নিয়ে যেতে যেতে স্টিভের দুর্ব্যবহার ভুলে গেল রবিন।

তিনজোড়া বাংক শেয়ার করতে হবে ছয়জনকে। জোড়াগুলো একটা ওপরে, একটা নিচে। দুজন যমজ বোন আছে–দিনা আর রীনা। কেবিনে ঢুকেই দরজার কাছের বাংকটা নিয়ে নিল ওরা। মাঝেরটা নিল জুন আর পলিনা। কোন ঝামেলা করল না। বোঝা গেল, ওরা বান্ধবী। কিন্তু বাকি একজোড়া বাংক নিয়ে তর্কাতর্কি শুরু করল নোরা আর ডল নামে দুটো মেয়ে।

'আমি ওপরেরটায় থাকব,' ডল বলল।

'না, আমি থাকব,' বলল নোরা। 'আমার আম্মা বলে দিয়েছে, সব সময় ক্যাম্পের ওপরের বাংকে ঘুমাতে।'

'কিন্তু বাংকটা আমি আগে দেখেছি,' ব্যাগটা তাড়াতাড়ি বাংকে ছুঁড়ে দিয়ে ডল বলল, 'আমি দখল করলাম।'

'আমি তোমাদের একটা বুদ্ধি দিতে পারি,' মধ্যস্থতা করতে এল রবিন। 'দুজনেরই যখন ওপরে থাকার ইচ্ছে, বদলাবদলি করে থাকলেই পারো। এক হপ্তা একজন ওপরে থাকলে, আরেকজন নিচে। পরের হপ্তায় নিচের জন আবার ওপরে উঠে যাবে।'

'ঠিক আছে,' মেনে নিল ডল। 'তবে প্রথমবার আমি ওপরে।'

'না, আমি!' চোখ দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবে নোরা।

'এমন করছ কেন?' রবিন বলল। 'ডল তো মেনেই নিয়েছে। ব্যাগটা সে আগে রেখেছে, সেদিক থেকে আগে থাকার অধিকারটা সে-ই পেয়েছে।'

'অন্যায় করেছে,' মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে নোরার। জানালার বাইরে চোখ পড়তেই মুহূর্তে বাংক ভাগাভাগির কথা ভুলে গেল। চিৎকার করে উঠল, 'আরি, ডজবল খেলছে! আমরা খেলব না?'

'হ্যাঁ,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রবিন, 'তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও।

আমরাও খেলতে যাব।'

জুনকে বিরাট সুটকেসটা খোলায় সাহায্য করতে গেল রবিন। ছয়জনের মধ্যে জুন সবার ছোট।

স্যুটকেসটা সবে খুলেছে, বিচিত্র একটা মড়মড় শব্দ হলো তার পেছনে, তারপর বিকট শব্দে ধসে পড়ল কি যেন।

আট

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে গেল রবিন। আতঙ্কিত হয়ে দেখল, নোরা আর ডলের বাংক দুটোর ওপরেরটা খসে পড়েছে নিচেরটার ওপর। বিছানাপত্রের স্তূপের বাইরে বেরিয়ে আছে ছোট একটা সাদা হাত।

মেয়েগুলোর চিৎকার-চেঁচামেচিকে অগ্রাহ্য করে বাংকটার দিকে ছুটে গেল রবিন। তাড়াতাড়ি টেনে টেনে কম্বল, চাদর সরিয়ে ফেলল। ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'ডল, তুমি ঠিক আছ তো? ডল!'

ধসে পড়া বিছানায় চিত হয়ে থাকা মেয়েটা চোখ মেলল ধীরে ধীরে। পরক্ষণে ফোঁপাতে শুরু করল।

'আরে থামো, থামো, কাঁদার কিছু নেই,' চুপ করানোর চেষ্টা করল রবিন। 'ব্যথা তো আর পাওনি।'

গদি-বালিশ-চাদর-কম্বলের স্তূপ থেকে মেয়েটাকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে আনল সে। ফিরে তাকাল পাশে দাঁড়ানো নোরার দিকে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে ও।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'ও যে পড়ে গেল!' বিমূঢ়ের মত বলল নোরা।

'তাতে তোমার চেঁচানোর কি হলো? কি করে পড়ল?'

'আমি বাংকে গিয়ে উঠলাম,' ডল জানাল, 'সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়ল ওটা।'

'কিন্তু ভাঙল কি করে? কিছু ধরে টানাটানি করেছিলে নাকি?'

'না, টানব কেন?' আবার কাঁদতে শুরু করল নোরা। ফোঁপানি বেড়ে গেল আরও। 'তুমি মনে করেছ আমি ফেলে দিয়েছি...'

'আরে না না, তা মনে করব কেন? তোমাকে দোষ দিচ্ছি না...' হাল ছেড়ে দিল রবিন। কারণ নোরার সঙ্গে চেঁচানোয় যোগ দিয়েছে আবার ডল। এতই ঘাবড়ে গেছে মেয়ে দুটো, কিছু বলেও বোঝানো যাবে না এখন ওদের।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল কেবিনের দরজা। হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল স্টিভ। রাগে সাদা হয়ে গেছে মুখ।

'কি হলো?' চিৎকার করে উঠল সে। এগিয়ে এসে মাটিতে বসে পড়া নোরাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, 'কি হয়েছে, হনি? রবিন তোমাকে ভয় দেখিয়েছে?'

'আমি কিছু করিনি,' প্রতিবাদ করল রবিন। আবার রেগে যাচ্ছে। 'বাংকটা ধসে পড়ল। ওদের শান্ত করার চেষ্টা করছিলাম আমি।'

'এর নাম শান্ত করা?' খেঁকিয়ে উঠল স্টিভ। ঘরের চারপাশে হাত তুলে দেখাল। ছয়টা মেয়েই কান্নাকাটি করছে।

'ওরা ভয় পেয়েছে। ভয় আমরা সবাই পেয়েছি। যে রকম শব্দ হলো...'

'কি হয়েছে, স্টিভ?' দরজার কাছ থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করল একটা কণ্ঠ।

ফিরে তাকাল রবিন। টেরিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শঙ্কিত হলো। টেরির সঙ্গে আরেকটা ছেলে, সে-ও কাউন্সেলর।

'কি জানি কি হয়েছে,' ঝাঁজালো কণ্ঠে বলল স্টিভ।

'মেয়েগুলো জিনিসপত্র খোলার সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে রবিন।'

'কে বলল আমি ঘটিয়েছি!' রেগে উঠল রবিন। 'আমি কিচ্ছু করিনি। ডল বাংকে উঠতেই...'

কথা শেষ করতে পারল না রবিন। বাধা দিল আঙ্কেল জেডের গমগমে কণ্ঠ, 'কি হচ্ছে এখানে? এত হট্টগোল! রেক রুম থেকে শোনা যাচ্ছে।'

'একটা বাংক ধসে পড়েছে,' স্টিভ জানাল।

'ধসে পড়েছে? কি করে?'

'জানি না। কোন্ একটা মেয়ে বোধহয় উঠেছিল ওখানে।'

'ওঠার জন্যেই তো বাংক। তাতে ধসে পড়বে নাকি?' ঘরে ঢুকে বাংকটা পরীক্ষা করলেন আঙ্কেল জেড। 'ব্যাপারটাই তো বুঝতে পারছি না!' দেখেটেখে সোজা হলেন তিনি। হাতের ময়লা মুছলেন খাকি পাজামায়। 'ঠিক আছে, মিস্ত্রিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, মেরামত করে দিয়ে যাবে। চেক করে যাবে বাকি বিছানাগুলোও। এত তাড়াতাড়ি যে সামাল দিতে পেরেছ, সেজন্যে ধন্যবাদ, স্টিভ।'

গটমট করে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলেন আঙ্কেল।

হতবাক হয়ে গেছে রবিন। কিছুই করেনি স্টিভ, পরিস্থিতিটাকে আরও ঘোরাল করা ছাড়া। অথচ তাকেই ধন্যবাদ দিয়ে গেলেন আঙ্কেল জেড।

'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন?' কর্কশ স্বরে ধমকে উঠল স্টিভ। 'সামলাও না মেয়েগুলোকে! ওদের সাহায্য করার জন্যেই রাখা হয়েছে তোমাকে।'

কান গরম হয়ে যাচ্ছে রবিনের। নিজেকে কি ভেবেছে স্টিভ? কিন্তু সহ্য করে নিয়ে নোরাকে শান্ত করতে গেল। এখনও কাঁদছে মেয়েটা। চোখের কোণ দিয়ে ঘরে ঢুকতে দেখল টেরিকে। অদ্ভুত হাসি তার মুখে।

ছোট্ট মেয়েটাকে কোলে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিতে লাগল রবিন। 'কাঁদে না, লক্ষ্মী-সোনা। কিছু তো হয়নি। কাঁদছ কেন?' ধসে পড়া বাংকের পাশের বাংকটায় নোরাকে বসিয়ে দিল সে। তার পাশে বসে আদর করে চলল। কিন্তু শান্ত আর হতে চায় না নোরা।

তবে শেষ পর্যন্ত থামল। থেকে থেকে কয়েকটা হেঁচকি দিয়ে বন্ধ হলো ফোঁপানি। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন রবিনের। বাংকটা পড়ল কিভাবে দেখতে

গেল।

যে কাঠের ফালিগুলোর ওপরে বসানো ছিল বাংকটা, সেগুলো ভেঙে গেছে। ভাঙা চোখা ফালিতে খোঁচা লাগতে পারে ভেবে খুলে আনার জন্যে সেটা ধরে টান দিতে গেল সে। কি যেন লাগল আঙুলে। নিচু হয়ে দেখতে গিয়েই স্থির হয়ে গেল। লাল একটা পালক টেপ দিয়ে আটকানো। আরও একটা জিনিস আবিষ্কার করল। ফালিটা যেখান থেকে ভেঙেছে, সেখানে করাতের দাঁতের দাগ। কাটা হয়েছে।

তাকিয়ে রইল হাঁ করে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ক্যাম্পিঙের মাত্র প্রথম দিন, সকালটাই শেষ হয়নি এখনও, এর মাঝেই দুই দুইটা অঘটন! কাটবে কি করে মৌসুমটা? এরপর কি ঘটবে?

লম্বা দম টেনে নিজেকে শান্ত করতে চাইল সে। তারপর মেয়েগুলোর দিকে মন দিল। জিনিসপত্র গোছানোয় ওদের সাহায্য করতে লাগল।

মেইন ইয়ার্ডে টনি আর আরেকজন কাউন্সেলর ক্যাম্পারদের খেলার ব্যবস্থা করেছে।

নিজের ক্যাম্পারদের নিয়ে রবিনও বেরিয়ে এল ওদের সঙ্গে যোগ দিতে। কিন্তু কোন কিছুতেই মন বসাতে পারল না, মন জুড়ে রয়েছে লাল পালক।

মোট তিনটে হলো।

একটাই মানে এর : স্যাবোটাজ করে ক্যাম্পটাকে তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেউ।

কিন্তু পালক রেখে গিয়ে কি বোঝাতে চায়?

'আমার মেয়েগুলোকে দেখো একটু, প্লীজ। আমি একটা কাজে যাচ্ছি,' টনিকে বলল রবিন। 'কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, বলবে আঙ্কেল জেডের অফিসে গেছি।'

'আচ্ছা,' হেসে ঘাড় কাত করল টনি।

আঙ্কেল জেডের অফিসের দরজায় এসে দাঁড়াল রবিন। দুরুদুরু করছে বুক। দরজায় টোকা দিল। ভেতর থেকে সাড়া এল, 'এসো।'

আস্তে পাল্লাটা ঠেলে খুলে ভেতরে ঢুকল রবিন।

পুরানো, মলিন কাঠের ডেস্কটায় কুঁজো হয়ে বসে আছেন আঙ্কেল জেড। মুখ তুলে রবিনকে দেখে উদ্বেগের ভাঁজ পড়ল কপালে। মুহূর্ত পরেই পরিচিত, আন্তরিক হাসিটা ফিরে এল মুখে। 'আরে, প্রি···রবিন! তোমার সঙ্গে বসে কথা বলতে ইচ্ছে করছে খুব, কিন্তু এই জমা-খরচের হিসেবটা শেষ করতে হবে। তারপর রয়েছে বাংকটা আর ক্যানুগুলো মেরামত করানো···'

'ওগুলোর ব্যাপারেই আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি,' রবিন বলল। 'আঙ্কেল জেড, আমার ধারণা···'

'সরি, রবিন, এখন কোন কিছু নিয়ে আলোচনার সময় নেই।'

'কিন্তু খুব জরুরী!'

'সে তো বটেই।' গলা শুনেই বোঝা যায়, রবিনের কথাকে আমল দিচ্ছেন না আঙ্কেল। 'সবই জরুরী। কোন কিছুতেই আমার নজর না দিলে চলবে না।

তবে আগের কাজ আগে।'

'কিন্তু...'

'সরি!' হাসিটা চলে গেল আঙ্কেলের মুখ থেকে। 'সময় করে তোমার সঙ্গে কথা বলব। যাওয়ার সময় দরজাটা টেনে দিয়ে যেয়ো।'

হতাশ হয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল রবিন। ক্যাম্পিং মাত্র শুরু হয়েছে। এখনই যদি সময় না পান, তাহলে আর কোনকালে পাবেন? কি করে তাঁকে সাবধান করবে সে?

ঘড়ি দেখল। লাঞ্চের সময় প্রায় হয়ে গেছে। পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। মনে পড়ল, সকাল বেলা নাস্তা করেনি। মেসের হল থেকে খাবারের সুগন্ধ আসছে। বড় বিল্ডিংটার দিকে তাড়াহুড়ো করে এগোনোর সময় দেখল, একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে স্টিভ। একা।

পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কাছাকাছি হলো রবিন। মুখে হাসি টেনে বলল, 'হাই।'

'হাই,' দায়সারা জবাব দিল স্টিভ। মুখে হাসি নেই। কালো চোখে সতর্কতা। অস্থির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। ঝাঁকি খেল ঝুঁটিটা। নাড়া লেগে দুলে উঠল পেঁচা-লকেট।

ভারী দম নিল রবিন। 'সকালে যা ঘটেছে, তার জন্যে দুঃখিত। কাউন্সেলরের কাজ তো আর করিনি কখনও, অভিজ্ঞতা নেই। সেজন্যেই এ রকম হয়েছে। খুব তাড়াতাড়িই শিখে নেব।'

'শিখতে পারলেই ভাল,' নিরাসক্ত জবাব দিল স্টিভ।

'তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, তাতে আমার কাজ করতে সুবিধে হবে।' এক মুহূর্ত দ্বিধা করল রবিন। স্টিভ যখন কোন সাড়া দিল না, নিজেকে যতটা সম্ভব শান্ত রেখে বলল রবিন, 'সবার সামনে ধমকাধমকি শুরু করলে, ভাল লাগেনি আমার। এ সব সহ্য করার অভ্যাস নেই তো। দয়া করে সবার সামনে এ ভাবে আর অপমান কোরো না। যদি কিছু বলার থাকে, গোপনে বোলো, প্লীজ।'

শূন্য দৃষ্টিতে রবিনের দিকে তাকিয়ে আছে স্টিভ। মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। তারপর পরিষ্কার হয়ে গেল ভঙ্গিটা। রাগ ফুটল চেহারায়।

'তারমানে,' বলল সে, 'জরুরী অবস্থাটাও বুঝতে চাইবে না তুমি? আমাকে কিছু বলতে দেবে না?'

'আমি কিন্তু সেকথা বলিনি।'

'তোমার সঙ্গে সকাল বেলা ওভাবে কথা না বলে উপায় ছিল না,' স্টিভের কণ্ঠস্বর চড়তে আরম্ভ করেছে। 'পাঁচটা মিনিট মাত্র মেয়েগুলোর দায়িত্বে ছিলে, ঘটিয়ে ফেললে অঘটন। আমি গিয়ে না ঢুকলে এখনও হয়তো মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকতে...'

'কি বলছ...'

'ঠিকই বলছি!' প্রায় চিৎকার করে উঠল স্টিভ। 'তুমি যা-ই বলো না কেন, আমার দায়িত্ব থেকে আমি নড়ছি না। আমার দায়িত্ব হলো, ক্যাম্পারদের দেখে

রাখা। আঙ্কেল জেডের ভাগ্নে বলে তোমাকে খাতির করব ভেবো না।'

শক্ত হয়ে গেল রবিন। ও, এটাই তাহলে দুর্ব্যবহারের কারণ। স্টিভ ধরেই নিয়েছে, মামার ক্যাম্প বলে বাড়তি সুবিধে আর খাতির আদায় করতে চাইছে রবিন। জবাব দেয়ার জন্যে মুখ খুলেও বন্ধ করে ফেলল। লাভ হবে না। কিন্তু আঙ্কেল জেড যে তার মামা, স্টিভ জানল কি করে?

অযথা তর্ক না করে মেস হলে যাওয়ার জন্যে ঘুরল রবিন। টেরিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। কখন এসে দাঁড়িয়েছে কে জানে। চুপচাপ ওদের কথা শুনছিল।

টেরিই বলেছে স্টিভকে, বুঝে ফেলল রবিন। আঙ্কেল জেড যে তার মামা, টেরি জানে। তাকে ঝামেলা আর অস্বস্তিতে ফেলার সুযোগটা ছাড়েনি।

রবিনকে একটা পিত্তি জ্বালানো হাসি ছুঁড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল টেরি। এগিয়ে গেল দরজার দিকে। ওর পেছন পেছন মেস হলে ঢুকল রবিন। খিদেটা নষ্ট হয়ে গেছে হঠাৎ। খাবারের জন্যে লাইনে দাঁড়িয়েছে, পাশ থেকে এসে কনুই চেপে ধরল বব, 'রবিন, কি হয়েছে? তোমাকে এ রকম লাগছে কেন?'

'হয়েছে অনেক কিছুই,' রবিন বলল। 'এখানে বলতে চাই না।'

'শোনো, একটা কথা জানতে পারলাম। আমার ধারণা, তাতে তোমার অনেক প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে। রাতে ক্যাম্পাররা শুয়ে পড়লে লেকের পারে দেখা কোরো।'

'আচ্ছা।' কি জিনিস জেনেছে বব, কি বলতে চায়, সেটা নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে কাজ করতে পারবে না। মাথা থেকে চিন্তাটা দূর করে দিল রবিন। ট্রেতে স্পিনিজ স্যালাড আর একটা টার্কি স্যান্ডউইচ তুলে নিয়ে চলে এল কেবিন ফাইভের মেয়েগুলো যেখানে বসেছে সেখানে। স্টিভের মুখোমুখি বসল। তার দিকে মুখ তুলেও তাকাল না স্টিভ। চেনেই না যেন।

তবে মেয়েগুলোর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মেজাজ ভাল হয়ে গেল রবিনের। সবাই একসঙ্গে কথা শুরু করেছে। বল খেলে কিভাবে সময় কাটিয়েছে, কত আনন্দ পেয়েছে, রবিনকে জানাতে লাগল।

নোরা বলল, 'আমাদের দল থেকে মেলিনা পেয়েছে তিন পয়েন্ট।'

'তাই নাকি? সাংঘাতিক তো,' রবিন বলল। 'পরের বার তোমরা যখন খেলতে নামবে, অবশ্যই সামনে থাকব আমি।'

'লাঞ্চের পর সাঁতার কাটতে যাব আমরা,' ঘোষণা করে কফি আনতে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল স্টিভ। 'কাজেই, খেতে খেতে পেট ভরে ফেলো না।'

'না না, পেট ভরব না,' নোরা বলল।

'বেশি ভারী হলে ডুবে যাব, তাই না?'

হেসে ফেলল রবিন। বাচ্চাদের সঙ্গে থাকলে বেশিক্ষণ মন খারাপ করে কিংবা গম্ভীর থাকা যায় না। খিদেটা ফিরে এল। স্যান্ডউইচে কামড় বসাতে যাবে, এই সময় রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে ঢুকল ডবি। আতঙ্কিত চিৎকার শুরু করল, 'বাঁচাও! বাঁচাও!'

ওর বাহুতে পেঁচানো সবুজ রঙের একটা সাপ।

মুহূর্তে যেন বিস্ফোরণ ঘটল মেস হলে। নরক গুলজার শুরু হয়ে গেল। চেয়ার টানাটানি, উল্টে ফেলা, ক্যাম্পারদের ভয়ার্ত চিৎকার-চেঁচামেচিতে ঢাকা পড়ে গেল ডবির কণ্ঠ।

'আমাকে বাঁচাও!' সব হট্টগোলকে ছাপিয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল ডবি। হাত থেকে খোলার চেষ্টা করছে সাপটাকে।

'কেউ আসছ না কেন?'

কেবিন ফাইভের টেবিলের কাছে চলে এসেছে সে। টান দিয়ে খুলে ফেলল সাপটাকে। ছুঁড়ে দিল টেবিলের ওপর।

নয়

ভোঁতা মাথা, ভয়ানক চেহারার সাপটার দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। নড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।

চারপাশে হই-চই, হট্টগোল, চেঁচামেচি। আতঙ্কিত ক্যাম্পারদের ছোটাছুটি। টেবিলের কাছ থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে মেয়েগুলো।

কিছু একটা করো, রবিন! নিজেকে ধমক দিল সে।

কিন্তু হাত নড়ল না তার। সাপটাকে ধরার জন্যে এগোল না। সাপকে ঘৃণা করে সে। বিষাক্ত হলে তো কথাই নেই।

সাহায্য করতে এগিয়ে এল বব। লেজ ধরে টান দিয়ে তুলে ফেলল সাপটাকে। জানালার বাইরে ছুঁড়ে দিতে গিয়ে থেমে গেল।

রবারের সাপ। এতই জীবন্ত, ধরার আগে বোঝাই যায়নি আসল নয়।

ডবির হাসি শোনা গেল। তার সঙ্গে গলা মেলাল আরও কয়েকটা ছেলে। টেরিও আছে ওদের দলে।

কেবিন ফাইভের বাচ্চা মেয়েগুলোর প্রায় সবাই কাঁদতে শুরু করেছে।

টেবিলের কাছে ফিরে এল স্টিভ। 'রবিন, দোহাই তোমার, ওরকম পাথর হয়ে থেকো না! কিছু একটা করো! দেখছ না, ওরা কাঁদছে?'

নড়ে উঠল রবিন। তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল বব। দুজনে মিলে মেয়েগুলোকে শান্ত করার চেষ্টা চালাল।

'তুমি তোমার নিজের কাজে যাও,' কড়া গলায় ববকে বলল স্টিভ।

যাওয়ার আগে রবিনের কানে কানে বলল বব, 'আজ রাতে, লেকের পাড়ে, মনে থাকে যেন।'

বাঁকা চোখে রবিনের দিকে তাকাল স্টিভ, 'একটা সাধারণ রবারের সাপ...'

'সরি, স্টিভ। এমনিতেই সাপ পছন্দ করি না আমি। তার ওপর শুনেছি এখানে নাকি বিষাক্ত সাপের ছড়াছড়ি...'

'তাহলে এখনও বসে আছ কেন এখানে?'

অতি স্বাভাবিক প্রশ্ন। মনে মনে রবিনও নিজেকে প্রশ্নটা করল, বসে আছি কেন?

*

শুরুতে বেশ কিছু গোলমাল হলেও ভালই কাটল বাকি দিনটা। ক্যাম্পাররা এতই আনন্দ পেল, নিজের সমস্যার কথা ভুলে গেল রবিন।

সকাল সকাল শুতে গেল স্টিভ। নাক ডাকতে লাগল মৃদু শব্দে। পা টিপে টিপে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল রবিন। রাতের নীরবতাকে ঝালাপালা করছে লক্ষ ঝিঁঝির ডাক। আকাশে এত বেশি তারা, আর এত উজ্জ্বল, বেশ একটা আলোর আভা তৈরি হয়েছে নিচের পৃথিবীতে।

ভয় ভয় লাগছে রবিনের। রোমাঞ্চিতও হচ্ছে। বাদুড়টার কথা মনে পড়ল। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল, কোন বাদুড় উড়ছে কিনা। নেই।

লেকের দিকে এগিয়ে চলল সে। পথেই অপেক্ষা করছিল বব। দেখা হয়ে গেল।

'চাকরির শুরুটা মোটেও ভাল হয়নি তোমার,' সহানুভূতির সঙ্গে বলল বব।

'এরচেয়েও খারাপ হতে পারত,' রবিন বলল।

'যাই হোক, যে জন্যে ডেকেছি। আজ সকালে যে কথাটা জানতে পেরেছি, সেটা হলো টেরি আর স্টিভের আগে থেকেই বন্ধুত্ব আছে। কোথায় কোন এক স্কুলে নাকি পড়তে পাঠিয়েছিল টেরির বাবা, সেখানে দুজনের পরিচয়।'

এই কথা। হতাশ হলো রবিন। সে ভেবেছিল, না জানি কি মূল্যবান তথ্য দিয়ে ফেলবে বব। 'পরিচয়ের কথাটা জানি না, তবে দুজনের যে বন্ধুত্ব আছে, সেটা আঁচ করে ফেলেছি। স্টিভ কেন দেখতে পারে না আমাকে, সেটাও জেনে গেছি। শুঁটকি টেরিটা নিশ্চয় কানকথা লাগিয়ে লাগিয়ে আমার প্রতি মন বিষিয়ে তুলেছে ওর।'

'তা-ই হবে। সাপটা নিয়ে তোমাকে যে রকম ধমকাধমকি করল স্টিভ, মোটেও ভাল লাগেনি আমার; বেশি বেশি মাতব্বরি। অথচ পরিষ্কার দেখেছি, আর সবার চেয়ে কম ভয় পায়নি সে নিজেও।'

'একটা কথা বুঝতে পারছি না, সাপটা আমার টেবিলে ছুঁড়ে দিল কেন ডবি?'

'সে-ও হয়তো টেরির দলে যোগ দিয়েছে।'

হাঁটতে হাঁটতে লেকের কিনারে চলে এল দুজনে। ডকের কিনারে পানির ওপর পা ঝুলিয়ে বসল বব। তার পাশে একটা কাঠের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসল রবিন। চাঁদের দিকে তাকাল। লেকের পানিকে রূপালী করে তুলেছে। চিকচিক করছে ছোট ছোট ঢেউগুলো।

'শুধু স্টিভ না, ল্যানির সঙ্গেও টেরির খাতির আছে।'

'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি খাতিরটা হলো কি করে?'

'তাড়াতাড়ি কোথায়? গত বছর এখানে কাজ করে গেছে টেরি, তুমি

জানো না?'

'ও, তা-ই বল। শয়তানি শিখিয়ে গেছে আগেই।'

শয়তানি করে হাড় জ্বালানোর জন্যে এক টেরিই যথেষ্ট, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে আরও এতজন; কি করে টিকবে এখানে, চিন্তায় পড়ে গেল রবিন।

দূরে ডেকে উঠল কিসে যেন।

'কিসের ডাক? নেকড়ে আছে নাকি?'

'মনে হয়। শুনেছি, নেকড়ে, কায়োট, এ সব প্রাণী চাঁদ উঠলে ডাকাডাকি করে। কুত্তাও হতে পারে ওটা। শোনো, যে রকম হেনস্থা হয়েছ একদিনেই, সহ্য করতে পারবে কিনা ভেবে দেখো। কোথাও এত বেশি শত্রুতা থাকলে কাজ করা যায় না। ভাল না লাগলে এ সব বাদছাদ দিয়ে বাড়ি চলে যাও। কেন তুমি চলে গেছ, আঙ্কেল জেড বুঝতে পারবেন।'

'সমস্যা তো সেইটাই, বুঝবেন কিনা! যদিও বোঝেন, তাঁকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়া উচিত হবে না আমার। বিশেষ করে এ মুহূর্তে, যখন ক্যাম্প বন্ধ করে দেয়ার পাঁয়তারা চলছে।'

'কি বলছ?' বুঝতে পারল না বব।

'রেক রূমে লাল পালকটা পেয়েছিলাম, মনে আছে?'

মাথা ঝাঁকাল বব।

'আজকে আরও দুটো পেয়েছি। একটা ক্যানুর সীটের ফাঁকে গোঁজা, আরেকটা পাঁচ নম্বর কেবিনের ভেঙে পড়া বাংকের নিচে টেপ দিয়ে আটকানো।'

'অ।'

'এই পালকই প্রমাণ করে, তিনটে শয়তানি একই লোকের কাজ।'

'কিন্তু কে করবে শয়তানি?' দাঁত দিয়ে নখ কাটছে বব। নিরাসক্ত কণ্ঠ। 'কেন করবে?' বোঝা যাচ্ছে, রবিনের গোয়েন্দাগিরিতে আগ্রহ নেই ববের। একা একা আসতে ভাল লাগত না বোধহয়, সেজন্যেই ডেকে এনেছে ওকে।

'তা জানি না,' রবিন বলল, 'আমাকে ভাগানোর জন্যেও হতে পারে। তবে মনে হচ্ছে, ভাগানো ছাড়াও আরও ব্যাপার আছে। আঙ্কেলকে বলতে গিয়েছিলাম, শুনলেন না।'

'তাই?'

'আমার বকবকানি শুনতে তোমার ভাল লাগছে না, তাই না?'

এড়িয়ে গেল বব। হাত তুলে বলল, 'দেখো, কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে।'

হাই তুলল রবিন। 'আমার ঘুম পাচ্ছে। চলো, উঠি।'

'এত তাড়াতাড়ি? আরেকটু বসি না। জ্যোৎস্না দেখি। ঘরে যেতে ইচ্ছে করছে না আমার।'

'না, ভাই। এত ক্লান্তি নিয়ে জ্যোৎস্না দেখা যায় না।'

'হুঁ, খামাখাই ডেকে আনলাম তোমাকে। ঠিক আছে, বেশি ঘুম পেলে তুমি চলে যাও। আমি বসি।'

দ্বিধা করে উঠে দাঁড়াল রবিন। 'ও-কে। থ্যাংকস। স্টিভ আর টেরির

দোস্তির কথাটা জানানোর জন্যে।'

ডেক থেকে নেমে এল সে। রাস্তা ধরে এগোল কেবিনের দিকে। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বাতাস। একটা পেঁচা ডাকল। আঙ্কেল জেডের মত সে-ও জায়গাটার প্রেমে পড়ে যাচ্ছে।

বনের কিনার ধরে এগোচ্ছে। পেছনে খসখস শব্দ হলো।

পাতার ঘষা। নিজেকে বোঝাল সে। পরক্ষণে মনে পড়ল, গাছপালার মধ্যে দিয়ে বাদুড় ওড়ার সময় ডানায় পাতার ঘষা লাগে। চলার গতি বাড়িয়ে দিল সে।

আবার হলো শব্দ। তারপর আবার।

বাদুড় নয়। পায়ের শব্দ।

জোরাল হলো হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। তবে হাঁটার গতি কমে গেল তার। কে আসছে দেখার কৌতূহল হচ্ছে।

কে?

ফিরে তাকাল সে। কেউ নেই। শুধু গাছের ছায়া।

কল্পনা করছি, বলল নিজেকে।

দাঁড়িয়ে গেল।

পায়ের শব্দও থেমে গেল।

তবে আবার শোনা গেল। জোরে। আরও জোরে। দৌড়ে আসছে।

রাতের বেলা এ সময় বনে ঢুকল কে?

দশ

বনের দিকে তাকিয়ে চুপ করে আছে রবিন।

শোনা গেল একটা কণ্ঠ, একটা মেয়ের, 'এদিক দিয়ে।'

তারপর আরেকটা কণ্ঠ, 'জলদি করো, অ্যানি! আঙ্কেল জেড কি বলেছেন শোনোনি? ন'টার সময় বাতি নিভিয়ে দেয়া হবে।'

হাঁপ ছাড়ল রবিন।

দুজনেই ক্যাম্পার। রবিনের সমান বয়েসী। বনে ঘুরতে বেরিয়ে দেরি করে ফেলেছে। কেবিনে যাওয়ার জন্যে দৌড়াচ্ছে। সোনালি চুলওয়ালা সুন্দর মেয়েটার নাম মলি গেটস। আর অন্যজনের নাম অ্যানি কি যেন।

অন্ধকারে মুচকি হাসল রবিন। রাস্তা থেকে নেমে বনে ঢুকল। মেয়ে দুটোকে চমকে দিয়ে বলল, 'বনে থাকার সময় নয় এটা, তাই না?'

'কিন্তু আমরা তো কিছু করছি না,' কৈফিয়তের সুরে বলল অ্যানি।

'কেবিনেই তো ফিরে যাচ্ছি।'

'তোমাদের কেবিন কোনটা?'

'এগারো নম্বর,' জবাব দিল সোনালি চুলওয়ালা মেয়েটা, মলি, 'মেইন

বিল্ডিঙের উল্টো দিকে।'

'চলো, এগিয়ে দিয়ে আসি।'

দুজনের সঙ্গে সঙ্গে চলল রবিন, কেবিনেই ঢোকে কিনা ওরা, দেখে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে। মেইন বিল্ডিঙের কাছাকাছি আসতে রাস্তার একধারে আলো দেখা গেল। আলোটা ঘুরে এসে পড়ল একেবারে তার চোখে।

'হাই, রবিন,' ল্যানির কণ্ঠ।

'হাই।' অস্বস্তি বোধ করছে রবিন। 'এত রাতে কি করছ এখানে?'

'যদি বলি তোমাকে সার্চ করার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি,' হাসল ল্যানি।

'করলে আর কি হবে। অবৈধ কিছু পাবে না।'

'তোমাকেই পাওয়ার দরকার ছিল। সারা দিনই কথা বলার সুযোগ খুঁজেছি। ক্যানুগুলো তুলতে আমাকে সাহায্য করার জন্যে একটা ধন্যবাদ পাওনা হয়ে আছে তোমার।'

'দিয়ে ফেলো।'

'থ্যাংক ইউ,' হাসল ল্যানি, 'এই যে, দিলাম।'

একটা মুহূর্ত কোন কথা খুঁজে পেল না রবিন। কিছু বলতে চায় নাকি ল্যানি?

'চলো না, হাঁটি,' ল্যানি বলল। 'এত তাড়াতাড়ি শুতে ইচ্ছে করছে না।'

'তাড়াতাড়ি কই? রাত তো অনেক।'

'কি সুন্দর জ্যোৎস্না। বনের মধ্যে এখনই তো হাঁটতে মজা। আধো আলো আধো অন্ধকার। যা দারুণ লাগে না দেখতে।'

'সবাই তো দেখা যাচ্ছে প্রকৃতি প্রেমিক। টনি, বব, ল্যানি। কেউ দেখে পাখি, কেউ লেক, কেউ বন; আমিই শুধু আলাদা,' ভাবল রবিন। বলল, 'কিন্তু আমার এখন যেতে ইচ্ছে করছে না, ল্যানি। বড্ড ঘুম পাচ্ছে। শরীরটাও টায়ার্ড। তা ছাড়া এদেরকে কেবিনে দিয়ে আসতে হবে,' মেয়ে দুটোকে দেখাল রবিন।

দ্বিধা করল ল্যানি। রবিন রাজি না হওয়ায় মনে মনে আহতই হলো যেন খানিকটা। কিছু বলতে গিয়েও বলল না। ঘুরে দাঁড়াল। চলে গেল বনের দিকে।

ওর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মেয়ে দুটোকে নিয়ে আবার এগোল রবিন। ওদেরকে ওদের কেবিনে পৌঁছে দিয়ে নিজের কেবিনে রওনা হলো।

স্নায়ুগুলো টান টান হয়ে আছে। বনের ভেতর মেয়ে দুটোর পায়ের শব্দ, তারপর আচমকা মুখে এসে পড়া ল্যানির টর্চের আলো এর জন্যে দায়ী। শিথিল করার চেষ্টা করল সে। ঝিঁঝির ডাক শুনল। পেঁচার ডাকের আশায় কান পাতল। কিন্তু কাজ আর হচ্ছে না। হাজারটা প্রশ্ন আবার জট পাকিয়ে উঠছে মনের মধ্যে।

বুঝতে পারল, না ঘুমালে এই অবস্থার হাত থেকে নিস্তার নেই।

দ্রুতপায়ে হাঁটতে হাঁটতে আচমকা আবার থেমে দাঁড়াল সে। কিসের শব্দ? ঠিক শুনছে তো? নাকি তার কল্পনা? মনে হচ্ছে কে যেন চোরের মত বেরিয়ে

আসছে কেবিন ফাইভ থেকে।

কালো পোশাক পরা কেউ। ছায়ার মত নিঃশব্দ।

চোখ মিটমিট করল। তাকাল ভাল করে। হারিয়ে গেছে মূর্তিটা।

নাহ্, ভুল। আমার চোখের ভুল। মূর্তি থাকলে কই, কোথায় গেল? ভাবল সে। কেবিনের আশেপাশে কেবল ওকের ছায়া।

পুরোটাই আমার কল্পনা!

সত্যি কল্পনা?

সন্তুষ্ট হতে পারছে না। দাঁড়িয়ে গিয়ে চোখ বোলাল চারপাশে। কারও সাড়া নেই। কাউকে দেখা গেল না। কেবিনের সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, একমাত্র সে ছাড়া।

কাঁধের ওপর টোকা পড়ল।

চমকে গেল সে।

'সরি,' কানের কাছে বলে উঠল একটা মোলায়েম কণ্ঠ, 'চমকে যাবে ভাবিনি।'

টনি। ওর সোনালি চুল চাঁদের আলোয় ফ্যাকাসে লাগছে।

'ও, টনি!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। 'হাঁটতে বেরিয়েছ বুঝি?'

'হ্যাঁ। শোবার আগে সব সময় একটু হাঁটাহাঁটি করে নিই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছিলে?'

'মনে হলো, কেবিন থেকে কে যেন বেরোল।'

'তোমার কেবিন!'

'হ্যাঁ। কাউকে দেখেছ?'

'না।'

'ভুল দেখোনি তো?'

'কি জানি, দেখতেও পারি। চোখে ঘুম তো। সারাটা দিন বড় পরিশ্রম গেছে।'

'হ্যাঁ,' সহানুভূতির সুরে বলল টনি, 'তোমার জন্যে অনেক বেশি। নতুন তো। তবে ঠিক হয়ে যাবে।' একটু থেমে বলল, 'স্টিভ খুব খারাপ ব্যবহার করেছে তোমার সঙ্গে। এতটা উচিত হয়নি।'

'আমি কিছু মনে করিনি।'

'এ ভাবে যদি মনে না করতে থাকো, প্রতিবাদ না করো, স্পর্ধা পেয়ে যাবে সে, আরও বেশি করবে,' ঝাঁজাল হয়ে উঠল টনির কণ্ঠ। 'নিজেকে পারফেকশনিস্ট ভাবে। তুমি যে তোমার সাধ্যমত করছ, এটা যেন তার চোখে পড়ে না।'

'ও নিজেও তো খুব ব্যস্ত থাকে, আমাদের চেয়ে বেশি; এত চাপের মধ্যে থাকলে মেজাজ একটু হবেই।'

'তার মেজাজ তার কাছে। এত মেজাজ নিয়ে চাকরি করা কেন...'

'তুমি কি এখানে নতুন নাকি?' প্রসঙ্গটা চাপা দেয়ার জন্যে বলল রবিন। 'এ বছরই এলে?'

'হ্যাঁ।'

'আমিও নতুন।'

'তবে কাউন্সেলর হিসেবে নতুন নই,' টনি বলল। 'অন্য ক্যাম্পে কাজ করেছি। গত গ্রীষ্মে মরুভূমিতে চলে গিয়েছিলাম।'

চুপ করে রইল রবিন। আর কোন কথা নেই।

বুঝল সেটা টনি। বলল, 'তোমার দেরি করিয়ে দিলাম। চোখে ঘুম নিয়ে কথা বলতে ভাল লাগছে না নিশ্চয়। ঠিক আছে, চলি। কাল দেখা হবে।'

ঘুরে উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করল টনি।

ভাল লাগল রবিনের। বব আর ল্যানির মত সঙ্গ দেয়ার জন্যে চাপাচাপি করল না বলে।

নিজের কেবিনে ঢুকল রবিন পা টিপে টিপে, যাতে অন্যদের ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে।

নিঃশব্দে জামা-কাপড় ছাড়ল। তারপর শুয়ে পড়ল বিছানায়। বালিশটা টেনে এনে ঠিকমত মাথার নিচে দিতে গেল। হাত ঢুকে গেল তলায়।

মসৃণ, নরম কি যেন লাগল আঙুলে। নড়ে উঠল মনে হলো।

ঝটকা দিয়ে হাতটা সরিয়ে এনে লাফিয়ে উঠে বসল বিছানায়। নিজের অজান্তেই ছোট্ট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে। ওপর থেকে বালিশ সরে যেতেই কুণ্ডলী খুলতে শুরু করল সাদা-কালো আর হলুদে মেশানো সাপটা।

এগারো

তাকিয়ে আছে রবিন। বোঝার চেষ্টা করছে এই সাপটাও রবারের কিনা।

কিন্তু, না। কালো চেরা জিভটা লকলক করে বেরোতে শুরু করল।

চাদরের নিচে ঢুকে গেল সাপটা।

একটানে চাদরটা সরিয়ে ফেলল রবিন।

ঢুকেই কুণ্ডলী পাকিয়ে ফেলেছিল সাপটা। খুলতে শুরু করল আবার। আলোর নিচে খোলা জায়গায় থাকতে চাইছে না।

'কি হলো, রবিনভাই?' সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিয়েছে একটা মেয়ে।

'সাপ! সাপ!' চিৎকার করে উঠল নোরা।

'মেরে ফেলুন!' ডল বলল।

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল নোরা। 'আসছে কি করে দেখো! কামড়ে দেবে!' বাংকে উঠে দাঁড়িয়েছে সে। ভয়ে সাদা হয়ে গেছে মুখ।

'আবার কি হলো?' ওধারের বাংক থেকে ভেসে এল স্টিভের গলা। চোখ ডলতে ডলতে উঠে এল। ঘরের অন্যপাশে জেগে গেছে সবগুলো মেয়ে। ভয়ে চেঁচামেচি করছে।

'সাপ,' স্টিভকে জানাল রবিন। 'আমার বালিশের নিচে ঢুকে বসেছিল।'

'কই?' ভুরু কুঁচকাল স্টিভ। 'ও ওটা? ও তো ঢোঁড়া সাপ। ঢোঁড়া সাপকেও ভয় পাও!'

সাপটার লেজ ধরে জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে।

কাঁদতে শুরু করেছে কয়েকটা মেয়ে। ফোঁপাচ্ছে। চিৎকার করছে। গোঙাচ্ছে।

জ্বলন্ত চোখে রবিনের দিকে তাকাল স্টিভ। 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন আবার? থামাও না ওদের। একেবারে অপদার্থ।'

ঝাঁ করে উঠল রবিনের কান। কোনমতে রাগটা দমন করে মেয়েগুলোর কাছে গিয়ে ওদের শান্ত করার চেষ্টা করল। সব ক'টা বাংকের বালিশ, চাদর উল্টে দেখিয়ে দিল, সেই ফাঁকে নিজেও দেখে নিল, আর সাপ নেই।

অনেক সময় লাগল মেয়েগুলোকে শান্ত করতে। আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল রবিন। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল। রাগে আগ্নেয়গিরি হয়ে গেছে যেন মনটা। যে কোন সময় ফেটে পড়বে।

বুঝতে পারছে, আপনাআপনি বিছানায় উঠে বালিশের নিচে ঢোকেনি সাপটা। কেউ ঢুকিয়ে দিয়েছে। কে? ডবি? স্টিভ? টেরি?

একবার ঢোঁড়া সাপ রেখে গেছে, পরের বার কি সাপ? ছেলেগুলো যা শয়তান, গোখরো রেখে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

মগজ গরম হয়ে যাচ্ছে। নিজেকে ধমক লাগাল সে, মাথা ঠাণ্ডা করো, নইলে কিছু ভাবতে পারবে না।

বোঝা যাচ্ছে, ক্যাম্পটার সঙ্গে সঙ্গে তারও ক্ষতি করতে চাইছে কেউ।

কেন?

আঙ্কেল জেড হয়তো কিছু অনুমান করতে পারবেন।

কথা বলতে হবে তাঁর সঙ্গে। কিন্তু তিনি তো কোন কথাই শুনতে চান না।

এবারে শোনাতে হবে যে করেই হোক।

*

'ওদের বলুন, এক মাস আগে অর্ডার দিয়ে রেখেছি আমি, এ হপ্তায় ডেলিভারি দেয়ার জন্যে!'

অফিসের বাইরেও ভেসে এল আঙ্কেল জেডের গমগমে কণ্ঠ। 'কেন কি হয়েছে, কিচ্ছু শুনতে চাই না আমি। আমার জিনিস দরকার!' গর্জে উঠলেন তিনি। 'কালকের মধ্যে ডেলিভারি চাই আমি। না পেলে আইনের আশ্রয় নেব আমি বলে দিলাম।'

গর্জন না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করল রবিন। তারপর ভয়ে ভয়ে টোকা দিল দরজায়।

'এসো!' রবিনকে দেখে মুখের ভাব বদলে গেল তাঁর। কণ্ঠস্বর নরম করে বললেন, 'এদের নিয়ে আর পারা যায় না। ধমক না দিলে কথা শোনে না।'

'আঙ্কেল জেড,' আস্তে করে বলল রবিন. 'বুঝতে পারছি আপনি খুব ব্যস্ত,

কিন্তু কয়েকটা মিনিট সময় আমাকে দিতেই হবে। সাংঘাতিক জরুরী।'

ডেস্কে রাখা কাগজের গাদায় হাতটা নামিয়ে রেখে রবিনের দিকে তাকালেন তিনি, 'ও-কে, প্রিন্স, একটা মিনিট দিলাম তোমাকে। তাড়াতাড়ি বলে চলে যাও। হাজারটা কাজ জমে আছে। দুপুরের আগে শেষ করতে হবে।'

লম্বা দম নিল রবিন। পকেট থেকে পালক তিনটে বের করে দেখাল, 'এই দেখুন।'

'লাল পালক। তাতে কি?'

'একটা পেয়েছি আপনি যে কেবিনেটটার নিচে পড়েছিলেন, তার পেছনে। দ্বিতীয়টা ডুবে থাকা ক্যানুতে। আর তৃতীয়টা বাংকের নিচে টেপ দিয়ে আটকানো, ধসে পড়েছিল যেটা।'

'হুঁ। তো?'

'এতে প্রমাণ হয় তিনটের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। ঘটনাগুলো কেবলমাত্র নিছক দুর্ঘটনা ছিল না।'

পালকগুলোর দিকে একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন আঙ্কেল। তারপর হাসলেন। মোলায়েম কণ্ঠে বললেন, 'এতে কিছু বোঝা যায় না। দুর্ঘটনা নয় এটা তোমার মাথায় ঢুকল কি করে বুঝলাম না।'

'প্রমাণ হয়!' জোর দিয়ে বলল রবিন। 'নইলে ওসব জায়গায় পালকগুলো গেল কি করে?'

উঠে দাঁড়ালেন আঙ্কেল জেড। 'এসো, একটা জিনিস দেখাচ্ছি তোমাকে।' জানালার কাছে রবিনকে নিয়ে এলেন তিনি। পর্দার নিচে দেখালেন কয়েকটা পালক পড়ে আছে, যদিও কোনটাই লাল নয়। 'এ রকম পালক ক্যাম্পের সবখানে পাবে। পাখি আছে, তাই পালকও আছে। ক্র্যাফটস কেবিনেও পালকের ছড়াছড়ি। তিনটে কেন, একশো পালক পাওয়া গেলেও কোন কিছু প্রমাণ হবে না।'

'কিন্তু...'

'আর কোন কিন্তু নেই। দুর্ঘটনাগুলো তোমাকে একটা মানসিক চাপে ফেলে দিয়েছে। আমি জানি, কয়েকজন কাউন্সেলরও তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করছে না। কিন্তু তাই বলে তোমার কল্পনার ঘোড়াকে যথেচ্ছ ছেড়ে দেয়াটাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়।'

'আমি কিছু কল্পনা করছি না!' হঠাৎ রেগে গেল রবিন। 'আপনার জন্যে দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমার...ক্যাম্পটার জন্যে ভাবনা হচ্ছে। যদি আমার কথা ঠিক হয় তাহলে কি হবে, ভাবুন? যদি কেউ আপনাকে ধ্বংস করে দেয়ার প্ল্যান করে থাকে?'

হেসে উঠলেন আঙ্কেল জেড। নিষ্প্রাণ হাসি। 'আমার ক্যাম্পের ক্ষতি করার কোন কারণ নেই কারও। ক্ষতি যা হচ্ছে, সব আমার দুর্ভাগ্যের কারণে।'

'দুর্ভাগ্য-টুর্ভাগ্য বুঝি না। তবে যা ঘটছে, ঘটনাগুলো মোটেও দুর্ঘটনা নয়, এটুকু বলতে পারি।'

'কিন্তু আমি বলি না। ভাগ্য যতই খারাপ হোক না কেন, এক সময় না এক সময় সেটা বদলায়ই। খারাপ-ভাল মিশিয়েই চলে ভাগ্যের চাকা। আমার ধারণা, আমার সুদিন আসছে। পর পর তিনটে গরমকাল খারাপ গেছে, এবার ভাল যাবে।' সরাসরি তাকালেন রবিনের দিকে, 'একটা প্রশ্ন করি, সত্যি কি তুমি আমাকে সাহায্য করতে চাও?'

'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে ওই পালকের ভাবনা মাথা থেকে দূর করে দিয়ে কতটা ভাল কাউন্সেলর হতে পারো, সেটা দেখাও। অকারণে মেজাজ খারাপ করবে না। মনে রেখো, বাকি যে কাউন্সেলররা আছে, সবাইই আমার ভাল চায়। সুতরাং কেউ কোন ক্ষতি করবে না আমার।'

প্রতিবাদ করতে গেল রবিন। কিন্তু ফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়েছেন তিনি। বোতাম টিপতে শুরু করলেন। ইঙ্গিত পরিষ্কার–সময় শেষ হয়েছে, এবার যেতে পারো।

ঢোকার সময় যতটা ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি নিরাশ আর মেজাজ খারাপ করে অফিস থেকে বেরিয়ে এল রবিন। আঙ্কেল জেড বুঝতে না চাইলেও সে নিশ্চিত, ক্যাম্পটাকে ধ্বংস করার জন্যে বদ্ধ পরিকর হয়ে আছে কেউ। শেষ করে দিতে চায় আঙ্কেল জেডকে।

ভয়ানক বিপদে আছে ক্যাম্প গোল্ডেন ড্রীম।

আপাতত তাঁকে বোঝানোর আশা ছেড়ে দিল রবিন। চিন্তা করল, এ মুহূর্তে কিশোর হলে কি করত? জবাব: মাথা ঠাণ্ডা রাখত। চোখকান খোলা রাখত। কারও ওপর ভরসা না করে নিজে নিজে সমাধানের চেষ্টা করত।

কিশোরের কথা মনে হতেই ওকে একটা ফোন করার কথা ভাবল রবিন। সব কথা জানিয়ে ওকে চলে আসতে বলতে পারে। কিশোর এলে অনেক সাহায্য হবে।

কিন্তু সত্যিই কি হবে? কিশোরকে দেখামাত্র সতর্ক হয়ে যাবে টেরি। তার বন্ধুদের হুঁশিয়ার করে দেবে। তাতে রহস্য ভেদ করা কঠিন হয়ে যাবে আরও।

নাহ্, যা করার তাকে একাই করতে হবে। তবে, ফোন একটা করা যেতে পারে কিশোরকে, তার পরামর্শের জন্যে।

বারো

ফোনে কিশোর জানিয়ে দিল, সে আসতে পারবে না। ব্যস্ত। ওমরভাইয়ের সঙ্গে একটা জরুরী অ্যাসাইনমেন্টে বেরোনো লাগতে পারে।

একটা মূল্যবান পরামর্শ দিল, যেটা রবিনের মাথায় আসেনি। বলল, 'মাথা গরম না করে, কাউন্সেলরদের সঙ্গে ঝগড়া না বাধিয়ে তাদের সঙ্গে খাতির করো। নজর রাখো। তাদের সম্পর্কে ভাল করে খোঁজ-খবর নাও। দেখবে,

তাদের কারও অতীতের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে এই রহস্যের চাবিকাঠি।'

আর যোগাযোগ হবে কিনা জানতে চেয়েছে রবিন। যদি রকি বীচ ছেড়ে বেরিয়ে না যায়, তাহলে হতে পারে, জানিয়েছে কিশোর।

কাউন্সেলরদের ওপর নজর রাখার চমৎকার একটা সুযোগ পেয়ে গেল সেদিন বিকেলেই। গোল্ডেন ড্রীম আর পাশের আরেকটা ক্যাম্প, ওয়াইল্ড হেভেনের সঙ্গে সফটবল খেলা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছে। সমস্ত ক্যাম্পার, কাউন্সেলররা সহ গিয়ে জমায়েত হলো বিশাল এক মাঠে।

খেলা শুরু হলো। শক্তিশালী টীম নামিয়েছে ওয়াইল্ড হেভেন। তৃতীয় ইনিংসেই সাত রানে এগিয়ে গেল ওরা, পরাজয় নিশ্চিত জেনে আগ্রহ হারাতে শুরু করল গোল্ডেন ড্রীমাররা।

রবিনের নজর কাউন্সেলরদের দিকে। বিশেষ করে যাদের সঙ্গে মেলামেশা বেশি হয়েছে গত ক'দিনে।

ডবি তাদের একজন। লক্ষ করল, কাজের প্রতি মোটেও আগ্রহ নেই তার, যদিও ভঙ্গি করছে ব্যস্ততার। একটা ফার্স্ট-এইড বক্স আনতে দশ মিনিট লাগিয়ে দিল। তিন মিনিটেই নিয়ে আসতে পারত। সাত মিনিট নষ্ট করল টেরির সঙ্গে কথা বলে।

রোজার ব্যাকম্যান কঠোর পরিশ্রম করছে। একই সঙ্গে কড়া নজর রেখেছে খেলা আর ক্যাম্পারদের ওপর। প্রয়োজন ছাড়া পারতপক্ষে কথা বলছে না কারও সঙ্গে।

টনিও রোজারের মতই। কাজে ফাঁকি নেই। লাজুক স্বভাবের। রবিন ছাড়া আর কারও সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ নেই। খেলার সময়টায় একবার মাত্র স্টিভের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেছে।

টেরি হলো কোচ। প্রথম যখন জেনেছে, হাসি পেয়েছে রবিনের। তখনই বোঝা হয়ে গিয়েছিল, গোল্ডেন ড্রীম হারতে বাধ্য।

এদের মধ্যে ল্যানি অন্য রকম। পরিশ্রমী। কাজেও ফাঁকি নেই। কিন্তু কেমন অন্যমনস্ক। কোথায় যেন মন পড়ে রয়েছে তার।

খেলা শেষ হলো। বিশাল পার্থক্যে হারল গোল্ডেন ড্রীম। ওদের স্কোর মাত্র চার, আর ওয়াইল্ড হেভেনের ষোলো। তবে সেটা নিয়ে মন খারাপ করল না পরাজিত ক্যাম্পাররা। খেলায় হারজিত আছেই। কিন্তু টেরির চেহারা কালো হয়ে গেল যখন দেখল রবিন তার দিকে তাকিয়ে আছে। সরে গেল সে।

খেলেটেলে, ঘেমে গিয়ে লেকের দিকে রওনা হলো খেলোয়াড়রা। গোসল করবে। সাঁতার কাটবে। ওদের সঙ্গী হলো আরও অনেক ক্যাম্পার, যারা খেলেনি, শুধু দর্শক ছিল।

ডকের কিনারে বসে সাঁতার দেখতে দেখতে ভাবতে লাগল রবিন। কিশোরকে ফোন করার পর থেকেই কাউন্সেলরদের ওপর নজর রাখা শুরু করেছে সে। কারও আচরণেই সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েনি।

সাঁতার শেষে বাঁশি বাজল। দল বেঁধে পানি থেকে উঠে আসতে শুরু করল সাঁতারুরা।

কেবিন ফাইভের মেয়েগুলোও পানিতে নেমেছে। কিনারে থেকে দাপাদাপি করেছে। বেশি পানিতে যেতে ওদের নিষেধ করেছে রবিন। ওদেরকে উঠে আসতে দেখে তোয়ালে এগিয়ে দিল।

ল্যানি এসে দাঁড়াল পাশে। 'কেমন আছ?'

'ভাল।'

'সারাটা দিনই দেখা হয়, অথচ কথা হয় না; কেমন অদ্ভুত না?'

'হ্যাঁ।'

'তা কিছু বুঝতে পারলে?'

'মানে?'

'কিছু পেলে নাকি জিজ্ঞেস করছি। সারাটা দিনই তো দেখলাম আমার দিকে তাকিয়ে ছিলে।'

'কি বলছ বুঝতে পারছি না!' মনে মনে নিজেকে কষে কয়েকটা লাথি মারল রবিন, আরও সতর্ক হয়নি ভেবে। কেউ যে তার চেয়ে চালাক থাকতে পারে, মনেই রাখেনি। সে যে নজর রেখেছে, এটা ঠিকই ধরে ফেলেছে ল্যানি।

'থাক। যা বলতে এলাম। রাতে লেকের পারে আসবে নাকি আজ? বনে ঢুকব। একা যাওয়ার মজা নেই। একজন সঙ্গী থাকলে ভাল হয়।'

'দেখা যাক,' ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জায় ল্যানির দিকে তাকাতে পারছে না রবিন। 'যদি কালকের মত টায়ার্ড না লাগে।'

'ঠিক আছে। ক্যাম্পাররা শুয়ে পড়লে চলে এসো লেকের পাড়ে। আমি থাকব।'

*

ডকের পাড়ে আগের দিনের মত পানির ওপর পা ঝুলিয়ে বসেছে রবিন। লেকের পানিতে চাঁদের আলো চিকমিক করছে। চব্বিশ ঘণ্টায় আরও বড় হয়েছে চাঁদটা। আরও সাদা। তন্ময় হয়ে দেখছে। ঠিক ল্যানির কথায় আসেনি সে। জ্যোৎস্না দেখতে এসেছে।

'রবিন!'

এতই নিঃশব্দে পেছনে এসে ডাক দিল ল্যানি, চমকে উঠল রবিন।

ফিরে তাকাল রবিন, 'কখন এলে। উহ্, চমকে দিয়েছ একেবারে।'

'সরি।' হাসল ল্যানি। 'ভেবেছিলাম, তোমার আগেই এসে বসে থাকব। তুমিই তো আগে চলে এলে।'

'স্টিভ শুয়ে পড়েছে। মেয়েগুলোও। আমার শুতে ইচ্ছে করছিল না। ভাবলাম, লেকের পাড়ে গিয়ে বসি।'

'কেমন লাগছে?'

'খুব সুন্দর।'

আবার হাসল ল্যানি। 'দুদিনেই মানিয়ে নিয়েছ। ভাল লাগতেই হবে। এ রকম জায়গাকে ভাল না বেসে পারা যায় না।'

'হ্যাঁ। এটা তোমার দ্বিতীয় বছর, তাই না?'

মাথা নাড়ল ল্যানি, 'কাউন্সেলর হিসেবে তৃতীয়। তবে গোল্ডেন ড্রীমে দ্বিতীয়বার, ঠিকই ধরেছ।'

'দ্বিতীয়বারও এখানেই এসেছ, তারমানে এই ক্যাম্পটাই তোমার বেশি পছন্দ?'

'হবে না কেন? আঙ্কেল জেড খুব ভাল মানুষ, তাঁর এখানে কাজ করে শান্তি পাওয়া যায়, যদিও অন্য ক্যাম্পের চেয়ে বেতন কম দেন।'

'কোন শহর থেকে এসেছ তুমি?'

হেসে উঠল ল্যানি, 'শহর নয়, গ্রাম, অজ পাড়া গাঁ। বেল ফরেস্ট। ওখানে একটা খামার আছে আমাদের। তবে লাভটাভ বিশেষ হয় না বলে এ বছর বন্ধ করে দিয়েছে বাবা।'

'তোমাকে দেখে, তোমার কথাবার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদে কিন্তু মনেই হয় না তুমি গাঁয়ের ছেলে। আমি ভেবেছি বড় কোন শহর থেকে এসেছ।'

'আমার সম্পর্কে এখনও অনেক কিছু জানা বাকি তোমার।'

চাঁদের আলোয় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল রবিন। বোঝার চেষ্টা করছে কি রহস্য লুকিয়ে রয়েছে ছেলেটার মধ্যে। হালকা হাসি হেসে বলল, 'জানিয়েও দাও না।'

'আমার ওপর তোমার এই হঠাৎ আগ্রহ কেন, বলো তো?' ভারী হয়ে উঠেছে ল্যানির কণ্ঠ।

ওর যাতে কোন সন্দেহ না হয়, সেজন্যে তাড়াতাড়ি জবাব দিল রবিন, 'বন্ধুত্ব করার জন্যে।'

রবিনের দিকে তাকিয়ে আছে ল্যানি। স্থির দৃষ্টি। আস্তে করে একটা হাত রাখল রবিনের কাঁধে। 'ঠিক আছে, বন্ধু হয়ে গেলাম।'

ওর হাতটা ধরল রবিন। 'এখন তোমার সম্পর্কে সব বলো।'

'আমাকে জানার এত আগ্রহ কেন?' ঠিকই সন্দেহ করে ফেলেছে ল্যানি।

'সব না জেনে কি বন্ধুত্ব হয়?'

'তুমি আসলে কি চাইছ, বুঝতে পারছি না, রবিন। খোলসা করে বলে ফেললেই বোধহয় ভাল হয়।'

'কি আর চাইব? মিছিমিছি পরিস্থিতি ভারী করছ তুমি। ঠিক আছে, বলতে না চাইলে বোলো না। চাপাচাপি করে কারও সম্পর্কে কিছু জানতে চাওয়াটা অভদ্রতা, জানা আছে আমার।'

রবিন ভেবেছিল, এ কথার পর মুখ খুলবে ল্যানি। কিন্তু মুখ বন্ধ রাখল সে। চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'খুব সুন্দর চাঁদটা, তাই না?'

'তোমাদের বেল ফরেস্টের চাইতেও?'

'যে কোন বুনো এলাকাতেই চাঁদ সুন্দর হয়। বনে ঢুকবে না?'

ঘড়ি দেখল রবিন। 'রাত অনেক হয়ে গেছে। ক্লান্তও লাগছে। চলো, আজ ফিরেই যাই। আরেকদিন যাওয়া যাবে।'

একসঙ্গে কিছুটা এগোনোর পর দু'জনের পথ আলাদা হয়ে গেল। দুই কেবিনে যাবে।

ভাবতে ভাবতে চলেছে রবিন। ল্যানির সঙ্গে আলাপটা জমেনি। ল্যানি যতই বলুক বন্ধু হয়ে গেলাম–তার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল না। আজও বোধহয় কোন উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছিল ল্যানি। বনে ঢোকার সঙ্গীর জন্যে। কিংবা রবিন কেন তার ওপর নজর রেখেছে, সে-কথাটা বের করে নেয়ার জন্যে।

রবিন একটা গাছের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ছায়া থেকে আচমকা সামনে এসে দাঁড়াল টেরি। খিকখিক করে হেসে বলল, 'কি খবর, নথি শার্লক, কেমন আছ? ভুমা দোস্ত আর কেলো শিম্পাঞ্জীটাকে বাদ দিয়ে চরগিরিটা জমছে না বুঝি এবার?'

'সরো, গন্ধ লাগছে!' রবিনও খোঁচা দিতে ছাড়ল না। 'শুধু শুধু এসেছ এই স্বর্গীয় পরিবেশটাকে নষ্ট করতে।'

রাগ করল না টেরি। হাসিটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'সব জানি আমি। কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে, তুমি কি করছ, সব।'

'কি জানো?'

'সেকথা তোমাকে বলতে যাব কেন?' হাসতে হাসতে রবিনকে মহা খেপান খেপিয়ে দিয়ে চলে গেল টেরি।

তেরো

পরদিন সকালে যেন ঘোরের মধ্যে থেকে মেস হলে হেঁটে এল রবিন। সারা রাত ঘুমাতে পারেনি। কেবল ছটফট করেছে। বার বার মনে বেজেছে টেরির কথা : সব জানি আমি! কি জানে সে? কি হচ্ছে? সত্যি কি কিছু জানে সে, নাকি তাকে ধাঁধায় ফেলার জন্যে এ রকম করে কথা বলেছে?

ভেবেও কোন কূলকিনারা করতে পারেনি।

'রবিন, সরো, সরো!'

মাথা তুলে দেখল সে, একটা সফটবল ছুটে আসছে তার দিকে। ঝট করে মাথা নিচু করে সরে গেল একপাশে।

'দেখেশুনে মারো না,' কয়েকটা ছেলেমেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল টনি। দৌড়ে এল রবিনের দিকে, 'লেগেছে?'

'না,' মাথা নাড়ল রবিন, 'থ্যাংকস।'

'তোমার ভাব-ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে যোজন যোজন মাইল দূরে রয়েছ তুমি?'

'থাকতে পারলেই ভাল হত!'

'আউটডোর পছন্দ হচ্ছে না? এই বনবাদাড়, লেক, পাহাড়...'

'ওগুলো দেখার সময় পেলাম কই? পেলে তো ভালই লাগত।'

'তোমার হয়েছে কি, রবিন? আমাকে বন্ধু ভাবলে সব খুলে বলতে পারো।'

'ব্যাপারটা ব্যক্তিগত...'

'জানলে তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম। ঠিক আছে, আমাকে বলতে না চাইলে আঙ্কেল জেডকে গিয়ে বলো।'

হঠাৎ মনে হলো রবিনের, কাউকে বলা দরকার। মনের বোঝা হালকা হবে। আঙ্কেল শুনতে চান না। একে তো সময় নেই। তার ওপর ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। ববকে বলা যেত, কিন্তু সে নিজের কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত, আলোচনার সময়ই নেই। কিংবা এমনও হতে পারে, সে-রাতে তাকে সঙ্গ না দেয়ায় মনঃক্ষুণ্ন হয়ে কাজের ছুতোয় এড়িয়ে চলতে শুরু করেছে।

'তোমাকেই বলব,' টনিকে বলল রবিন।

আগে আগে চলল টনি। খানিক দূরে একটা গাছের নিচে পাথরের ওপর বসল দুজনে। কোন কথা না লুকিয়ে দুর্ঘটনাগুলোর কথা টনিকে বলল রবিন। লাল পালকগুলোর কথা জানাল। 'আমার সন্দেহটা কি শুনবে?' ইতি টানল সে, 'কেউ একজন ক্যাম্পটাকে বন্ধ করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করছে।'

'কিন্তু কেন করবে? লাভটা কি তার?' টনির প্রশ্ন।

'জানি না। তাহলে তো ধরেই ফেলতে পারতাম লোকটাকে। তবে বের করেই ছাড়ব আমি। তার শয়তানি সফল হতে দেব না।'

'কাউকে সন্দেহ হচ্ছে তোমার?'

'নাহ্, এখনও সন্দেহ করার মত কোন প্রমাণ পাইনি। তবে শুঁটকিটার চাল-চলন আমার ভাল লাগছে না। অবশ্য কোনকালেই ভাল ছিলও না। গতবারও এসেছিল এখানে। এবারও এল...'

'শুঁটকি কে?'

'টেরিয়ার ডয়েল। আমার মতই রকি বীচ থেকে এসেছে। ওর সঙ্গে সম্পর্ক খুব খারাপ আমাদের। সব সময় তালে থাকে কখন আমাদের ক্ষতি করবে, কখন ভোগাবে। তবে শত্রুতাটা আমাদের সঙ্গে। আঙ্কেল জেডের ক্ষতি কেন করবে বুঝতে পারছি না!'

'তোমার দুশ্চিন্তার কারণ আমি বুঝতে পারছি,' সহানুভূতি দেখাল টনি, 'আঙ্কেল জেড তোমার মামা। তাঁর ক্ষতি হয়ে গেলে তুমি আন্তরিক দুঃখ পাবে। ক্যাম্পটা বাঁচানো এখন তোমার কর্তব্য হয়ে গেছে। কিন্তু মাথা গরম করলে তো চলবে না।'

'শান্ত রাখার চেষ্টা তো করছি, পারছি না।'

'আমি তোমাকে একটা বুদ্ধি দিতে পারি। সব ভাবনা মাথা থেকে দূর করে দাও। জোর করে জট ছাড়ানোর চেষ্টা কোরো না। পুরোপুরি কাজে মন দাও। প্রকৃতির কোলে এসেছ, প্রকৃতি নিয়ে মেতে থাকো। আমার বিশ্বাস, মাথা ঠাণ্ডা হলে তখন আপনাআপনিই প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে নিজের মন থেকে।'

টনির কথা পছন্দ হলো রবিনের। অনেকটা কিশোরের মত কথা বলে।

'ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে মাথাটা তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হবে,' আবার বলল টনি।

'কোথায় যাব? এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার ইচ্ছে আমার নেই।'

'আগামী হপ্তায় ক্যাম্পারদের বাইরে নিয়ে যাওয়ার কথা আমার। ওয়াইল্ডারনেস ট্রিপ। বন-পাহাড়-নদী দেখাতে।...ও, তুমি জানো না। আসতে চাইলে তুমিও আমার সঙ্গে আসতে পারো। অ্যাসিসটেন্ট বোটিং কাউন্সেলর হিসেবে। আমার সহকারী।'

ওয়াইল্ডারনেস ট্রিপ? মনে পড়ল রবিনের, ক্যাম্পারদের এ ব্যাপারে আলোচনা করতে শুনেছে। কিন্তু কার সঙ্গে যাচ্ছে ওরা, সেটা জানত না; ব্যস্ততার কারণে ডিউটি রুস্টার চেক করে দেখতে পারেনি।

'কয়েকজন কাউন্সেলর যাচ্ছে,' টনি বলল, 'নতুন আছে, পুরানোও কয়েকজন। খুব মজা হবে।'

আউটডোরে গেলে যে মজা হয়, ভাল করেই জানা আছে রবিনের। সে-ও তো কম যায়নি। ক্যাম্পটা থেকে বেরোনোর একটা সুযোগ পাওয়া গেলে মন্দ হয় না। 'কিন্তু, স্টিভ যদি যেতে না দেয়?'

'আমার অ্যাসিসটেন্ট হয়ে যাবে। না দেবার তো কিছু দেখি না। প্রয়োজন হয় আঙ্কেল জেডকে আমি নিজে গিয়ে বলব। রাতে বনে থাকতে হবে কিন্তু। তবে একটা রাত শুধু। কাউন্সেলর হিসেবে তোমার অভিজ্ঞতা বাড়ানোর প্রয়োজন আছে। আমার মনে হয় না তোমাকে যেতে দিতে অরাজি হবেন আঙ্কেল জেড।' একটু থেমে বলল টনি, 'ক্যানুতে করে হোয়াইট রিভারে চলে যাব আমরা।'

'ক্যানু? ওগুলো কি মেরামত হয়েছে?'

'ওগুলো নেবই না আমরা। ক্যাম্পসাইটের বাইরে ভাড়া পাওয়া যায়, ওখান থেকে নেব। আমাদের ক্যানুগুলো ভাল থাকলেও নিতাম না। অহেতুক বোঝা বওয়া। তারচেয়ে জায়গামত গিয়ে ভাড়া নিলে অনেক সুবিধে।'

*

সেই দিনই, ক্র্যাফটস কেবিনে যাওয়ার পথে ওয়াইল্ডারনেস ট্রিপ নিয়ে ভাবতে ভাবতে চলল রবিন। মেইন বিল্ডিঙের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বব আর ল্যানিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। কোন কিছু নিয়ে কথা কাটাকাটি করছে। কথায় না বনাতেই বোধহয় রাগ দেখিয়ে গটমট করে চলে গেল ল্যানি।

ববের কাছে এগিয়ে গেল রবিন। 'কি নিয়ে ঝগড়া করলে?'

'ওই তো, কাউন্সেলরগিরি নিয়ে জ্ঞান দিতে এসেছিল, ওর যা স্বভাব। দিলাম হাঁকিয়ে। ও কি তোমার মত নতুন পেয়েছে নাকি আমাকে? মাতব্বরি করতে না পেরে হুমকি দিল, ওর মা'কে লিখে দেবে—আমি খারাপ ছেলে। লিখুকগে। উন্মাদ কোথাকার। ওরা মা'র কাছে লিখবে তো আমার কি? যাকগে, তোমার কি খবর?'

'ভালই।'

দু'চারটা টুকটাক কথার পর একদিকে চলে গেল বব। কথার কথা মনে হলো সেগুলো রবিনের কাছে। আন্তরিকতা নেই।

ক্র্যাফটস কেবিনের সুইং ডোর ঠেলে খুলে ভেতরে ঢুকল রবিন। নিচু কাঠের টেবিলের সামনে বসে কয়েকটা ছোট ছোট মেয়েকে মাটির জিনিস

বানানো শেখাচ্ছে স্টিভ। পটারি হুইলে একটা ফুলদানীর ফিনিশিং টাচ দিচ্ছে।

'সরি, লেট করে ফেললাম,' যদিও দু'এক মিনিটের বেশি দেরি করেনি রবিন, কিন্তু দেরি দেরিই।

চোখে রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে ওর দিকে তাকাল স্টিভ। কিছু বলল না।

রাগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল রবিনের মনে। চীফ তো কি হয়েছে, করে তো কাউন্সেলরের চাকরি, দেশের প্রেসিডেন্ট তো আর হয়ে যায়নি। 'রাগ কমাও!' ধমক লাগাল নিজেকে। টনির কথা মনে পড়ল–মাথা ঠাণ্ডা করতে হবে। নইলে কোন কাজ করতে পারবে না। বড় করে দম নিয়ে কেবিন ফাইভের মেয়েগুলোর দিকে এগিয়ে গেল সে, ওদের কাজে সহায়তা করার জন্যে। সব ক'জনই উত্তেজিত, বিশেষ করে দিনা। মাটি দিয়ে কি করে জিনিস বানাতে হয়, মোটামুটি ধারণা আছে রবিনের। বই পড়ে শিখেছে। সেই বিদ্যেই ঝাড়ল।

আগুনে পোড়ানোর কথা আসতেই নোরা জিজ্ঞেস করল, 'রুটি বেক করার মত?'

'অনেকটা ওরকমই,' রবিন বলল। 'ঠিকমত পোড়ানো হলে চাকচিক্যও বাড়ে, এই যে এই ভাসটার মত।' তুলে নিয়ে ভাসটা মেয়েদের দেখাতে গিয়ে লক্ষ করল, নিচের দিকে স্টিভের স্বাক্ষর রয়েছে। স্টিভ বানিয়েছে পাত্রটা। খুব ভাল বানাতে পারে–মনে মনে প্রশংসা না করে পারল না রবিন।

'দেখি তো?' রবিনের হাত থেকে পাত্রটা নিতে গেল নোরা। একই সঙ্গে হাত বাড়াল দিনাও। রবিনের দুর্ভাগ্য, একসঙ্গে নিতে গিয়ে টানাটানি শুরু করল মেয়ে দুটো। হাত থেকে দিল ফেলে। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল সুন্দর জিনিসটা।

হুইল ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল স্টিভ। খেউ খেউ করে উঠল, 'একটা কাজও কি তুমি ঠিকমত করতে পারো না?'

*

বাকি বিকেলটা যন্ত্রের মত কাজ করে গেল রবিন। আশেপাশে এত মানুষ। অথচ সারা জীবনে এতটা একা বোধহয় আর বোধ করেনি কখনও। সে জানছে একটা অঘটন ঘটতে যাচ্ছে, অথচ কাউকে বিশ্বাস করাতে পারছে না, আঙ্কেল জেডকেও না। টনিকে বলেছিল শুধু মন হালকা করার জন্যে নয়, সাহায্য পাবার আশায়। কিন্তু টনি সাহায্য করবে বলেনি। বরং বার বার ইঙ্গিত দিয়েছে–তার মাথা গরম, ঠাণ্ডা করার পরামর্শ দিয়েছে।

বিকেলটা বড়ই শান্ত আজ। সিনিয়র ক্যাম্পাররা প্রায় সবাই শহরে চলে গেছে মেলা দেখতে। জুনিয়র ক্যাম্পারদের অর্ধেকের বেশি গেছে পিকনিকে। ক্যাম্পে রয়েছে বাকি ক'জন জুনিয়র, রবিনের গ্রুপটা, আর সাঁতার পাগল তিনজন ক্যাম্পার। পানিতে রয়েছে ওরা।

রবিনের গ্রুপটাও পানিতে নামল। কিছুক্ষণ দাপাদাপি করে উঠে কেবিনের দিকে চলল। ওদের যেতে দিয়ে ঘুরপথ ধরল রবিন। অগ্নিকুণ্ডের ধার দিয়ে।

বনের কিনার দিয়ে এগোচ্ছে, হঠাৎ মুখের ওপর এসে পড়ল ইয়া বড় এক

মাকড়সা। লাফ দিয়ে সরে গেল সে। হাসি শুনে তাকিয়ে দেখে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে ডবি। সুতোয় বাঁধা রবারের মাকড়সাটা টান লেগে আবার ফিরে গেছে তার হাতে।

সহ্য হলো না আর রবিনের। কি জানি কি হয়ে গেল মাথার মধ্যে'। ঝাঁপিয়ে পড়ল গিয়ে ডবির ওপর। ঘুসি মারতে গেল মুখে। কিন্তু মুখটা সরিয়ে ফেলল ডবি। রবিনের হাতটা ধরে ফেলল। তার গায়ে শক্তি অনেক বেশি। আশ্চর্য হয়ে গেল রবিন। ওর হাতটা মুচড়ে পিঠের ওপর নিয়ে এল ডবি। কানের কাছে মুখ এনে হাসতে লাগল। 'এই শক্তি নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করো, হায়রে কপাল!'

টেরির হাসির মতই খিকখিকে হাসি শুনে ফিরে তাকাল রবিন।

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে টেরি। বুঝতে পারল রবিন, ডবি তার সাগরেদ হয়েছে।

ওপর দিকে হাতটা সামান্য ঠেলে দিল ডবি।

ব্যথায় উহ্ করে উঠল রবিন।

মজা পেয়ে আরও জোরে হাসতে লাগল ডবি।

'এই, কি হচ্ছে!'

আরেকটা কণ্ঠ কানে আসতে অন্য দিকে ফিরে তাকাল রবিন। ল্যানি। কাছে এসে দাঁড়াল। টেরিকে বলল, 'ওর পেছনে লেগেছ কেন তোমরা, বুঝলাম না।'

'তোমার বোঝার দরকারও নেই,' টেরি বলল। ওর হাতে একটা ছোট প্লাস্টিকের বালতি। সেটা তুলে ধরল রবিনের মুখের কাছে।

ভেতরে তাকিয়ে শিউরে উঠল রবিন। বালতিটা অর্ধেক ভরা। তারমধ্যে কিলবিল করে সাঁতরে বেড়াচ্ছে বড় বড় আট-দশটা জোঁক।

চোদ্দ

মুখ সরিয়ে নিল রবিন।

বালতিটা আরও এগিয়ে আনল টেরি। হাত চেপে ধরে রেখেছে ডবি। প্রচণ্ড ব্যথা।

চোখে অনুরোধ নিয়ে ল্যানির দিকে তাকাল রবিন।

দ্বিধায় পড়ে গেল ল্যানি। অস্বস্তি বোধ করছে কোন কারণে। বলল, 'হাতটা ছেড়ে দাও না ওর। ভেঙে গেলে বিপদে পড়বে তোমরা।'

খিকখিক করে হাসল আবার টেরি। 'যাক না ভেঙে। হাড্ডি ভাঙার মজা জানা আছে ওর। খুব মজা পায়। কতবার হাড্ডি ভাঙল পাহাড়ে চড়তে গিয়ে।'

'সেটা তো ও নিজে নিজে ভেঙেছে। তোমরা ভাঙলে...'

'থামো তুমি!' ধমক লাগাল টেরি। 'বড্ড বাড় বেড়েছিল শার্লকগুলোর।

রকি বীচে কম অপদস্থ করেনি আমাকে। আজ পেয়েছি বাগে। এত সহজে ছাড়ছি না।' রবিনের দিকে তাকিয়ে হাসিটা ফিরে এল মুখে, 'কি হে নথি গোয়েন্দা, খাবে নাকি এগুলো? তোমার জন্যেই তাজা তাজা ধরে আনলাম। নাকি এগুলোকে দিয়ে তোমাকে খাওয়াব?'

জোঁকগুলোর দিকে তাকিয়ে আবার বমি ঠেলে উঠতে শুরু করল রবিনের।

'খুব অসহায় লাগছে, তাই না? আহারে!' জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল টেরি। ডবির দিকে তাকাল, 'এই, ওকে নিয়ে চলো। বনে। ল্যানি, ধরো তো।'

'আ-আ-আমি পারব না!'

'পারবে না? তাহলে দেব বলে আঙ্কেল জেডকে? তুমি যে কি শয়তানি করেছ, সেটা জানলে...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, ধরছি!' তাড়াতাড়ি এসে রবিনের আরেকটা হাত চেপে ধরল সে। 'তবে মোচড়ানোর দরকার নেই। ডবি, ছেড়ে দিয়ে ধরো।'

'না!' গর্জে উঠল টেরি। 'এই বিচ্ছুটাকে তুমি চেনো না। যদিও তিনটের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল এটা, তারপরেও কম যায় না। ডবি, এ ভাবেই নিয়ে চলো। শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দেব আজ।'

ধাক্কা মারতে মারতে রবিনকে বনের মধ্যে ঢোকাল ওরা। নিয়ে এল একটা সরু খাঁড়ির কাছে। পানি সামান্যই আছে ওটাতে, থিকথিকে কাদা। জোরে এক ধাক্কা দিয়ে ওটাতে ফেলে দিল ওকে টেরি।

ঠাণ্ডা, পিচ্ছিল কাদা। পচা পাতার গন্ধ। ওগুলোকে বিশেষ কেয়ার করল না সে, ভয় পেল জোঁক আছে নাকি ভেবে। তবে ভয়টা ওদের দেখানো চলবে না। উঠে দাঁড়াল। গোড়ালি পর্যন্ত দেবে গেল কাদায়। টান দিয়ে পা তুলতে ফুচুত করে উঠল।

মহা আগ্রহে ওর দিকে তাকিয়ে আছে টেরি। আকর্ণ বিস্তৃত হাসিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে।

পাড় বেয়ে উঠতে গিয়ে হড়াৎ করে পা পিছলাল রবিন।

মজা পেয়ে হো-হো করে হেসে উঠল টেরি। 'বিচ্ছুর আজ গোসলটা খুব ভাল হচ্ছে। কাদায় গোসলের কি আনন্দ ফিরে গিয়ে দোস্তদের বলতে পারবে।'

ওর সঙ্গে সঙ্গে হাসছে ডবি।

ল্যানি দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে।

রবিনকে আবার উঠে দাঁড়াতে দেখে টেরি বলল, 'ডোবার মধ্যে বড় একা একা লাগছে বিচ্ছুটার। সঙ্গী দেয়া দরকার।' বলেই বালতি তুলে পানি সহ জোঁকগুলো ছুঁড়ে দিল তার গায়ে।

চিৎকার করে উঠল রবিন। থাবা মেরে গা থেকে জোঁক ফেলতে গিয়ে আবার পিছলাল। পড়ে গেল কাদায়।

'শুয়োর কিভাবে কাদায় গড়াগড়ি খায়, বুঝলে তো আজ? ভারি মজা...' হাসির জন্যে কথা বলতে পারছে না টেরি।

'অনেক হয়েছে! থামো এবার!' হঠাৎ গর্জে উঠল ল্যানি। তবে রবিনকে কাদা থেকে তোলার কোন চেষ্টা করল না।

ওদের দিকে নজর দেয়ার সময় নেই রবিনের। দুটো জোঁক শার্ট বেয়ে ওপরে উঠে আসছে। পায়ে সুচ ফোটানোর মত তীক্ষ্ণ ব্যথা টের পেতে তাকিয়ে দেখল একটা জোঁক কামড়ে ধরেছে।

দুঃস্বপ্নের মধ্যে রয়েছে যেন সে। থাবা দিয়ে ওটাকে ফেলার কথাও ভুলে গেছে। হাত আড়ষ্ট।

হেসেই চলেছে টেরি।

মনে হলো পেছনে একটা ছায়া এসে দাঁড়াল।

টনি!

সত্যি দেখছে? চোখে রোদ পড়ছে বলে ভালমত দেখা যাচ্ছে না।

পায়ের ব্যথাটা অসহ্য লাগছে। মরিয়া হয়ে চেপে ধরে এক হ্যাঁচকা টানে জোঁকটাকে ফেলে দিল সে। ফিরে, রোদ আড়াল করে তাকাল। টনিকে দেখতে পেল না। তারমানে আসলে দেখেনি। কল্পনাই করেছিল। নাকি?

'দেরি করলে ডিনার পাব না,' বলেই আচমকা ঘুরে দাঁড়াল ল্যানি।

রবিনের দিকে তাকিয়ে টেরি বলল, 'শিক্ষা হলো তো আজ? আর কখনও আমার সঙ্গে লাগতে এলে দশবার চিন্তা করে আসবে।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল সে। প্রভুভক্ত কুকুরের মত তার পেছন পেছন চলল ডবি।

জোঁকগুলোকে ঝেড়ে ফেলে প্রায় গড়িয়ে গড়িয়ে কোনমতে খাঁড়ির পাড়ে উঠে এল রবিন। জোঁকটা যেখানে কামড়ে ধরেছিল, সেখানে ব্যথা তেমন নেই, তবে ডিম্বাকৃতির ছোট্ট একটা ক্ষত থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। হাত-পা কাঁপছে। মাথা ঘুরছে। পরিশ্রমে যতটা নয়, তারচেয়ে বেশি আতঙ্কে। যদিও জোঁকগুলো একটাও আর নেই গায়ে, তবু কাদার জন্যে যেখানেই সুড়সুড়ি লাগছে, সেখানেই থাবা মারছে সে। সারা গা কাদায় মাখামাখি।

সরাসরি আঙ্কেল জেডের কাছে গিয়ে নালিশ করবে কিনা ভাবল। পরক্ষণে দূর করে দিল ভাবনাটা। নালিশ করার মানে হলো কাপুরুষতা। ওরা তাকে হেনস্থা করেছে, সে-ও সেটার প্রতিশোধ নেবে।

একটা কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে—টেরি, ডবি আর ল্যানি, এই তিনজন একদলে। ক্যাম্পে অঘটনগুলো যদি টেরি ঘটিয়ে থাকে, ওরা দু'জনও সেটা জানে।

হঠাৎ শোনা গেল চিৎকার। 'না না, প্লীজ, না!'

পনেরো

থমকে দাঁড়াল রবিন। নিজের হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি কানে এসে বাজছে। অন্ধকার বনের দিকে চোখ।

আর শোনা গেল না চিৎকার। সাবধানে এগোতে শুরু করল সে।

ছোট্ট এক চিলতে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এল রবিন। পলকের জন্যে কাপড়ের ঝিলিক চোখে পড়ল। দৌড়ে পালিয়ে গেল যেন কেউ। পরক্ষণে বড় একটা ওক গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রোজার ব্যাকম্যান।

'রোজার!' অবাক হলো রবিন, 'কি করছ...'

'রবিন!' রোজারকেও অবাক দেখাল। দ্রুত একটা হাত পেছনে নিয়ে গেল। মনে হলো লুকিয়ে ফেলল কিছু।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রবিন, 'আর কেউ আছে নাকি?'

'আর? না তো!'

'কে যেন দৌড়ে পালাল। আমি তো ভাবলাম...

'না না, আমি একা।' রেগে যাচ্ছে রোজার, বোঝা গেল, 'আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করছ নাকি?'

'গোয়েন্দাগিরি? তা করতে যাব কেন? দেখছ না, কাদায় মাখামাখি হয়ে আছি। ডোবায় পড়ে গিয়েছিলাম। গা ধুতে যাচ্ছি লেকে।'

'ও। দেখো, একটা কথা স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, তুমি আঙ্কেল জেডের ভাগ্নে হও আর যে-ই হও, আমার পেছনে লাগতে আসবে না। ভাল হবে না তাহলে।'

'না না, তা লাগব কেন?' আরও কোন অপ্রিয় কথা শোনার ভয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে এল রবিন।

অবাক লাগছে তার। রোজারের আবার কি হলো? সবাই এমন রেগে যাচ্ছে কেন তার ওপর?

দেরি হয়ে যাচ্ছে। বেশি দেরি হলে স্টিভ শুরু করে দেবে আবার ধমকাধমকি। দৌড়াতে শুরু করল সে।

বন থেকে বেরোনোর আগেই পায়ের শব্দ কানে এল। দ্রুত এগিয়ে আসছে।

রোজারই হবে।

গতি কমাল না রবিন। পাশ থেকে বেরিয়ে এল কেউ। ধাক্কা লেগে পড়েই যাচ্ছিল সে। শক্ত একটা হাত ধরে ফেলল তাকে।

ফিরে তাকিয়ে টনির বিস্মিত মুখ নজরে পড়ল রবিনের।

'রবিন, কি হয়েছে তোমার?' ওর হাতটা চেপে ধরে রেখে বলল টনি। 'এ অবস্থা কেন?'

'সে অনেক কথা,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রবিন। 'বনে ঘুরতে বেরিয়ে

কাদায় পড়ে গিয়েছিলাম।'

টনির মুখের দিকে তাকাল সে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল, সে মুখে কোন অপরাধের ছাপ আছে কিনা, তাকে কাদায় পড়ে থাকতে দেখেও সাহায্য করতে না আসায়।

নেই।

'ঠিক আছ তো তুমি?' ভুরু কুঁচকাল টনি।

'আছি।' না, চোখের ভুলই ছিল, শিওর হয়ে গেল রবিন, টনিকে দেখেনি ডোবার পাড়ে।

'সত্যি ঠিক আছ? কাদায় পড়লে কি করে?'

'গাছের দিকে তাকিয়ে পাখি দেখতে দেখতে হাঁটছিলাম,' টেরি যে ফেলে দিয়েছে, সে-কথাটা চেপে গেল রবিন, 'হঠাৎ পা পিছলাল। দেখি কাদায় গড়াগড়ি খাচ্ছি।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ। তারপর দেখা রোজারের সঙ্গে। ও খামোকা আমার ওপর রেগে উঠল। কেমন চোরা চোরা ভঙ্গি, যেন চুরি করতে এসে ধরা পড়ে গেছে। অকারণেই ধমকাতে লাগল আমাকে।'

'তাই?' মাথা নাড়তে নাড়তে টনি বলল, 'ওর মেজাজ-মর্জি কিছু বোঝা যায় না।'

'কেন এমন করল, আমিও কিছু বুঝলাম না।'

'ছুটিটা তোমার বড়ই খারাপ যাচ্ছে, তাই না, রবিন?'

'আঙ্কেল জেডের চেয়ে নিশ্চয় খারাপ নয়,' বিষণ্ণ কণ্ঠে জবাব দিল রবিন। 'আমার কথা যদি খালি শুনতেন...অন্তত একজনকেও যদি বিশ্বাস করাতে পারতাম...'

'তোমার কেমন লাগছে বুঝতে পারছি,' সহানুভূতির সুরে বলল টনি। 'আমি জানছি এই জিনিসটা ঘটবে, অথচ কাউকে বিশ্বাস করানো যাচ্ছে না—সাংঘাতিক খারাপ লাগে তখন। এ রকম ঘটনা আমার বেলায়ও ঘটেছে।'

'ঘটেছে?'

মাথা ঝাঁকাল টনি। 'বলব একদিন, সব বলব তোমাকে।' হাসল সে।

টনির সহজ ব্যবহারে অনেকটা শান্ত হয়ে এল রবিনের স্নায়ু। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। তারপর ঘড়ি দেখে বলে উঠল টনি, 'ওহ্হো, ভুলেই গিয়েছিলাম। তোমার জন্যে একটা জিনিস রেখেছি। ওয়াইল্ডারনেস ট্রিপে কে কে যাবে তার একটা ফাইনাল লিস্ট।' পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করে দিল সে।

'থ্যাংকস,' রবিন বলল। 'ডিনারে দেখা হবে।'

*

লেক থেকে গা ধুয়ে কেবিনে ফিরে দেখল রবিন, শূন্য কেবিন। গোসলখানায় গিয়ে ভাল করে সাবান ঘষে, শাওয়ার ছেড়ে গা-টা ঠাণ্ডা করে নিল। বেরিয়ে এসে গড়িয়ে পড়ল বাংকে। খানিকটা বিশ্রাম না নিলে আর চলছে না। বিছানার

ওপর রেখে গিয়েছিল টনির দেয়া কাগজটা। নিরাসক্ত ভঙ্গিতে তুলে নিল সেটা।

পনেরোজনের নাম আছে। এক নম্বর থেকে পড়তে শুরু করল। বেশিরভাগ ক্যাম্পারকেই চেনে না সে।

কাউন্সেলরদের নাম পড়তে গিয়ে বুকের ধুকপুকানি বেড়ে গেল আবার। ওর নিজের নামটা বাদে রয়েছে টনি ও আর্চারি ইন্সট্রাক্টর এরিক গবলিনের নাম; আর ওরা তিনজন–টেরি, ডবি এবং ল্যানি।

ষোলো

'রবিন!'

চোখ লেগে গিয়েছিল রবিনের। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

মৃদু টোকা পড়ল দরজায়। 'আই রবিন, ভেতরে আছ?'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। স্টিভ নয়। বব।

'এসো।'

ভেতরে ঢুকল বব।

'তারপর কেমন চলছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'সাংঘাতিক কাজের চাপ। দম ফেলার ফুরসত পাচ্ছি না। তোমার?'

টেরি আর তার দল তাকে কিভাবে হেনস্থা করেছে, সব খুলে বলল রবিন। সবশেষে বলল, 'শুঁটকিকে কেয়ার করি না, ও ওরকমই। শয়তানির চেষ্টা করতেই থাকবে। আমি সাবধান থাকলেই আর কিছু করতে পারবে না। কিন্তু ভয় পাচ্ছি স্টিভকে। আমার স্নায়ুতে ভীষণ চাপ দিচ্ছে। এ রকম চলতে থাকলে এখানে টিকতে পারব না। ও বোধহয় আমাকে তাড়ানোর জন্যেই এমন করছে। ব্যাপারটা ছোট্ট মেয়েগুলোর চোখেও পড়ে গেছে। আজ বিকেলে নোরা আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, স্টিভ আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করে কেন? আমি কি করেছি?'

'খুব খারাপ কথা।'

'অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে ওর কাছ থেকে দূরে থাকতে পারলেই বাঁচি আমি এখন। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, তারই অ্যাসিসটেন্ট হতে হয়েছে আমাকে, সুতরাং সরে থাকাও কোনমতেই সম্ভব না।'

'দিন গেলে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে হয়তো,' কোন সমাধান না পেয়ে সান্ত্বনা দিল বব।

'হয়তো হবে, কিন্তু ততদিন সহ্য করব কিভাবে? আমার তো দম আটকে আসছে এখনই।' ঘড়ি দেখল রবিন। 'আরে, ডিনারের সময় তো প্রায় হয়ে এল। স্টিভ কোথায়? ওর তো এ সময় এখানে থাকার কথা।'

'কি জানি। আমার সঙ্গে তো দেখা হয়নি।'

দরজার কাছে গিয়ে হাঁক দিল রবিন, 'মেয়েরা, ডিনারের সময় হয়ে

গেছে। হাত-মুখ ধুতে এসো।'

হই-চই করতে করতে ঘরে ঢুকল মেয়েগুলো। হাত-মুখ ধুয়ে নিল। কাপড় বদলে নিল। স্টিভের দেখা নেই এখনও। ওদের নিয়ে মেস হলে রওনা হলো রবিন আর বব।

স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি হট্টগোল হচ্ছে মেস হলে। ভেতরে ঢুকতেই কারণটা জেনে গেল রবিন আর বব। ছাতের একটা কড়িকাঠ থেকে উল্টো হয়ে ঝুলছে ডবি। মুখে গরিলার মুখোশ। গরিলার কণ্ঠ অনুকরণ করে গাঁক-গাঁক করছে, আর নিচের টেবিলে কলার খোসা ছুঁড়ে ফেলছে।

রবিনকে দেখেই হাতের বাকি খোসাটা ওর দিকে ছুঁড়ে মারল ডবি। ঝট করে মাথা নুইয়ে ফেলল রবিন। লাগল না তার গায়ে।

হাসির হুল্লোড় উঠল আরও। সব হাসিকে ছাপিয়ে খিকখিক হাসি শোনা গেল। তীক্ষ্ণ একটা কণ্ঠ বলে উঠল, 'কিসের গরিলা হয়েছ তুমি, হাতের নিশানাই ঠিক করতে পারোনি। কি করে ছুঁড়তে হয়, এই দেখো।'

টেরির কথা শুনেই ফিরে তাকিয়েছিল রবিন। খানিক দূরে একটা টেবিলে বসেছে। কিন্তু সময়মত মাথা নোয়াতে পারল না। তার মুখে এসে লাগল টেরির ছুঁড়ে দেয়া খোসাটা।

ওপরে গাঁক-গাঁক করে উঠল ডবি। গরিলার ভাষায় টেরির প্রশংসা করছে। গরিলার হাসি হাসল। কড়িকাঠে বাঁধা একটা মোটা দড়ি বেয়ে নেমে এল। মুখোশটা পরেই গিয়ে বসল খাবার টেবিলে।

'আস্ত ভাঁড়!' ঘৃণায় মুখ বাঁকাল বব। 'কানটা ধরে মুচড়ে দিতে পারলে এখন খুশি হতাম।'

কলার খোসাটা মুখে লাগায় যেন কিছুই মনে করেনি রবিন, এমন স্বাভাবিক ভঙ্গি করে রইল। রাগ দেখালেই বরং মজা পাবে শুঁটকিটা। ওকে এড়িয়ে গিয়ে চারপাশে তাকাতে লাগল স্টিভের খোঁজে। আনমনে বিড়বিড় করল, 'স্টিভ এখনও আসছে না কেন?'

'আমার কাছেও অদ্ভুত লাগছে!' বব বলল। 'লেট করার বান্দা তো সে নয়!' চেয়ারে উঠে দাঁড়িয়ে পুরো হলঘরে চোখ বোলাল সে। 'নেই। আরও একজনকে দেখছি না। রোজার।'

'কোথাও গেল নাকি দুজনে?'

'কোথায় যাবে? ডিউটি ফেলে শুধু শুধু ঘুরতে অন্তত যাবে না স্টিভ।'

'কিন্তু...' ভয়ানক ভাবনাটা মাথায় আসতে কথা আটকে যেতে লাগল রবিনের। 'বব, যদি...'

'যদি কি?'

'যদি কিছু ঘটে থাকে? স্টিভ আর রোজারের?'

'কি ঘটবে?' হাত নাড়ল বব, 'কল্পনা বাদ দাও তো। নিশ্চয় কোন জরুরী কাজে আটকে গেছে। সেরে আসতে দেরি হচ্ছে।'

'কিন্তু কি কাজ করছে?'

'তা কি করে বলব? ক্যাম্পে কি কাজের অভাব আছে নাকি?'

মেনে নিতে পারল না রবিন। খুঁতখুঁতিটা গেল না তার। শেষে বলল, 'কি কাজ করছে না জেনে স্বস্তি পাচ্ছি না আমি। বব, প্লীজ, আমার মেয়েগুলোকে একটু দেখো। স্টিভ কোথায় দেখে আসি আমি। দেরি করব না।'

'ঠিক আছে, যাও।'

মেস হল থেকে বেরিয়ে এল রবিন। কোথাও কোন গোলমাল চোখে পড়ল না। পুরো ক্যাম্পটাই খুব শান্ত। গরমের ফুরফুরে হাওয়ার আমেজ যেন গাছের পাতাগুলোতেও লেগেছে, বাতাসে মৃদু ঝিরঝির শব্দ তুলছে। মাঝেসাঝে ডেকে উঠছে গেছো ব্যাঙ।

প্রথমে নিজেদের কেবিনে এসে খুঁজল রবিন। কোন কারণে লেট করে ফেলে যদি পোশাক পাল্টাতে এসে থাকে স্টিভ?

নেই এখানে। দরজা বন্ধ।

লেকের দিকে তাকাল রবিন। কাউকে চোখে পড়ল না।

কোথায় যেতে পারে, কোথায় যেতে পারে, ভাবতে ভাবতে ক্র্যাফটস কেবিনের কথা মনে পড়ল ওর। মনে পড়ল, ভাস বানানোর সময় কেমন মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিল স্টিভ। কাজের নেশায় বোধহয় সময়ের হিসেবও ভুলে গেছে।

স্টিভকে যখন বলবে, তার লেট হয়ে গেছে, মুখের ভাবটা কেমন হবে কল্পনা করে মুচকে হাসল রবিন।

ক্র্যাফটস কেবিনের কাছে এসে দেখল, অন্ধকার। ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরতে গিয়েও থেমে গেল। এসেছে যখন ভেতরে অন্তত একটিবার উঁকি দিয়ে যাওয়া দরকার।

ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলল দরজাটা।

'স্টিভ? ভেতরে আছ?'

জবাবে শোনা গেল একটা বিচিত্র যান্ত্রিক গুঞ্জন।

ঘরের ভেতর ঢুকল রবিন। হাতড়ে হাতড়ে সুইচবোর্ড বের করে আলো জ্বেলে দিল।

প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল যেন।

ঘরের মেঝে, দেয়াল, সবখানে চকচকে লাল রঙের কি যেন লেগে আছে।

রক্ত!

বিদ্যুতে চলা ঘূর্ণায়মান পটারি হুইলটা থেকে রক্তের ছিটে উড়ে আসছে।

তাকিয়ে রয়েছে রবিন। আতঙ্কিত। অসুস্থ বোধ করছে। ঘুরেই চলেছে হুইলটা। যতবার ঘষা লাগছে, ছিটিয়ে দিচ্ছে রক্ত।

সতেরো

অসাড় হয়ে গেছে যেন শরীর। হাত-পা নাড়াতে পারছে না। চোখ সরাতে পারছে না ভয়ঙ্কর দৃশ্যটার দিক থেকে।

টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে স্টিভ। মুখটা লেগে আছে পটারি হুইলে। ক্রমাগত ঘষা লেগে লেগে বেশিরভাগটাই নেই আর এখন মুখের। চুলের ঝুঁটিটা না থাকলে চেনাই যেত না ওকে।

চিৎকার করতে গিয়েও করল না রবিন। কাঁপা হাতে হুইলের প্লাগটা খুলে দিল। এগিয়ে গেল দেখার জন্যে, স্টিভ এখনও বেঁচে আছে কিনা।

নিথর হয়ে পড়ে আছে স্টিভ। লাশের মত নিথর।

দুর্ঘটনাটা কিভাবে ঘটেছে অনুমান করতে পারল রবিন। স্টিভের গলার চেনটা জড়িয়ে গিয়েছিল হুইলের সঙ্গে। খুলতে আর পারেনি। তার আগেই দম আটকে মরে গেছে।

স্টিভের চারপাশে জিনিসপত্রের ছড়াছড়ি। হুইল থেকে চেন খোলার চেষ্টা করার সময় জোর পাওয়ার জন্যে বোধহয় কোন কিছু আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল সে। হাতের নাড়া লেগে ঠিক তার পেছনেই রাখা জিনিসপত্রের তাক থেকে ছড়িয়ে পড়েছে জিনিসগুলো—রঙের টিন খুলে রঙ, পুঁতি, পালক, চামড়ার ফালি, সিল্কের পাকানো শক্ত দড়ি।

মড়ার আগে রীতিমত যুদ্ধ করে গেছে স্টিভ। হুইলটার সঙ্গে যুদ্ধ। তার প্রিয় হুইল।

নাকি অন্য কারও সঙ্গে যুদ্ধ করেছে সে? যে তাকে খুন করেছে?

বোঁ করে উঠল মাথা। ঘরটা যেন ঘুরতে শুরু করল চোখের সামনে। জোর করে নিজেকে সামলাল রবিন।

লম্বা দম নিল। নিজেকে শান্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাল। মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবতে হবে এখন। স্টিভকে এ অবস্থায় দেখার পর প্রথমে ভেবেছিল দুর্ঘটনা, কিন্তু এখন আর নিশ্চিত হতে পারছে না।

স্টিভের মত অভিজ্ঞ কারও বেলায় এ রকম দুর্ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক।

স্টিভের মত সাবধানী কারও বেলায়।

কে করল তাহলে কাজটা? কেন?

হঠাৎ মনে পড়ল। বাকি দুর্ঘটনাগুলোর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই তো? মেরুদণ্ড বেয়ে শিরশির করে নেমে গেল ঠাণ্ডা স্রোত।

এবার শুধু দুর্ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি।

এবার হয়েছে খুন!

পেছনে শব্দ হলো।

ভীষণ চমকে গেল সে। নিজের অজান্তে চিৎকার বেরিয়ে এল।

ফিরে তাকিয়ে দেখে, রোজার দাঁড়িয়ে আছে।

'রবিন?' বলল সে, 'দরজাটা খোলা দেখে ভাবলাম...' কথা বন্ধ হয়ে গেল আচমকা। বড় বড় হয়ে যাচ্ছে চোখ, রক্ত সরে যাচ্ছে মুখ থেকে। ফিসফিস করে বলল, 'কি করে হলো!'

'জানি না,' খুনের সন্দেহের কথাটা প্রথমেই বলল না রবিন। 'পটারি হুইলে চেনটা আটকে গিয়েছিল বোধহয়, আর খুলতে পারেনি...ওর দেরি দেখে খুঁজতে এসে দেখি...'

'ডাক্তারকে খবর দেয়া দরকার!'

'ডাক্তার এসে আর কিছু করতে পারবে না,' নিজের শান্ত কণ্ঠ শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেল রবিন। আরেকটা চিন্তা এল মাথায়। 'রোজার, মেস হলে তোমাকেও দেখা যায়নি। ডিনারের সময় কোথায় ছিলে?'

'কি বললে?' অন্যমনস্ক হয়ে গেছে যেন রোজার, 'ডিনার? ডিনার তো শেষ হয়নি এখনও। একটা জরুরী কাজ শেষ করার দরকার ছিল। কেন?'

'না, এমনি।'

'তুমি এখানেই থাকো,' গলা কাঁপছে রোজারের। 'আমি গিয়ে আঙ্কেল জেডকে খবর দিই।'

'যাও।'

রোজারকে বেরিয়ে যেতে দেখল রবিন। আর তাকাল না স্টিভের দিকে। আস্তে করে বসে পড়ল দরজার দিকে মুখ করা একটা টুলে।

বিশ্বাস হচ্ছে না আমার! মনে মনেই বলতে লাগল। বিশ্বাস করতে পারছি না!

এমন ভয়ঙ্কর মৃত্যু!

না তাকিয়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারল না। অদ্ভুত এক আকর্ষণ আবার ফিরে তাকাতে বাধ্য করল ওকে।

তাকিয়েই স্থির হয়ে গেল।

আগে কেন নজরে পড়েনি ওটা, ভেবে অবাক হলো। চেনটা যে জায়গায় হুইলে জড়িয়েছে, তার পাকের মধ্যে আটকে আছে জিনিসটা। রক্তে লাল। তবে রবিন জানে, ওটার আসল রঙও লাল।

সেই লাল পালক।

আঠারো

রাতটাকে অতিরিক্ত দীর্ঘ মনে হলো রবিনের। পুলিশ এসেছিল। ভোর তিনটে পর্যন্ত ছিল। ক্যাম্পের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। সকালেই আবার যত তাড়াতাড়ি পারে ফিরে আসবে বলে চলে গেছে। ক্র্যাফটস কেবিনে আরেকবার তল্লাশি চালাবে ওদের সায়েন্টিফিক এক্সপার্টরা।

ওদের ধারণা, ব্যাপারটা অ্যাক্সিডেন্ট। সবাই বিশ্বাস করছে সেকথা। কেবল রবিন বাদে।

আর টেরি।

সকালে নাস্তা করতে যাওয়ার সময় তার হাত খামচে ধরল টেরি, চোখেমুখে অনিদ্রার ছাপ। কুৎসিত ভঙ্গিতে বলল, 'স্টিভ চলে যাওয়াতে তো খুশিই হয়েছ তুমি, তাই না?'

হাতটা ছাড়িয়ে নিল রবিন। 'খুশি হব কেন?'

'হয়েছ,' জোর দিয়ে বলল টেরি। 'এত লোক থাকতে স্টিভের ডেডবডিটা খুঁজে বের করলে গিয়ে তুমি, ইনটারেস্টিং না?'

'ও আমার সিনিয়র কাউন্সেলর। ডিনারে ওর আসার দেরি দেখে চিন্তা লাগছিল।'

'তাই নাকি? স্টিভের জন্যে চিন্তা! ক্যাম্পের সবাই জানে, ওকে তুমি দেখতে পারতে না।'

'মোটেও ঠিক না কথাটা!' চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও উঠল না রবিন। 'বনাবনি হচ্ছিল না এটা ঠিক, তাই বলে ও মরে যাক, দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি আমি।'

হাসি ফুটল টেরির মুখে। এত বিশ্রীভাবে যে হাসতে পারে কেউ, টেরিকে না দেখলে বুঝবে না। 'ক্র্যাফটস কেবিনে স্টিভের পেছনে তার ওপর ঝুঁকে থাকতে দেখেছে তোমাকে রোজার। লাশের দিকে তাকিয়ে ছিলে।'

'তাতে কোন্ মহাভারতটা অশুদ্ধ হয়েছে? লাশটা দেখে চমকে গিয়েছিলাম। যে কেউই যেত।' বলে আর দাঁড়াল না সেখানে। থাকলেই তর্কাতর্কি, এক কথা থেকে দু'কথা, শেষে গণ্ডগোল। এমনিতেই যথেষ্ট ঝামেলার মধ্যে রয়েছেন আঙ্কেল জেড। তাঁর সমস্যা আর বাড়াতে চায় না।

তার নিজের মনমেজাজও ভাল না, সকাল বেলাতেই আরও খিঁচড়ে দিল টেরি। শয়তানটা কি ইঙ্গিত করেছে, বুঝতে অসুবিধে হয়নি। বোঝাতে চেয়েছে, যেহেতু স্টিভের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল ছিল না, সে-ই খুন করেছে ওকে। রবিন জানে, টেরি সেটা নিজেও বিশ্বাস করে না। তারপরেও তাকে রাগানোর জন্যে, অপদস্থ করার জন্যে সারা ক্যাম্পে গুজব ছড়িয়ে দেবে। সবাই সন্দেহের চোখে তাকাতে থাকবে রবিনের দিকে। বিষময় করে তুলবে ওর পরিবেশ।

তবে একটা কথা টেরি ঠিকই বুঝতে পেরেছে, স্টিভের মৃত্যুটা দুর্ঘটনা নয়। কি করে আঁচ করল সে? জানে নাকি কিছু?

ঘটনাটা যে দুর্ঘটনা নয়, পুলিশকে বোঝাতে হবে সেটা। বিশ্বাস করাতে হবে।

*

পুরো বিশটা মিনিট আঙ্কেল জেডের অফিসের বাইরে কাঠের চেয়ারে বসে থাকতে হলো রবিনকে, তারপর মোলায়েম কণ্ঠে ডাক এল ভেতর থেকে, 'এসো।'

ঘরে ঢুকে দেখল, অতিরিক্ত লম্বা, ফ্যাকাসে চামড়া আর কালো চুলওয়ালা

এক লোক ঝুঁকে আছে আঙ্কেল জেডের টেবিলে রাখা কাগজের স্তূপের ওপর। রবিনের সাড়া পেয়ে মাথা তুলল, 'রবিন মিলফোর্ড? আমি ইন্সপেক্টর নটিং। আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'কাল রাতে ডিটেকটিভ ওকালসনের সঙ্গে কথা বলেছি। বার বার কেবল একটা কথাই জানতে চাইলেন–স্টিভকে কি অবস্থায় দেখেছি। অন্য কোন কথাতেই ইনটারেস্টেড মনে হলো না তাঁকে। অন্য কোন কথাই শুনতে চাইলেন না। আমি আপনাকে সেসব কথা জানাতে চাই।'

রবিনের ওপর স্থির হলো ইন্সপেক্টরের দৃষ্টি। 'কি কথা?'

বলতে লাগল রবিন। ঘন ঘন অ্যাক্সিডেন্ট, লাল পালক, ক্যাম্পের ক্ষতি করার চেষ্টা–এ পর্যন্ত এসে খেয়াল করল, তার কথায় কান নেই ইন্সপেক্টরের।

অহেতুক আর মুখ খরচ না করে থেমে গেল রবিন।

'পালক,' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল ইন্সপেক্টর, 'ঠিক আছে, তদন্তের সময় খেয়াল রাখব কথাটা।'

রবিন বুঝল, তার কথার কোন গুরুত্বই দেয়নি নটিং।

'দেখুন,' বোঝানোর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল রবিন, 'হয়তো বলবেন, সবখানেই তো পালক ছড়িয়ে আছে, আরও দু'চারটা বাড়তি পালকে কি এসে যায়? কিন্তু বিশ্বাস করুন, এসে যায়...'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল নটিং। সহানুভূতির সুরে বলল, 'তোমার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছি, রবিন। ওরকম একটা লাশ আবিষ্কার যে কোন মানুষের রাতের ঘুম হারাম করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট, আর তুমি তো...' ছেলেমানুষ শব্দটা আর উচ্চারণ করল না। 'যাই হোক, তোমার কথা মাথায় রাখব আমি। তবে আপাতত স্টিভের মৃত্যুটাকে অ্যাক্সিডেন্ট হিসেবেই দেখছি আমরা।'

'এ আর নতুন কোন্ কথা হলো?' বলতে ইচ্ছে করল রবিনের, বলল না। বলল, 'বাকিগুলোও কি তাহলে দুর্ঘটনা? কেবিনেটের বল্টু খুলে যাওয়া, ক্যানু ফুটো করে রাখা...'

'সবই সন্দেহজনক। কিন্তু পুলিশের কিছু নিয়ম-কানুন আছে, ঝট করে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। নিতে হলে জোরাল প্রমাণ দরকার। সেটারই খোঁজ করব আমরা এখন থেকে। তুমিও চোখকান খোলা রেখো। কোন কিছু জানতে পারলে নির্দ্বিধায় ফোন কোরো আমাকে।'

মুখে যা বলছে, মনে মনে তা বলছে না ইন্সপেক্টর, বুঝতে অসুবিধে হলো না রবিনের। ওর কথা বিশ্বাস করছে না এই লোকটাও। করার কোন ইচ্ছেও নেই।

একমাত্র ভরসা এখন আঙ্কেল জেড। রেক রূমে কাজে ব্যস্ত তিনি। লাল পালকের উদাহরণ দিয়ে আরেকবার তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করল রবিন। কিন্তু বিরক্তই হলেন এবার তিনি। হাবেভাবে বা কথায় যদিও সেটা প্রকাশ করলেন না।

'রবিন,' ইন্সপেক্টর নটিঙের মত একই সুরে প্রায় একই কথা বললেন

তিনি, 'স্টিভকে ওভাবে দেখে ফেলাটা একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা, মনের ওপর চাপ পড়েছে তোমার। ভুলতে চেষ্টা করো চেহারাটা।...স্টিভের জায়গায় তোমার কেবিনে টেরিয়ার ডয়েলকে বহাল করে দিয়েছি।'

হাঁ হয়ে গেল রবিন, 'কাকে বহাল করেছেন?'

'টেরিয়ার ডয়েল। তোমার জন্যে খুব দুশ্চিন্তা করছিল। খুব ভাল ছেলে। খেয়াল রাখবে তোমার। তা ছাড়া গতবার কাজ করে গেছে এখানে, যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, সিনিয়র কাউন্সেলর হওয়ার উপযুক্ত।'

'আঙ্কেল জেড,' মরিয়া হয়ে বলল রবিন, 'টেরির সঙ্গে এক কেবিনে থাকতে পারব না আমি। ওকে ছাড়া আর কেউ কি নেই দেয়ার মত?'

'বাকি যারা আছে তাদের মধ্যে টেরিই সবচেয়ে কাজের লোক। রবিন, তোমার ব্যাপারটা কি বলো তো? কারও সঙ্গেই বনতে পারছ না। ক্যাম্পের অবস্থা এখন যে পর্যায়ে গিয়েছে, লোক বাছাবাছি করার সুযোগই নেই। তোমার কল্পিত সমস্যাগুলো যদি খালি মন থেকে তাড়াতে পারো, ভাল থাকবে।'

রাগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে রবিনের। সেই সঙ্গে জেদ। চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে পারলে এখন খুশি হত, কিন্তু তাতে শত্রুদেরই জয় হবে। 'দেখো মামা,' ফর্মালিটি ভুলে গিয়ে আসল পরিচয়ে চলে এল সে, 'মুখে যতই দুশ্চিন্তার ভান করুক, আসলে টেরি আমাকে দেখতে পারে না। রকি বীচে আমাদের যে কী শত্রুতা...'

'এটা রকি বীচ নয়!' ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল আঙ্কেল জেডের। 'দেখছ না, কাজে ব্যস্ত আমি? কি পরিমাণ কাজ চেপে আছে আমার ঘাড়ে? ঠিক আছে, এখানে থাকতে ভাল না লাগলে তোমাকে বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। লোক কমে যাবে আরকি আমার, এমনিতেই একজন গেল, তার ওপর আরেকজন...গেলেও কিছু করার নেই। স্পেশাল কিছু করা যাবে না তোমার জন্যে। বাড়িই তো যেতে চাও? নাকি?'

'না,' শীতল কণ্ঠে জবাব দিল রবিন, 'এর শেষ না দেখে যাচ্ছি না আমি এখান থেকে!'

বিড়বিড় করে বলল শেষ কথাটা। মনে হয় বুঝতে পারেননি আঙ্কেল জেড। বললেন, 'গুড। মাথা থেকে অতিকল্পনাগুলো ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ঠিকমত কাজ করোগে। কোন সমস্যা থাকবে না আর।'

উনিশ

'তারপর কি হলো, একটা বিশাল সাদা হাত চিলেকোঠা থেকে লাফ দিয়ে পড়ে তাড়া করল মেয়েটাকে,' গল্প বলছে ডবি।

'কি বললে? হাত?' শিস দিয়ে উঠল ল্যানি। ব্যঙ্গ করে হাসল। 'গুল মারার আর জায়গা পেলে না। হাত কাউকে তাড়া করতে পারে নাকি?'

'তা, তাড়াটা করল কিভাবে?' ববও হাসছে। 'মাকড়সার মত হামাগুড়ি দিয়ে, নাকি উড়ে উড়ে?'

'গল্পটা শেষ করতে দেবে তো আমাকে, না কি?' রেগে উঠল ডবি। একজোড়া নকল শ্বদন্ত লাগিয়েছে সে ড্রাকুলার মত, কথা বলতে গেলে জিভ আটকায়, বাতাস বেরিয়ে যায়, শব্দগুলো শোনায় বিকৃত।

বিরক্ত লাগছে রবিনের। এ সব ভূতের গল্প ভাল লাগে না ওর।

রাতের খাওয়ার পর অগ্নিকুণ্ড ঘিরে গল্প বলার আসর বসেছে। ভূতের গল্প। আঙ্কেল জেডকে বলে প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে ডবি। যে সবচেয়ে ভয়ের গল্পটা বলতে পারবে, সে পুরস্কার পাবে।

বাস্তব ভয়ের নাটক চলছে যে ক্যাম্পে সেখানে এ সব ছেলেমানুষী কাণ্ড ভাল লাগছে না রবিনের। কিন্তু প্রতিবাদ করেনি সে।

বরং ভাল হয়েছে তার জন্যে। সবাই গল্প শোনায় মশগুল থাকবে, ওর দিকে নজর থাকবে না কারও, এই সুযোগে খানিকক্ষণের জন্যে উধাও হয়ে যেতে পারবে সে।

ডবি, ল্যানি আর রোজারের ঘরে ঢুকে তল্লাশি চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। সূত্র দরকার তার। যে কোন সূত্র, যেটা থেকে স্টিভের মৃত্যু রহস্য ভেদ করা যায়।

আগুন ঘিরে বসা মানুষগুলোর ওপর চোখ বোলাল আরেকবার। গল্প বলা প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়নি রোজার। বাকি কাউন্সেলররা মনোযোগ দিয়ে ডবির গল্প শুনছে। হাসছে। খুঁত ধরছে। ওদের কাছ থেকে সরে বসেছে রবিন।

একটু একটু করে সরে যেতে লাগল সে। তাড়াহুড়া করল না। তাতে কারও নজরে পড়ে যেতে পারে।

'কোথায় যাচ্ছ?'

চমকে উঠল রবিন। মিস হয়ে গেল একটা হার্টবিট। বব।

একবার ভাবল, সত্যি কথাটাই বলে দেয় ববকে। কিন্তু পরক্ষণে বাতিল করে দিল ভাবনাটা। ববও তার কথা বিশ্বাস করেনি। ওকে বলে লাভ হবে না। তা ছাড়া সে-ই বা ওকে এত বিশ্বাস করতে যাবে কেন? ল্যানিকে তো করেছিল। ফলটা কি দাঁড়িয়েছে?

'সোয়েটার আনতে যাচ্ছি কেবিনে,' মিথ্যে বলে দিল রবিন। 'শীত লাগছে।'

সোজা কেভিন ফাইভের দিকে রওনা হলো সে। যখন অগ্নিকুণ্ডটা আর দেখা গেল না, কেবিন ঘুরে এসে অন্য দিকে মোড় নিল। ডবি আর রোজার থাকে কেবিন নাইনে, বনের কিনারে। সেদিকে এগোল সে।

পুরো অন্ধকার হয়ে আছে কেবিনটা। ওর পেছনে একটা পেঁচা ডাকল। বনের মধ্যে কাছেই খসখস শব্দ করছে কিসে যেন। আবার মনে হলো সেই বাদুড়টার কথা। গায়ে কাঁটা দিল ওর। সব কিছু বাদছাদ দিয়ে আগুনের কাছে ফিরে যাবার কথা ভাবল একবার।

কিন্তু দমন করল ভয়টা। হাল ছাড়বে না কোনমতে। সে জানে, সময়

ফুরিয়ে আসছে। স্টিভ মারা গেছে। এগিয়ে আসছে বিপদ। এরপর কার পালা? ওর নিজের?

উত্তেজিত স্নায়ুগুলোকে শান্ত করার জন্যে ভারী দম নিল সে। এগিয়ে চলল আবার। কেবিনের দরজার সামনে এসে পকেট থেকে ছোট টর্চ বের করল। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে দরজা খোলার চেষ্টা করল।

কিন্তু মৃদু কিচকিচ শব্দ হয়েই গেল কব্জার। নীরবতার মাঝে সেটাই বেশি হয়ে কানে বাজল। কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল একটা মুহূর্ত। তারপর পা রাখল অন্ধকার কেবিনে। চারপাশে আলো ফেলে দেখতে লাগল। কেবিন ফাইভের মত একই ভাবে সাজানো।

ক্যাম্পারদের বাংক একধারে, কাউন্সেলরদের আরেক ধারে।

কাউন্সেলরদের বাংকে আলো ফেলল সে। ডবির কোনটা? বাংকের ওপরে ফেলে রাখা বিকট মুখভঙ্গি করে থাকা গরিলার মুখোশটা দেখে বুঝতে পারল, কোন্‌টা।

ডবির বাংকের কাছে এসে দাঁড়াল সে। ছোট্ট কেবিনেটের ড্রয়ার খুলল টান দিয়ে।

ভেবেছিল, ডবির সব কিছু বড়ই অগোছাল অবস্থায় দেখতে পাবে। কিন্তু সুন্দর করে সাজানো রয়েছে সমস্ত জিনিসপত্র। শার্ট, আন্ডারওয়্যার সব ভাঁজ করে একটার ওপর আরেকটা রাখা। নিচে কি আছে, কাপড়গুলো উঁচু করে দেখল। কিছু নেই।

তারপরের ড্রয়ারটাতেও একই ভাবে কাপড় রাখা। সবচেয়ে নিচের ড্রয়ারটাতেও কাপড়। রবারের সেই সবুজ সাপটা রয়েছে। চেনা জিনিস। ভয় পেল না সে।

ডবির শয়তানি করার সমস্ত জিনিস রয়েছে এই ড্রয়ারটাতে—মুখোশ, রবারের পোকা-মাকড়, একটা ফাঁস আর আরও কিছু টুকিটাকি জিনিস। সবুজ সাপটা বাদে বাকি সব জিনিসই ব্যাগ অথবা বাক্সে ভরে রাখা হয়েছে। ওপরে লেবেল লাগানো। হাত দিলেই যাতে পেয়ে যায়।

দুটো বাক্স খুলে দেখল। ওপরে যা লেখা রয়েছে, ঠিক তা-ই রয়েছে ভেতরে, ফাঁকিঝুঁকি নেই; একটা রবারের মাকড়সা, একটা সবুজ পরচুলা, আর এক ধরনের পাউডার—চামড়ায় লাগলেই চুলকাবে।

বাংকের ওপর রাখা মুখোশটা, কেবিনেটের ওপরে এক বাক্স স্টেশনারি আর পেপারওয়েট চাপা দেয়া কিছু খাম বাদে সমস্ত জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা হয়েছে কেবিনেটের ভেতরে। ডবি যে এতটা গোছানো স্বভাবের ছেলে, কে ভাবতে পেরেছিল! আরও কয়েক মিনিট খোঁজাখুঁজি করল রবিন। সন্দেহজনক কিছু পেল না।

ডবি শেষ।

তারপর? রোজারের কেবিনেট?

ঘড়ি দেখল। অস্বস্তি বোধ করছে। বিশটা মিনিট পার করে দিয়েছে একজনের জিনিসপত্র খুঁজতেই। এখনও হয়তো তার ভূতের গল্প চালিয়ে যাচ্ছে

ডবি। ভালই। চালাতে থাকুক। ততক্ষণ কেউ আগুনের কিনার থেকে নড়বে না। তবে সে যা ভাবছে, সেটা না-ও হতে পারে।

অত ভাবলে কাজ করতে পারবে না। রোজারের কেবিনেটটায় খুঁজতে শুরু করল সে। ডবির কেবিনেটের মতই এটারও ওপরের দুটোতে কাপড়-চোপড় ভরা। তবে গোছানো তো নয়ই, ডবির একেবারে উল্টো, জট আর তালগোল পাকানো। মোজা, আন্ডারওয়্যার, শার্ট এ সবের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে খুঁজল প্রথমে। পাওয়া গেল না কিছু।

নিচের ড্রয়ারটার অবস্থাও একই রকম অগোছাল। দড়ি, সুইমিং গগলস, কয়েকটা পেপারব্যাক বই, খুদে লাল সাদা টাইল্‌স্ বসানো ছোট একটা কাঠের বাক্স, সব এলোমেলো হয়ে আছে।

বাক্সটা তুলে নিয়ে টর্চের আলোয় ভাল করে দেখতে লাগল সে। এ রকম জিনিস আর দেখেনি। কোথায় পেল এটা রোজার? ডালা খোলার চেষ্টা করল। পারল না। আটকে আছে। তারপর বাক্সের সামনের দিকে খুদে তালার ফুটোটা চোখে পড়ল।

চাবিটা কই?

বাকি ড্রয়ারগুলোতে দ্রুত আরেকবার হাত চালিয়ে দেখল। পাওয়া গেল না।

টিভিতে দেখা গোয়েন্দা গল্প নিয়ে বানানো সিনেমাগুলোর কথা মনে পড়ল। একটাতে দেখেছে, ভিলেন জরুরী একটা চাবি ড্রয়ারের নিচে টেপ দিয়ে আটকে রেখেছে। রোজারও সেভাবে রেখেছে কিনা খুঁজে দেখল। পেল তো না-ই, বরং আঙুলে একটা কাঠের চটার চোখা মাথা গেঁথে গিয়ে যন্ত্রণা বাড়াল।

কেবিনেটে কিছু না পেয়ে রোজারের বাংকের দিকে নজর দিল সে। তলায় হাত বোলাতে গিয়ে শক্ত, ধাতব কি যেন আঙুলে বাধল। টেপ দিয়ে আটকানো।

উত্তেজনায় হাত কাঁপতে শুরু করল তার। টান দিয়ে খুলে নিয়ে এল জিনিসটা। খুদে একটা চাবি।

রোজারের বিছানায় বসে বাক্সের ফুটোতে চাবিটা ঢুকিয়ে দিল সে। মোচড় দিতে যাবে, হঠাৎ শোনা গেল পায়ের শব্দ। স্থির হয়ে গেল সে।

শব্দটা এগিয়ে আসছে।

লুকানোর জায়গা খুঁজে পেল না রবিন। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। ফ্যাকাসে চাঁদের আলোর পটভূমিতে দরজায় দাঁড়ানো ছায়ামূর্তিটাকে চিনতে অসুবিধে হলো না তার।

রোজার!

বিশ

ঘরে ঢুকল রোজার। ওপর দিকে হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল। তারপর টিপে দিল সুইচ। দেখে ফেলল রবিনকে।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল রবিনের দিকে। রাগ ফুটল চেহারায়। 'এখানে ঢুকেছ কেন?'

'আ-আমি…একটা জিনিস হারিয়েছি…' প্রথমেই যে কথাটা মাথায় এল বলে দিল রবিন।

'এখানে হারিয়েছ?' রোজারের কণ্ঠে অবিশ্বাস।

'না, এখানে না।…আমার মনে হলো ডবি হয়তো পেয়েছে…সেজন্যে খুঁজছিলাম।'

'চুরি করে? ডবির বাংক তো ওটা,' হাত তুলে দেখাল রোজার।

'তুমি আগুনের কাছ থেকে চলে এলে কেন?' অন্য কোন কথা যেন খুঁজে পেল না রবিন।

'একজন ক্যাম্পার অসুস্থ হয়ে পড়ল। ওর কেবিনে পৌঁছে দিয়ে এলাম। কিন্তু সে-কৈফিয়ত আমি তোমাকে দিতে যাব কেন?'

'আমি যাই।'

'আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও, এত তাড়াহুড়া কিসের,' দরজা আটকে দিল রোজার। 'আগে বলে তো যাও, আমাদের কেবিনে কেন ঢুকেছিলে তুমি?'

'আমি…আমি…' থেমে গেল রবিন। বুঝতে পারছে, কোন কথা বলেই বোঝাতে পারবে না; যা বলবে সেটাই খোঁড়া যুক্তি হয়ে যাবে। কারণ রোজারের বাক্সটা এখনও হাতে রয়েছে তার।

'কি, থামলে কেন? তোমাকে বলতে হবে, কেন ঢুকেছ। আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করার জন্যে তোমার মামা পাঠিয়েছে নাকি? সেজন্যেই সারাক্ষণ ছোঁকছোঁক করে বেড়াও? আঙ্কেল জেডের চর?'

'না না, তিনি এ সবের কিছুই জানেন না!' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। 'আমি দুঃখিত। আমি তোমাদের কেবিনে খোঁজাখুঁজি করতে এসেছিলাম।'

'কি?'

'আমি নিজেই জানি না।' রেক রুমে আঙ্কেল জেডের ওপর কেবিনেট ধসে পড়া থেকে শুরু করে স্টিভের মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারগুলোকে যে সন্দেহের চোখে দেখছে এটা জানিয়ে বলল রবিন, 'আমি শিওর, ক্যাম্পটা ধ্বংস করে দিতে চাইছে কেউ। কে, জানি না। সেটাই খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি।'

বিছানার ওপর বসে পড়ে রবিনের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল

রোজার, যেন ভিন্ন কোন গ্রহ থেকে নেমে এসেছে রবিন। 'এতটাই যদি সন্দেহ তোমার, পুলিশকে জানালে না কেন?'

'জানিয়েছি। বহু চেষ্টা করেছি বিশ্বাস করানোর, কানেই তুলল না ওরা। তখন ভাবলাম, যা করার আমাকেই করতে হবে।'

'আর তোমার সন্দেহের তালিকায় আমিই এক নম্বরে?'

'না, তা না। আমার প্রথম সন্দেহ ছিল ডবি। কিন্তু ওর বাংকে বা ড্রেসারে কিছু পেলাম না।'

'তালা দেয়া বাক্সটাতেও কিছু নেই, না?' ব্যঙ্গ করল রোজার।

'দেখো, রোজার, সত্যি আমি দুঃখিত,' বাক্সটা রোজারের হাতে তুলে দিল রবিন। 'আমাকে মাপ করে দাও।'

বেরিয়ে যেতে চাইল রবিন, আবার বাধা দিল রোজার। 'দাঁড়াও।'

'সরি বললাম তো, আর কি?'

সামনে থেকে নড়ল না রোজার।

এই যেন প্রথম লক্ষ করল রবিন, রোজার কতটা লম্বা-চওড়া, বিশালদেহী। শীতল দৃষ্টি। ভয় পেল রবিন।

স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে রোজার। ধীরে ধীরে বদলে গেল মুখের ভাব। 'যেতে দেব, তবে আমাকে কথা দিতে হবে আর কখনও আমার ওপর নজর রাখবে না।'

'রাখব না।'

ঘুরতে গেল রবিন। খপ করে তার কব্জি চেপে ধরল রোজারের কঠিন আঙুল, 'আর শোনো, এখানে যে ঢুকেছিলে, আমার জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছিলে সেটা কোনদিন কাউকে বলতে পারবে না। যদি বলো, ভাল হবে না। কতটা খারাপ হবে, সেটা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। বুঝেছ?'

*

অন্ধকার রাস্তা ধরে হাঁটছে রবিন। রোজার স্টিভকে খুন করেছে, এটা কখনোই মাথায় আসেনি তার। কিন্তু এখন আর সন্দেহ না করে পারছে না। বাক্সটা নিয়ে এ রকম রহস্যময় আচরণ করল কেন রোজার? বনের মধ্যে তাকে দেখে চমকে গিয়েছিল কেন? হাত আড়াল করে কি লুকাতে চেয়েছিল?

ডবির ব্যাপারেও নিশ্চিত হতে পারছে না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সে একটা ভাঁড়। কিন্তু যতটা বোকাসোকা আর নিরীহ মনে হয় তাকে, ততটা বোধহয় নয় সে। অতিরিক্ত ভাঁড়ামিটা চালাকিও হতে পারে। আসল জিনিস গোপন করার চেষ্টা। সিরিয়াস কোন ব্যাপারে যাতে তাকে সন্দেহ না করে কেউ।

হঠাৎ মনে হলো কেউ তাকে অনুসরণ করছে। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল রবিন। গাছপালা আর চাঁদের আলোর সৃষ্টি করা বিচিত্র ছায়া ছাড়া কিছু চোখে পড়ল না।

কেবিন ফোরটিনের পাশ দিয়ে চলে গেছে রাস্তাটা। ওটাতে ল্যানি আর এরিক থাকে। দরজাটা খোলা। রাস্তায় এসে পড়েছে হলদে আলো। উঁকি দিয়ে

দেখল, টেবিলে বসে পিঠ কুঁজো করে লিখছে ল্যানি।
সরে আসতে যাবে, হঠাৎ চোখে পড়ল জিনিসটা। লাল রঙের।
থমকে দাঁড়াল সে। তাকিয়ে রইল স্থির দৃষ্টিতে।
ল্যানির টেবিলের ওপরে ঝোলানো একটা সুন্দর ঝাড়ন। লাল পালকে তৈরি।

একুশ

'কি বলবেন, জানো কিছু?' একটা সুইট রোলে কামড় বসাল বব। চোখে এখনও ঘুম।
মেস হলে ওর পাশে বসেছে রবিন। 'আমি জানব কি করে? আমিও তো তোমার মতই ঘুম থেকে উঠে এলাম।'
এত ভোরে কাউন্সেলরদের জাগিয়েছেন আঙ্কেল জেড, স্পেশাল মীটিঙে বসার জন্যে।
ডিম আর মাংস ভাজার সুগন্ধ আসছে রান্নাঘর থেকে। খিদেটা চাগিয়ে উঠল রবিনের।
টেবিল ঘিরে বসেছে অন্য কাউন্সেলররা। সবার চোখেই ঘুম। চুপচাপ ডোনাট আর প্যাস্ট্রি খাচ্ছে, কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে।
'কি জন্যে ডাকা হয়েছে, আমি জানি,' জোরে জোরে বলল ডবি, 'আমাকে সবচেয়ে জনপ্রিয় কাউন্সেলর ঘোষণা করা হবে।'
'তা তো বটেই,' মুখ বাঁকাল ল্যানি, 'এরপর হয়তো খবর শোনাবে বৃহস্পতি গ্রহে মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে।'
'সত্যি বলছি।'
'জীবনে কখনও সত্যি কথা বেরিয়েছে তোমার মুখ দিয়ে?'
ওদের বাকবিতণ্ডা কানে এলেও তাকাচ্ছে না রবিন। কি বলার জন্যে আঙ্কেল জেড এই জরুরী মীটিং ডেকেছেন, সে-সম্পর্কে কোন ধারণা নেই তার, তবে এটুকু বুঝতে পারছে সুখবর কিছু হবে না।
ধীর পায়ে মেস হলে ঢুকলেন তিনি। বিধ্বস্ত লাগছে। সারা রাত ঘুমাননি, বোঝা যাচ্ছে। চোখের চারপাশ ঘিরে কালি। মুখ শুকনো, ফ্যাকাসে।
'এত ভোরে ঘুম ভাঙাতে হলো, সরি,' কাউন্সেলরদের সবার ওপর চোখ বোলালেন তিনি। কণ্ঠস্বরটাও ক্লান্ত, পরাজিত। 'মাত্র কয়েকটা মিনিট কথা বলব তোমাদের সঙ্গে, গত কদিনে যা যা ঘটেছে সেটা নিয়ে।' একটা কাপে কফি ঢেলে চুমুক দিলেন। বিস্বাদ লাগায় মুখ বাঁকালেন। 'যা ঘটেছে, সেটা কারও দোষে নয়; কিন্তু তোমরা জানো এই ক্যাম্পের অবস্থা–একটা সুতোয় ঝুলছিল আগে থেকেই, কোনমতে টিকিয়ে রেখেছিলাম। স্টিভের মৃত্যু সেটাকে এক ভীষণ নাড়া দিয়ে গেছে। টেকার সম্ভাবনাটা একেবারেই ক্ষীণ হয়ে

গেছে এখন...' থামলেন তিনি। আরেকবার কাপে চুমুক দিলেন। 'আমি তোমাদের ডেকেছি, বলার জন্যে...যে কোন সময় ক্যাম্প বন্ধ করে দিতে হতে পারে আমাকে। সেজন্যে তৈরি থাকবে।...সহজে হাল ছাড়ব না আমি। তবে তোমাদের সাহায্য ছাড়া কিছু করতে পারব না। সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চেষ্টা করলে হয়তো ক্যাম্পটা বেঁচেও যেতে পারে এ যাত্রা।' রবিনের দিকে তাকালেন তিনি।

'ঘরের বেড়া কাটছে যে ইঁদুরটা,' মনে মনে বলল রবিন, 'তাকে খুঁজে বের করতে না পারলে কোন লাভ হবে না।'

স্তব্ধ হয়ে আছে কাউন্সেলররা। কথা খুঁজে পাচ্ছে না কেউ। আঙ্কেল জেডের এতটা ভগ্নদশা আর দেখেনি।

'আমার কথা শেষ। নাস্তা খাও। ক্যাম্পারদের নিয়ে আনন্দ করার জন্যে আরেকটা সুন্দর দিন কাটানোর জন্যে তৈরি হও।'

আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত হল থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

যতক্ষণ তাঁকে দেখা গেল তাকিয়ে রইল রবিন। মামার দুঃখে মনটা ভার হয়ে গেল। ক্যাম্পটা তাঁর জন্যে যে কতখানি, তার মত কেউ জানে না।

খাওয়ার রুচি নষ্ট হয়ে গেল তার। দুই কাপ কফি নিয়ে মেস হল থেকে বেরিয়ে রওনা হলো মামার অফিসের দিকে। দরজা খোলা। ডেস্কে বসে ছাতের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি।

'মামা!' সবাই জেনে গেছে ওদের সম্পর্ক, আর লুকোছাপা করার কোন যুক্তি নেই, বরং করতে যাওয়াটা হাস্যকর।

চোখ নামালেন তিনি। ক্লান্ত, বিষণ্ণ হাসি ফুটল মুখে। 'প্রিন্স?'

'মামা, তোমার জন্যে কফি নিয়ে এলাম।'

'আয়, বোস।'

কাপ দুটো টেবিলে নামিয়ে রাখল রবিন। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

নীরবে কফির কাপে চুমুক দিতে লাগল দুজনে।

'এইমাত্র যা বলে এলে, শুনে খুব খারাপ লাগছে আমার, মামা,' অবশেষে কথা বলল রবিন।

কাঁধ ঝাঁকালেন আঙ্কেল জেড। 'সত্যি কথাটাই জানিয়ে এলাম। লোনের জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম, পেয়েও যেতাম হয়তো—কিন্তু স্টিভের মৃত্যু সেটাকে আটকে দিল। এ গ্রীষ্মে পাওয়ার আশা শেষ। আর একটা দুর্ঘটনাও যদি ঘটে, ক্যাম্প বন্ধ করে দিতে হবে। ক্যাম্পাররাই আসতে চাইবে না, চালাব কাদের নিয়ে।'

'কিন্তু যা ঘটেছে, দোষটা তো তোমার নয়।'

'ব্যবসার বেলায় দোষগুণ তুলে লাভ নেই। পয়সা খরচ করে লোকে আসবে, যা যা চায় দিতে হবে; না পেলে অন্য কোথাও চলে যাবে, সহজ কথা।'

'কোনভাবেই ওদের বোঝানো যাবে না?'

'তুই নিজের বেলায় হলে কি করতি? ঘন ঘন দুর্ঘটনা ঘটে, জেনেশুনে এ

রকম কোন ক্যাম্পে কি ছুটি কাটাতে যেতি?'

'অন্তত বোঝার চেষ্টা করতাম...'

'না, করতি না। তোর মামার ব্যবসা বলে অন্য ভাবে চিন্তা করছিস। জীবনটা বড় কঠিন জিনিসরে, প্রিন্স,' হঠাৎ আবেগপ্রবণ হয়ে উঠলেন আঙ্কেল জেড। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন ক্ষণিকের জন্যে। 'জায়গাটা প্রথম দেখেই এত পছন্দ হয়ে গিয়েছিল, ভেবেছিলাম জীবনের বাকি দিনগুলো এখানেই কাটিয়ে দেব। যত ব্যবসাই ধরতে গেছি, মার খেয়েছি; ভেবেছিলাম এই একটাতে অন্তত টিকে যাব, কারণ পছন্দসই কাজ, মনপ্রাণ ঢেলে করতে পারব...কিন্তু চিরটাকাল দেখলাম, সব সময় একটা না একটা দুর্ভাগ্য তাড়া করে ফেরে আমাকে।'

'হয়তো এবারেরটা তোমার দুর্ভাগ্য নয়।'

'কি বলতে চাস?'

'তোমার ব্যবসা ঠিকই চলত, উন্নতি করতে পারতে, কেউ যদি বাধা না দিত।'

আবেগ উধাও হয়ে গেল মুহূর্তে। রাগ ফুটল আঙ্কেল জেডের চেহারায়। 'আবার সেই স্যাবোটাজের গল্প ফাঁদবি নাকি?'

'দেখো মামা, প্লীজ, দয়া করে আমার কথাগুলো অন্তত শোনো। আমি প্রমাণ করে দিতে পারব...'

'আগেও শুনিয়েছিস এ সব কথা, আমার যা বলার বলে দিয়েছি তোকে।'

'কিন্তু...'

'কোন কিন্তু নেই। সত্যি কথা বলব? তোর মাথার স্থিরতা নিয়েই সন্দেহ হচ্ছে এখন আমার। গোয়েন্দাগিরি করতে করতে সব কিছুতে রহস্য দেখতে পাওয়াটা রোগ হয়ে গেছে। এক কাজ কর, ক্যাম্পের মধ্যে আটকে না থেকে বেশি বেশি করে ওয়াইল্ডারনেস ট্রিপে যেতে থাক। খোলা জায়গায় গেলে মানুষের মগজ পরিষ্কার হয়ে যায়।'

'সেই কথাটাও বলা দরকার তোমাকে। ওয়াইল্ডারনেস ট্রিপে যাওয়াটাও আমার জন্যে ভাল হবে কিনা...'

'হবে না মানে?' রাগে ষাঁড়ের মত গর্জন করে উঠলেন আঙ্কেল জেড। 'সারা দুনিয়ার পাগলকে ডাক্তাররা পরামর্শ দেয়...'

'আমি পাগল হইনি, মামা!' রবিনও আর রাগটা চেপে রাখতে পারল না। 'আমি শুধু বলতে চাইছি...'

থেমে গেল সে। টেরি, ল্যানি আর ডবিকে যে ভয় পাচ্ছে, এ কথা আর জানাতে চাইল না মামাকে। বলল না, ওরা সঙ্গে যাচ্ছে বলেই ওয়াইল্ডারনেস ট্রিপে যেতে চায় না। বরং আমতা আমতা করে বলল, 'অন্য কাউন্সেলরদের সঙ্গে আমার বনিবনা হয় না তো, তাই...'

'যেতে চাচ্ছিস না, এই তো?' কিছুটা নরম হলো আঙ্কেল জেডের কণ্ঠ। 'কিন্তু মেলামেশা না করলে তো কোনদিনই মানুষের সঙ্গে বনতে পারবি না। শুধু বই নিয়ে বসে থাকলে মুখচোরা স্বভাব কোনকালে দূর হবে না তোর।

আমি কোন কথা শুনতে চাই না আর। স্টিভ মারা গেছে, কদিন আগে হোক পরে হোক, বোটিং কাউন্সেলরের দায়িত্বটা তোকেই নিতে হবে। অতএব জায়গা চিনে আসা দরকার। তোর যাওয়াটা বাধ্যতামূলক।'

'কেবিন ফাইভের মেয়েগুলোকে কে দেখবে?'

'কাল সারাদিনের জন্যে জুনিয়র ফীল্ড ডে'তে যোগ দেয়াতে বলব ওদের। ফীল্ড ডে'র দায়িত্বে আছে জুকাস। দিনটা সে দেখবে, রাতে বব গিয়ে থাকবে পাঁচ নম্বর কেবিনে। সব ভেবে রেখেছি আমি।'

রাগ আর নেই আঙ্কেলের কণ্ঠে। 'প্রিন্স, তোকে এখানে আসতে বলার একটাই কারণ, আমাকে সাহায্য করা–সবাই করবে পয়সার জন্যে, তোর মত মামার জন্যে তো আর করবে না কেউ। আমি আশা করব, এখন থেকে মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করবি তুই। রহস্য খোঁজা বাদ দে।'

'মামার জন্যে করছি বলেই তো এতটা দুশ্চিন্তায় আছি,' না বলে পারল না রবিন। 'নইলে আমার কি? অন্য কাউন্সেলরদের মতই চাকরি করতাম, ক্যাম্প বন্ধ হয়ে গেলে বিনা দ্বিধায় বাড়ি চলে যেতাম।'

বাইশ

পরদিন খুব ভোরে বিছানা ছাড়ল রবিন। ওয়াইল্ডারনেস ট্রিপের জন্যে তৈরি হতে শুরু করল। আগের রাতে ঘুমাতেই পারেনি। গত দুদিনে যা যা ঘটে গেছে ছায়াছবির মত বার বার ভেসে উঠেছে মনের পর্দায়।

দ্রুত পার্কিং লটে চলে এল। ক্যাম্পের ঝরঝরে বাসটায় ক্যাম্পার আর তাদের ব্যাগ-ব্যাগেজ তুলতে সাহায্য করছে টনি। ভাগ্যিস, যেতে হবে মাত্র তিরিশ মাইল। আরও বেশি দূর হলে হোয়াইট রিভারে পৌঁছতে পারত কিনা, সন্দেহ আছে; বাসটার অবস্থা দেখে তা-ই মনে হলো রবিনের।

ওকে দেখে হাসল টনি। 'এসেছ, খুব খুশি হলাম। আমারও সাহায্য হবে, তোমারও উপকার হবে।'

'উপকার' মানে পাগলামি ব্যারামটা যাবে, এটাই বোঝাতে চেয়েছে টনি। কিন্তু রাগ হলো না রবিনের। রহস্যটা যখন ফাঁস হয়ে যাবে, সবার মুখেই চুনকালি পড়বে।

'উপকার-টুপকার বুঝি না। ভাল লাগবে নাকি তাই বলো।'

'এত ভাল, কল্পনা করতে পারবে না। ও, তালিকায় একটা পরিবর্তন হয়েছে। কাল রাতে হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েছে এরিক। তার জায়গায় রোজারকে নেয়া হয়েছে।'

'রোজার!' চমকে গেল রবিন।

'হ্যাঁ,' উদ্বিগ্ন শোনাল টনির কণ্ঠ, 'এরিক অসুস্থ শুনেই ছুটল আঙ্কেল জেডের কাছে। ভঙ্গি দেখে মনে হলো, এমন কিছু একটা ঘটার জন্যেই যেন

দোয়া করছিল সে। এরিকের জায়গায় একজনকে দরকার, রোজার স্বেচ্ছায় যেতে চাইছে, রাজি হয়ে গেলেন আঙ্কেল জেড। কিন্তু আমার ভাল লাগছে না। রোজার নৌকা বাইতে পারে না তেমন। পানিও পছন্দ করে না।'

চট করে রবিনের মনে হলো, রোজারের এত যাওয়ার ইচ্ছেটা শুধু তার জন্যেই। বনের মধ্যে একা কায়দামত পাওয়া যাবে, খুন করাও সহজ...

'রবিন! কি হলো?'

'অ্যাঁ! না, কিছু না। ঘুমটা পুরোপুরি যায়নি এখনও।'

'রোজারকে আমার ক্যানুতে তুলব। আমার সঙ্গে থাকলে কিছুটা হলেও কাজে লাগাতে পারব। তোমার সঙ্গে থাকছে ল্যানি। ঠিক আছে?'

আবার চমকে গেল রবিন। লাল পালকের ঝাড়নটা ভেসে উঠল চোখের সামনে।

নাহ্, মাথাটাই খারাপ হয়ে যাবে! একবার মনে হচ্ছে রোজার খুনী, আবার মনে হচ্ছে ল্যানি...আসলে কোন্ জন?

*

হোয়াইট রিভারে নৌকা চালাতে চালাতে ভেবে অবাক হচ্ছে রবিন, এত তাড়াতাড়ি এতগুলো শত্রু তৈরি করে ফেলল কি করে? অন্য কাউন্সেলররা তার সঙ্গে প্রায় কথাই বলছে না।

বাসে উঠে রবিনকে দেখেই বাঁকা চোখে তাকিয়েছে টেরি। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়েছে, 'নাহ্, বড় নাছোড়বান্দা টিকটিকি। সবখানেই আছে। অ্যাই, সব সাবধান, কার নামে যে কি গিয়ে লাগাবে, কল্পনাও করতে পারবে না! এ বছর আর শান্তি পেলাম না এখানে এসে।'

শীতল দৃষ্টিতে রবিনের দিকে একবার তাকিয়েই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েছে রোজার। ল্যানি এমন ভঙ্গি করেছে, যেন সে তাকে দেখতেই পায়নি। তারপর গিয়ে ঝগড়া বাধিয়েছে টনির সঙ্গে, 'আমাকে টেরির নৌকায় দেয়া হলো না কেন?'

'কারণ আমি মনে করছি কাজটা এ ভাবেই ভাল চলবে,' সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছে টনি। এই ট্রিপের নেতৃত্ব দিচ্ছে সে। সুতরাং সুবিধে করতে পারল না ল্যানি।

*

হোয়াইট রিভার ধরে দাঁড় বেয়ে চলেছে ওরা। আগে আগে চলেছে টনির নৌকাটা। সবার পেছনে রয়েছে রবিন আর ল্যানিরটা। সব ক্যানুতেই দুজন করে কাউন্সেলর রয়েছে, কেবল ক্যাম্পারদের বড় নৌকাটাতে রয়েছে তিনজন। টেরি আর ডবি ক্যাম্পারদের নৌকার পাশে থেকে জোরে জোরে দাঁড় বেয়ে চলেছে। হঠাৎ দাঁড় ফসকে গিয়ে পানিতে পড়ে যাওয়ার ভান করল ডবি। ভয়ে চিৎকার করে উঠল ক্যাম্পাররা। তারপর হাসা শুরু করল।

'তোমার এ সব ভাঁড়ামি থামাও তো!' ডবির বাড়াবাড়িতে টেরিও বিরক্ত হয়ে গেছে।

অবশেষে চুপ করল ডবি। শান্ত হয়ে দাঁড় বাইতে লাগল।

ক্যাম্পাররা পছন্দ করছে ওকে, দেখতে পাচ্ছে রবিন। আগে কেন খেয়াল করেনি এটা, ভেবে অবাক লাগল তার।

সহজ হওয়ার জন্যে ল্যানির সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা করল। পারল না। প্রশ্নের জবাবে কেউ হ্যাঁ-হুঁ আর মাথা ঝাঁকি দিলে কি আর আলাপ জমে।

একবার ঘুরে বসে ল্যানির দিকে তাকিয়ে কথা বলার চেষ্টাও করে দেখেছে। কি যেন বলতে গিয়েও বলেনি ল্যানি। অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

লাঞ্চের সময়ও তার সঙ্গে কোন কথা বলল না ল্যানি। নৌকা থেকে ক্যাম্পারদের নামতে সাহায্য করল। তারপর টেরিদের কাছে গিয়ে বসল একসঙ্গে লাঞ্চ করার জন্যে।

বাকি দিনটাও একই ভাবে কাটল। ল্যানি, টেরি, রোজার তাকে দেখেও দেখল না; ওদের ভঙ্গিতে মনে হলো সে একজন অদৃশ্য মানব। টেরির ধমক খেয়ে খানিকক্ষণের জন্যে চুপ হলেও আবার তার ভাঁড়ামি চালিয়ে গেল ডবি।

শেষ বিকেলে ক্যাম্পসাইটে পৌঁছল ওরা। সবাই ক্লান্ত। ডবি আর কয়েকজন ক্যাম্পারকে নিয়ে লাকড়ি কুড়াতে গেল টনি। বাকিরা ক্যাম্প তৈরিতে ব্যস্ত হলো।

আগুন জ্বালানোর জন্যে গর্ত করছে রবিন। গর্তটা প্রায় শেষ করে এনেছে, এই সময় ফোঁপানির শব্দ কানে এল তার।

জখম হলো নাকি কেউ?

অন্য কাউন্সেলরদের দিকে তাকাল সে। টেরি আর ল্যানি কথা বলছে। রোজার নেই।

লিয়োনেল নামে একটা ক্যাম্পার ছেলেকে গর্তটা শেষ করতে বলে, কে ফোঁপাচ্ছে দেখার জন্যে উঠে গেল সে।

শব্দ কোনদিক থেকে আসছে অনুমান করে হাঁটতে হাঁটতে বনের ভেতর এসে ঢুকল।

অন্ধকার হয়ে আসছে। এতক্ষণে খেয়াল হলো, টর্চ না নিয়ে এসে বোকামি করে ফেলেছে। এই বন তার একেবারেই অচেনা। ঘন গাছপালা। ক্যাম্প গোল্ডেন ড্রীমের চেয়ে অনেক বেশি ঘন। গোল্ডেন ড্রীমে রাস্তা বানিয়ে দু'পাশে চিহ্ন দিয়ে রাখা হয়েছে। এখানে চিহ্ন তো নেইই, রাস্তাও তেমন নেই। বুনো জানোয়ার চলার সরু পথ আছে, তা-ও বেশির ভাগটাই ঘাসে ঢাকা।

কি কি জানোয়ার বাস করে এ বনে? মানুষখেকো নেই নিশ্চয়, আশা করল সে।

ফিরে গিয়ে টর্চ নিয়ে আসার কথা ভাবল।

কিন্তু ফোঁপানিটা বেড়ে গেছে। অসহায় ভঙ্গিতে কাঁদছে কেউ।

কোন একজন ক্যাম্পারই বিপদে পড়েছে। তাকে সাহায্য করতে যাওয়াটা জরুরী। ফিরে যাওয়ার সময় নেই।

নাকি চালাকি? চালাকি করে কেউ তাকে ক্যাম্প থেকে বের করে নিয়ে

এসেছে বনের মধ্যে, একা পেলে···

'রবিন!'

ধড়াস করে এক লাফ মারল রবিনের হৃৎপিণ্ড। কে কথা বলেছে দেখার জন্যে ফিরে তাকাল।

গাছের সঙ্গে প্রায় মিশে দাঁড়িয়ে আছে রোজার। বিলীয়মান আলোয় ফ্যাকাসে লাগছে তার চেহারা। হাতে ইয়া বড় এক ছুরি। অস্পষ্ট আলোতেও চকচক করছে ইস্পাতের ধারাল ফলাটা।

তেইশ

'রোজার!' আতঙ্ক আর বিস্ময়ে কেমন জট পাকিয়ে গেল রবিনের কণ্ঠ।

'আমার মনে রাখা উচিত ছিল, তুমিও আছ!' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'এখানে কি? বলেছি না আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করবে না···'

'গোয়েন্দাগিরি করছি না!' রবিনও রেগে উঠল, ভুলে গেল রোজারের হাতের ছুরিটার কথা। 'কান্না শুনলাম। ভাবলাম কেউ বিপদে পড়েছে। সাহায্য করতে এসেছি।'

'একটা সাহায্যই করতে পারো, ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে বসে বসে নিজের চরকায় তেল দিতে!' ছুরি তুলল রোজার। 'নইলে···'

'রোজার, থামো!' চেঁচিয়ে উঠল একটা মেয়েকণ্ঠ। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ছিপছিপে, সুন্দরী এক কিশোরী। রোজারের হাত চেপে ধরল।

'মলি!' রবিন অবাক। মলি গেটস একজন সিনিয়র ক্যাম্পার। 'তুমি? তুমি এখানে কি করছ?'

'তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, রবিন,' রোজার বলল, 'আমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে আসবে না।' এক কদম আগে বাড়ল সে।

'রোজার, দোহাই লাগে তোমার, থামো!' ছুরিটা ওর হাত থেকে কেড়ে নিল মলি। রবিনকে বলল, 'ওর ব্যবহারে তুমি কিছু মনে কোরো না, রবিন। তোমাকে আসতে শুনে ও মনে করেছে ভালুক, সেজন্যেই ছুরি বের করেছিল।' ছুরিটা ভাঁজ করে রোজারের হাতে দিল সে। পকেটে ফেলল সেটা রোজার।

'কিন্তু তোমরা এখানে কি করছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'এই অন্ধকারে···বনের মধ্যে···আমি শুনলাম কে যেন ফোঁপাচ্ছে···'

'আমি কাঁদছিলাম,' মলি বলল। ভাল করে তাকাতে ওর গালে পানির দাগ দেখতে পেল রবিন। 'রোজার আর আমার মধ্যে···আমরা ঝগড়া করেছি।'

'সরি, মলি,' ওর কাঁধে হাত রাখল রোজার, 'তোমার মনে কষ্ট দিতে চাইনি আমি।'

বুঝে ফেলল রবিন। ক্যাম্পের নিয়ম অমান্য করে গোপনে দেখা করত

ওরা। সেজন্যেই একটা অপরাধী ভঙ্গি থাকত রোজারের চেহারায়।

'ধরা যখন পড়েই গেছি,' তিক্তকণ্ঠে বলল রোজার, 'তোমাকে বলতে আর অসুবিধে নেই। মলির বয়েস পনেরো। আমার আঠারো শেষ হতে চলেছে। স্কুলেই আমাদের পরিচয়। কিন্তু মলির মা-বাবা আমাদের মেলামেশাটা পছন্দ করে না।'

'সুতরাং ক্যাম্পে চলে এসেছ দুজনে, সব সময় যাতে দেখা-সাক্ষাৎ করা যায়, সেজন্যে?' রবিন বলল।

'আর কি করতে পারতাম?' রোজার বলল। 'দুজন দুজনকে ভালবাসি আমরা।' কোমল দৃষ্টিতে মলির দিকে তাকাল সে। আবার ফিরল রবিনের দিকে। 'সেদিনও ক্যাম্পের কাছে বনের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল আমাদের, তুমি যেদিন আমাকে দেখে ফেললে। মলিকে বলেছিলাম এ ভাবে চুরি করে করে আর দেখা করা সম্ভব না আমার পক্ষে। স্নায়ুতে প্রচণ্ড চাপ পড়ে। বললাম, ওর বাবা-মাকে সত্যি কথাটা জানিয়ে দিতে।'

'তারপর?'

'কি করে জানাই, বলো?' যেন রবিনের কাছেই বিচারটা দিল মলি। 'আমার বয়েস কম। বললে রেগে গিয়ে যদি আব্বা আমাকে ঘরে আটকে দেয়, কিছুই করতে পারব না। তারচেয়ে আমি বললাম, আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করতে। কিন্তু ও আমাকে চাপ দিয়েই চলল। শেষে বলল, বাবা-মা আর ওর মধ্যে কোন এক পক্ষকে বেছে নিতে হবে আমাকে। না-না বলে সেজন্যেই চিৎকার করেছিলাম। তোমাকে আসতে দেখে দৌড়ে পালিয়েছিলাম।'

'তোমার চিৎকার শুনেই কি হলো দেখতে গিয়েছিলাম আমি।'

'হাত ধরে থামাতে চেয়েছিলাম ওকে,' রোজার বলল। 'ব্রেসলেটটা পড়ে গেল। ওটাই তুলে নিয়েছিলাম। তুমি দেখে ফেলবে ভেবে পেছনে লুকিয়ে ফেলেছিলাম।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'এজন্যেই এরিকের জায়গায় ট্রিপে আসার জন্যে অস্থির হয়ে গিয়েছিলে তুমি। মলির সঙ্গে সঙ্গে থাকার জন্যে।'

রোজারও মাথা ঝাঁকাল। 'সেদিন বন থেকে ঝগড়া করে চলে যাওয়ার পর আর কথা বলতে পারিনি মলির সঙ্গে। বলার দরকার ছিল। ওকে বোঝানোর জন্যে, আলোচনা করে একটা উপায় বের করার জন্যে।'

'তোমার বাক্সটাতে কি আছে?' জানতে চাইল রবিন।

লাজুক হাসি ফুটল রোজারের মুখে। 'মলি আর আমার একসঙ্গে তোলা কয়েকটা ছবি, আর ওর কিছু চিঠি। ওগুলো কাউকে দেখতে দিতে চাই না আমি।' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল সে। 'খুব খারাপ সময় যাচ্ছে আমাদের। কেউ দেখে ফেললে, ধরা পড়ে গেলে, কি ঘটবে জানি, তবু দেখা না করে পারছি না।

'তোমাকে সব বলে দেয়া উচিত হলো কিনা বুঝতে পারছি না। কিন্তু না বলে করবটা কি? ধরা তো পড়েই গেছি। রবিন, প্লীজ, কাউকে বোলো না।'

'বলব না,' কথা দিল রবিন। 'তবে সাবধান। অন্য কেউ সন্দেহ করে বসলে বিপদে পড়বে। তার কথা শুনে যদি আঙ্কেল জেড আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেন, মিথ্যে বলতে পারব না। তখন আবার বোলো না, মামাকে গিয়ে লাগিয়েছি।'

চব্বিশ

সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখছিল রবিন। ইয়ার্ডে বসে গল্প করছে দুই বন্ধু কিশোর আর মুসার সঙ্গে। সেই পুরানো দিনের মত। যখন 'তিন গোয়েন্দা' গঠনের বুদ্ধিটা সবে মাথায় এসেছে কিশোরের। বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে যাওয়ার জন্যে মতলব আঁটছে কিশোর। শয়তানি করার জন্যে শুঁটকি তার নতুন গাড়িটাতে করে দলবল নিয়ে এসে হর্ন বাজানো শুরু করল। ওরা তিন বন্ধু মিলে আচ্ছা প্যাঁদানি দিয়ে দিল ওদের। কাঁধে ঝাঁকি লেগে ঘুম ভেঙে গেল তার। 'কি...?'

'চুপ!' ঠোঁটে আঙুল রেখে কথা বলতে তাকে নিষেধ করল টনি। মাথার কাছে ঝুঁকে বসে আছে। 'ঘুমাতে ইচ্ছে করলে আরও ঘুমাও,' ফিসফিস করে বলল সে, 'তবে আমি যাচ্ছি নদীটা দেখে আসতে। ক্যাম্পারদের আজ কোন কোন জায়গায় নিয়ে যাব, আগেই দেখে আসিগে। আসবে নাকি? সূর্য ওঠাটা এখানে এত সুন্দর!'

'যাব,' উঠে বসল রবিন।

'এসো। একা একা ক্যানু নিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না। অন্যরা জেগে ওঠার আগেই ফিরে আসব।'

হাত নেড়ে আড়মোড়া ভাঙল রবিন। শক্ত মাটিতে স্লীপিং ব্যাগে শুয়েও গা ব্যথা হয়ে গেছে। টনির আন্তরিকতায় খুশি হলো। কাউন্সেলরদের মধ্যে একমাত্র সে-ই তার সঙ্গে সহজ আচরণ করছে।

দ্রুত দাঁত মেজে, বাথরুম সেরে, মুখ ধুয়ে নদীর কিনারে চলে এল রবিন, যেখানে অপেক্ষা করছে টনি; পুবের পাহাড়ের মাথায় উঁকি দেয়া সূর্যটাকে দেখছে। অর্ধেকেরও কম বেরিয়েছে সূর্য, তাতেই অদ্ভুত লাল আলো ছড়িয়ে দিয়েছে নদীর পানিতে।

'ভোর বেলাটা আমার ভীষণ ভাল লাগে,' টনি বলল। 'নদীর ওপর যেন লাফিয়ে চলতে থাকে আলো, চারদিকটা কেমন ঘোলা করে দেয়; এত আলো অথচ স্পষ্ট করে কিছুই দেখা যায় না। দারুণ লাগে আমার!'

নদীর দিকে তাকাল রবিন। টনির বর্ণনার সঙ্গে মেলে কিনা, বুঝতে চাইল যেন। হাসল। সত্যি সুন্দর।

টনির হাতে বড় এক মগ চা। কয়েকটা চুমুক দিয়ে রবিনের হাতে তুলে দিল। রবিন কয়েক চুমুক দিয়ে মগটা দিল আবার তাকে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে

চলতে থাকল এ ভাবেই।

'তাড়াতাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হবে আমাদের,' টনি বলল, 'ক্যাম্পাররা জেগে যাওয়ার আগেই। ভাটির দিকে যাব। একটা দোমাথা আছে, ওখান থেকে নদীটা দু'দিকে ভাগ হয়ে গেছে।' ম্যাপ বের করে জায়গাটা দেখাল রবিনকে। 'একদিকে স্রোত এতই বেশি, নদীপ্রপাতের সৃষ্টি হয়েছে। দেখতে চাই ওখানে ক্যাম্পারদের নিয়ে যাওয়া নিরাপদ কিনা।'

'নদীপ্রপাত! দারুণ তো!'

ভুরু কুঁচকাল টনি। হাসল। 'তুমিও যে আমার মত প্রকৃতি প্রেমিক, তা তো জানতাম না।'

চা শেষ করে নৌকায় উঠল ওরা। টনি বসল পেছনে। হাল ধরা আর দাঁড় বাওয়ার কাজ দুটোই যাতে করতে পারে। রবিন সামনে। দুজনেই দাঁড় ফেলল পানিতে। এগিয়ে চলল নদীর চওড়া অংশের দিকে।

'ওই যে দেখো,' নদীর কিনারের অন্ধকার হয়ে থাকা একটা জায়গার দিকে হাত তুলল টনি। 'ওখানে মাছ ধরার চমৎকার একটা খাঁড়ি আছে। স্রোতে ভরা নদীর মধ্যে যেখানেই ওরকম শান্ত খাঁড়ি দেখবে, বুঝবে ওখানটায় মাছে ভর্তি। বড় মাছও পাওয়া যাবে।'

বুনো অঞ্চল সম্পর্কে টনির অসাধারণ জ্ঞান, বুঝতে পারল রবিন। সেজন্যেই তাকে ওয়াইল্ডারনেস চীফ বানিয়ে দিয়েছেন আঙ্কেল জেড। আঙ্কেলের সৌভাগ্য, এ বছর টনিকে কাউন্সেলর হিসেবে পেয়েছেন তিনি।

গরমের শুরুতেই প্রচুর বুনো ফুল ফুটেছে। নদীর তীরে তালগোল পাকিয়ে রেখেছে যেন ঝলমলে রঙ। একটা বাঁকের কাছে এসে বনের কিনারে হরিণকে পানি খেতে দেখা গেল।

'উফ্, দারুণ! অপূর্ব!' প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে দম আটকে আসছে রবিনের। 'টনি, কি বলে যে ধন্যবাদ দেব তোমাকে! ভাগ্যিস এখন নিয়ে এসেছিলে!'

'যাক, তোমার ভাল লাগছে দেখে খুশি হলাম।'

দ্রুত ধাবমান পানির ওপর দিয়ে যেন পিছলে চলল ক্যানুটা। সামনে সরু হয়ে আসছে নদী।

'দোমাথার কাছে এসে গেছি,' টনি বলল। 'রেডি হও। কি রকম জোরে ছুটতে থাকব, কল্পনাও করতে পারবে না।'

হঠাৎ যেন এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে ক্যানুটাকে কাছে নিয়ে গেল স্রোত। ঝমঝমে বৃষ্টির মত গায়ে লাগল পানির ফোঁটা। একটা পাশ ভিজে গেল রবিনের। চিৎকার করে উঠল, 'বাপরে! কি সাংঘাতিক!'

'বলেছিলাম না,' হাসছে টনি। 'তবে এ কিছুই না। আসল প্রপাতে পড়ে নিই, তারপর বুঝবে স্রোত কাকে বলে। দাঁড় বাওয়া থামিয়ো না।'

রবিনের সন্দেহ হতে লাগল, টনির সঙ্গে তাল মিলিয়ে দাঁড় বাইতে পারবে কিনা। মুসা পারত। এত সৌন্দর্যের মাঝেও মুসার কথা ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর। ভাবনার মধ্যে থেকেই কোন সময় যে টনির সঙ্গে তাল মিলিয়ে

ফেলেছে, বলতে পারবে না। দেখল, খুব একটা খারাপ বায় না সে। দ্রুত হচ্ছে নৌকার গতি। পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়া তীর দেখে অনুমান করা যায়।

'ক্যাম্প থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি, তাই না?' রবিন বলল। 'উজান বেয়ে ফিরে যেতে অনেক সময় লেগে যাবে। সময় মত যেতে পারব তো?'

'ও নিয়ে চিন্তা কোরো না। কি ভাবে যেতে হবে জানি আমি। এ নদী আমার চেনা।'

'তাই নাকি? আমি তো ভেবেছিলাম ম্যাপ দেখে চলছ তুমি।'

'ওই যে ওই খোলা জায়গাটা দেখছ, ডানে? গত গ্রীষ্মে ক্যাম্প করেছিলাম ওখানে। দুদিন কাটিয়ে গেছি।'

'কিন্তু তুমি না বললে গতবার মরুভূমিতে গিয়েছিলে?'

জবাব দিল না টনি। তারপর আবার যখন কথা বলল, অদ্ভুত বদলে গেল তার কণ্ঠস্বর। 'আসলে আমি করিনি, আমার ভাই ক্যাম্প করেছিল ওখানে। সব জানিয়েছে আমাকে। চিঠিতে। এত নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে, মনে হয়েছে নিজের চোখে দেখেছি সব, নিজেই থেকে গেছি।'

'ও!' কথাটা হঠাৎ মনে পড়ল রবিনের। 'তোমার নাকি ভাইটাই নেই আর?'

আবার চুপ হয়ে গেল টনি। দাঁড় বাওয়ার গতি কমিয়ে দিয়েছে।

'টনি?'

'আগের কথা, কি বলেছি না বলেছি, ভুলে যাও!'

টনির কণ্ঠ শুনে ভড়কে গেল রবিন। ওকেও বিরূপ করে তুলছে না তো? তাড়াতাড়ি বলল, 'সরি, টনি, তোমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। কৌতূহল হয়েছিল, তাই জিজ্ঞেস করলাম।'

'তোমার কৌতূহল তো সব কিছুতেই!' রুক্ষস্বরে জবাব দিল টনি।

চমৎকার! সারা ক্যাম্পে একটিমাত্র লোক, যে তার প্রতি সদয় ছিল, ভাল আচরণ করত, তাকেও দিল বিগড়ে। মানুষের সঙ্গে মেশারই যোগ্য নয় সে—মনে মনে নিজেকে গালাগাল করতে লাগল রবিন।

নীরবে দাঁড় বাওয়া চলেছে। ক্রমেই বাড়ছে স্রোত। সামনে প্রপাতের শব্দ কানে আসছে।

'টনি,' কথা শুরু করার জন্যে বলল রবিন, চুপ করে থেকে স্নায়ুর ওপর চাপ পড়ছে, 'সামনে প্রপাতের শব্দ শোনা যাচ্ছে।'

'তা তো যাবেই। সেখানেই তো চলেছি আমরা,' কাটা কাটা শোনাল টনির কথা। রাগ কমছে না।

'প্লীজ, টনি, তোমাকে রাগানোর জন্যে বলিনি আমি। বেফাঁস কিছু বলে ফেলে থাকলে মাপ করে দাও। তোমার কোন সমস্যা আছে? থাকলে বন্ধু ভেবে বলতে পারো আমাকে।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল টনি। তারপর নতুন, অদ্ভুত আরেক স্বরে বলল, 'আমার সমস্যাটাই হলো আমি বড় অসাবধান।'

বুঝতে পারল না রবিন। 'সেটা আবার কি?'

'তুমিও অসাবধান, রবিন।'

'তোমার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না, টনি।'

জবাব দিল না টনি।

ঘাবড়ে গেল রবিন। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করে দিতে লাগল তাকে। টনির আচরণ ভীত করে তুলল ওকে। 'কি বলতে চাও, খোলাখুলি বলো না।'

'খোলাখুলি? আসার সময় নিশ্চয় কাউকে বলে আসার সুযোগ পাওনি তুমি, তাই না?'

পঁচিশ

রবিনের মনে হলো ভুল শুনছে। এত দ্রুত ঘুরে বসল টনির দিকে, মুহূর্তের জন্যে কাত হয়ে গেল ক্যানুটা। 'কি বলছ?'

'বলছি, তুমিও অসাবধান,' ধীরে ধীরে বলল টনি। 'নইলে আমার সঙ্গে যে এসেছ, কাউকে বলে আসতে।' দাঁড় বাওয়া বন্ধ করে দিল টনি। ওর মুখে উত্তেজনা দেখতে পাচ্ছে রবিন।

কি বলতে চায় টনি? ওর কথার ধরন ভাল লাগছে না। 'বলে আসিনি, তার কারণ, কেউ জাগেনি তখনও। আর দরকারটা কি? তাতে অসাবধানের কি হলো?'

জবাব দিল না টনি। দাঁড় বাওয়াও বন্ধ রেখেছে। আপনগতিতে ইচ্ছেমত ভেসে চলল ক্যানু।

'টনি, ভেসে যাচ্ছে তো।'

'হ্যাঁ।' পানিতে দাঁড় ফেলে আস্তে আস্তে বাইতে লাগল আবার টনি।

কেমন অদ্ভুত ওর কণ্ঠস্বর–মনে হচ্ছে রবিনের–যেন বহুদূর থেকে কথা বলছে। এই কি সেই লোক, কিছুক্ষণ আগেও যে আন্তরিক ছিল ওর সঙ্গে?

'টনি, কি হয়েছে তোমার? বলো না আমাকে। প্লীজ! যে কোন ব্যাপারে বিশ্বাস করতে পারো আমাকে।'

'তোমাকে তো বললামই, আমি খুব অসাবধান। এখন তোমাকেও দেখছি আমার মত। গোল্ডেন ড্রীম ক্যাম্পের দুর্ভাগ্যের কারণ এটাই। বড় বেশি অসাবধান সবাই।'

'তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝতে পারছি না আমি।' অস্বস্তি বাড়ছে রবিনের। কোন ধরনের খেলা খেলছে নাকি ওর সঙ্গে টনি?

'সব অসাবধান!' টনি বলল। 'স্টিভের কথাই ধরো। অসাবধান ছিল না?'

'হয়তো ছিল। কিন্তু আমার এখনও ধারণা, ওটা দুর্ঘটনা নয়। কোনমতেই বিশ্বাস করতে পারছি না গলার চেন হুইলে জড়িয়ে মারা গেছে স্টিভের মত অভিজ্ঞ একজন পটার।'

'তুমি তো এবারকার কথা বলছ,' রহস্যময় কণ্ঠে বলল টনি, 'আমি বলছি

গতবারের কথা। গত গ্রীষ্মের।'

'কি হয়েছিল গত গ্রীষ্মে?'

'ক্যানু ট্রিপে অসাবধান থেকেছিল স্টিভ। এবারকার মতই একটা ওয়াইল্ডারনেস ট্রিপে এসেছিল ওরা। ছয়জন কাউন্সেলর ছিল, আর পনেরোজন ক্যাম্পার, এবারের মত। ফেরার সময় কাউন্সেলররা ছয়জনই ফিরে গিয়েছিল, কিন্তু ক্যাম্পার একজন কম–স্টিভের দোষে। ও অসাবধান ছিল বলেই একজন ক্যাম্পার ফিরে যেতে পারেনি।'

'গত গ্রীষ্মের দুর্ঘটনাটার কথা বলছ নাকি তুমি?'

'দুর্ঘটনা ছিল না ওটা। দুর্ঘটনা ঘটে বাই চান্স। তাতে কারও দোষ থাকে না। কিন্তু কেউ যদি অসাবধান থেকে কোন দুর্ঘটনা ঘটায়, আর তাতে কারও মৃত্যু ঘটে, সেটাকে খুন বলতেই হবে। স্টিভ অসাবধান ছিল বলেই খুন হয়েছিল ক্যাম্পার বেচারা।'

অস্বস্তিবোধটা বাড়ছে রবিনের। টনির কণ্ঠস্বর ক্রমেই বদলে যাচ্ছে। অদ্ভুত, অদ্ভুত, এখন লাগছে রোবটের মত।

'খুন হয়েছে জানতাম না,' রবিন বলল। 'আমি কেবল শুনেছি, অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে কোন একজন ক্যাম্পার।'

'এমন করে বলছ যেন ও একজন সাধারণ ক্যাম্পার ছিল!' ধমকে উঠল টনি। 'ও ছিল অসাধারণ। সত্যি অসাধারণ। ওর নাম রনি।'

'স্টিভের অসাবধানতার জন্যে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছিল, তুমি জানলে কি করে?'

'খোঁজখবর করে।'

'কিন্তু তোমার এত আগ্রহ কেন?'

'বাহ্, থাকবে না!' রেগে উঠল টনি। 'ভাইয়ের জন্যে থাকবে না! রনি, আমার ভাই!'

অন্ধকারে একটা গোলকধাঁধার মধ্যে পড়ে গেছে যেন রবিন। কি সব খাপছাড়া আবল-তাবল বকছে টনি! আগে যখন জিজ্ঞেস করেছিল, তখন বলেছিল ওর কোন ভাই-বোন নেই, বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান।

'গতবার আমার ভাইকে ক্যাম্পে প্রতিদিন চিঠি লিখেছি আমি,' টনি বলল। 'এখনও লিখে যাচ্ছি। যত কাজই থাকুক আমার, মন-মেজাজ যে রকমই থাকুক, চিঠি লেখা বাদ দিই না।' থামল সে। আবার যখন কথা বলল, কণ্ঠস্বর বিষণ্ণতায় ভরা, 'কিন্তু এখন আর আমার চিঠির জবাব দেয় না সে। বহুদিন থেকে বন্ধ।'

রনিই সেই হতভাগ্য ক্যাম্পার, বুঝতে পারল রবিন–গত গ্রীষ্মে গোল্ডেন ড্রীমে এসে নৌকা দুর্ঘটনায় মারা গেছে যে।

'ওকে তোমারও পছন্দ হত,' টনি বলল। 'এত ভাল স্বভাবের ছিল আমার ভাইটা। তোমার দুর্ভাগ্য, ওর সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি।'

'কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টে যে মারা গেছে তার নাম তো রনি ছিল না, ছিল শেফ।'

'রনি নামটা ওর পছন্দ ছিল না,' কর্কশ হয়ে উঠল টনির কণ্ঠ। 'সেজন্যে আমি তাকে ডাকতাম শেফ।' পকেট থেকে কি যেন বের করল টনি। হাত মেলে দেখাল রবিনকে। 'এই যে তার মনোগ্রাম।'

একটা লাল পালক!

ছাব্বিশ

রবিনের মনে হতে লাগল, বরফের মত শীতল কয়েকটা আঙুল চেপে ধরেছে ওর হৃৎপিণ্ডটা।

বুঝতে শুরু করেছে। খুব ভালমতই বুঝতে শুরু করেছে এখন।

'আমার চেয়ে তিন বছরের ছোট ছিল সে,' টনি বলল। 'ধরতে গেলে আমার কোলে বড় হয়েছে। বন্ধু ছিলাম আমরা। বলতে পারো, ও ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। গত গ্রীষ্মে ক্যাম্পিঙে এল। খুব খুশি হয়েছিলাম আমি। তখন কি আর জানতাম কোনদিন ফিরবে না সে। মারা যাবে! এখানে, এই শয়তান নদীটাতে! তাহলে কি আর আসতে দিই!'

'বেচারা!' সহানুভূতির সঙ্গে ভয় মিশে গেছে রবিনের কণ্ঠে।

'শুধু স্টিভের জন্যেই ঘটেছিল ঘটনাটা, ওর অসাবধানতার জন্যে। তার খেসারতও দিয়েছে। অসাবধানতার খেসারত।'

ভয় পাচ্ছে রবিন। স্টিভকে খুন করেছে টনি। আর সেই খুনীটার সঙ্গে একটা ছোট্ট ক্যানুতে আটকা পড়েছে সে!

'ঠিক হয়েছে,' রবিনের মনের কথা পড়তে পেরে যেন বলল টনি। 'স্টিভকে খেসারত দিতে বাধ্য করেছি আমি। অন্য অঘটনগুলোও আমিই ঘটিয়েছি। গোল্ডেন ড্রীম একটা জঘন্য ক্যাম্প, অশুভ জায়গা। ওটাকে চলতে দেয়া যায় না।'

'তোমার কেমন লাগছে, বুঝতে পারছি, টনি,' যতটা সম্ভব শান্ত থাকার চেষ্টা করছে রবিন। 'আমার ভাই এ ভাবে মারা গেলে আমারও লাগত।'

'না, লাগত না। আমার মত আর কারোরই লাগত না।'

'কি জানি, হয়তো তোমার কথাই ঠিক,' টনিকে শান্ত রাখার জন্যে তার মতে মতেই কথা বলল রবিন। খেপিয়ে দিলে কি করে বসে কে জানে! কোন খুনীরই মাথার ঠিক থাকে না, থাকলে খুন করতে পারত না।

দাঁড় বাওয়া থামিয়ে দিল আবার টনি। প্রচণ্ড স্রোতে তীব্র গতিতে ভেসে চলল ক্যানু। সামনে পানির গর্জন শুনেই বোঝা যাচ্ছে কাছে এসে গেছে প্রপাতটা।

'তোমার ভাইয়ের জন্যে সত্যি খারাপ লাগছে আমার, টনি,' কথা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে বলল রবিন। ওর ধারণা, যতক্ষণ কথা বলবে ততক্ষণ কিছু ঘটাবে না টনি। 'আমারই যে রকম লাগছে; তুমি ভাই, তোমার লাগাটা তো

স্বাভাবিক। কিন্তু একজনের গাফিলতির সাজা অন্যেরা পাবে কেন, বলো?'

'যারা দোষী, তারা সবাই পাবে!' কঠিন কণ্ঠে টনি বলল, 'স্টিভ একা দোষ করেনি। গোল্ডেন ড্রীম না থাকলে শেফ এখনও বেঁচে থাকত। সুতরাং ক্যাম্প আর এর সঙ্গে জড়িত সবাইকেই সাজা পেতে হবে। সহজ কথাটা বুঝতে পারছ না?'

'পারছি। টনি, সব বুঝতে পারছি আমি।'

সন্দেহ দেখা দিল টনির চোখে। বিকৃত করে ফেলল মুখটা। সুদর্শন চেহারাটা সুদর্শন রইল না আর।

'ইয়ার্কি মারছ নাকি আমার সাথে!' গর্জে উঠল টনি। 'লাভ হবে না। তোমাকে আমার অন্য রকম মনে হয়েছিল, রবিন। প্রথম যখন ক্যাম্পে দেখলাম, আর সবার চেয়ে আলাদা ভেবেছিলাম। তোমাকে পছন্দ করেছিলাম। ভেবেছিলাম, তোমাকে বিশ্বাস করা যায়।'

'বিশ্বাস এখনও করতে পারো, টনি। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।'

'নাহ্, এখন আর ওসব বলে লাভ হবে না,' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল টনি। 'প্রথমে তোমার কোন ক্ষতি করতে চাইনি। আঙ্কেল জেডের ভাগ্নে জেনেও না। ভয় দেখিয়ে তোমাকে সরাতে চেয়েছিলাম—বালিশের নিচে সাপ রেখে দিয়ে।'

'তুমি করেছ এই কাজ!'

'তোমার ভালর জন্যেই করেছিলাম। চেয়েছিলাম, ভয় পেয়ে তুমি ক্যাম্প থেকে চলে যাও। চাইনি তোমার খারাপ কিছু ঘটুক। কিন্তু কোনমতেই তুমি যেতে চাইলে না। বরং ছোঁকছোঁক শুরু করে দিলে। যেখানে সেখানে নাক গলানো শুরু করলে।'

'কি ঘটছে জানতাম না আমি,' রবিন বলল। 'আঙ্কেল জেডকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম।'

'শেফের মৃত্যুর জন্যে স্টিভ যতখানি দায়ী, আঙ্কেল জেডও ঠিক ততখানিই দায়ী।'

'কিন্তু আমি তো এর মধ্যে নেই। গত গ্রীষ্মে আমি আসিইনি এখানে।'

'ঠিক। সেজন্যেই তোমাকে সরাতে চেয়েছি। কিন্তু এখন দেরি হয়ে গেছে। আর কিছু করার নেই। অনেক বেশি জেনে ফেলেছ তুমি। তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি না আর।'

হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়ে গেল রবিনের। মনে হতে লাগল বুকের খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে যাবে। সাংঘাতিক পরিস্থিতি! তীব্রস্রোতা নদীতে, ছোট্ট এক ক্যানুতে, ভয়ঙ্কর খুনীর সঙ্গে আটকে পড়েছে।

একটা বাঁক পেরিয়ে এল ক্যানু। ঠিক সামনেই রয়েছে প্রপাতটা। ভয়াবহ গর্জন।

'বাও!' চেঁচিয়ে আদেশ দিল রবিনকে টনি।

প্রতিবাদ করার সাহস হলো না। গলুইয়ের দিকে ঘুরে বসে দাঁড় বাইতে

শুরু করল। নদীর ডান দিকের শাখাটার দিকে নৌকার নাক ঘুরিয়ে দিল টনি। সবচেয়ে স্রোত বেশি ওটাতে। সাদা হয়ে গেছে পানি।

পানির গর্জন এত বেশি, আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না রবিন। ঠাণ্ডা পানি ফোয়ারার মত ছিটকে এসে ক্রমাগত গায়ে লাগছে, ভিজিয়ে দিচ্ছে মুখ, গলা, শার্টের বুক। নৌকা সামলাতে এতই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল, ভুলেই গেল যেন কোথায় রয়েছে, কার সঙ্গে।

পাথরে প্রচণ্ড ধাক্কা খেল নৌকার তলা। চিৎকার করে উঠল রবিন। ঘুরে গেল নৌকার সামনের দিকটা। ঘুরে গেল পুরো একপাক। আবার সোজা হয়ে দুলতে দুলতে ছুটে চলল সাদা পানির দিকে।

সাদা জায়গাটাতে পৌছেই দুলুনি বেড়ে গেল। সেই সঙ্গে যুক্ত হলো ঝাঁকুনি। পানি যেন লোফালুফি শুরু করল ছোট নৌকাটাকে নিয়ে। ভীষণ জোরে জোরে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিচ্ছে। রবিনের মনে হচ্ছে উড়ে গিয়ে পড়বে পানিতে।

'টনি!' চিৎকার করে উঠল সে। ফিরে তাকাল। 'টনি! কিছু একটা করো! এই স্রোতে নৌকা বাওয়ার সাধ্য আমার নেই। কিছু করো, নইলে দুজনেই মরব আজ!'

জবাবে হাসতে শুরু করল টনি।

হাতের দাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে দিল ফেনায়িত, সাদা পানিতে।

সাতাশ

'এ কি করলে!' চিৎকার করে উঠল রবিন। পানির গর্জনে চাপা পড়ে গেল তার কথা।

হেসেই চলেছে টনি।

ফেনা দেখে মনে হচ্ছে টগবগ করে ফুটছে পানি। মুহূর্তে হারিয়ে গেল দাঁড়টা। আতঙ্কিত হয়ে সেই পানির দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। তার নিজের দাঁড়টা দিয়ে বাওয়ার চেষ্টা করল, সোজা করতে চাইল নৌকাটাকে, কিন্তু এত শক্তিশালী স্রোতের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারল না।

উঠে দাঁড়াল টনি। একদিকে কাত হয়ে গেল নৌকাটা। আরেকটু কাত হলে উল্টে যাবে।

বুকের মধ্যে পাগলের মত দাপাদাপি করছে যেন রবিনের হৃৎপিণ্ড। তাকিয়ে রয়েছে টনির দিকে। চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টি আশা করছে।

কিন্তু টনির চোখে উন্মাদের শূন্য চাহনি। আপনমনে কি যেন বলতে লাগল, চিৎকার করে করে। প্রথমে বুঝতে পারল না রবিন। ভালমত কান পাততে বুঝল। টনি বলছে, 'রবিন, এরপর তোমার পালা!'

টনি ওকে খুন করতে চাইছে!

'না না!' চিৎকার দিয়ে নৌকার কোণে কুঁকড়ে গেল রবিন।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে টনি।

'যাবার সময় হয়েছে তোমার, রবিন!' চিৎকার করে উঠল সে, 'বাধা দিয়ে লাভ নেই। আমার সঙ্গে পারবে না তুমি।'

রবিনকে লক্ষ্য করে লাফ দিল সে। ভীষণভাবে দুলে উঠল নৌকাটা। কাত হয়ে গেল। আর দু'এক ইঞ্চি কাত হলেই পানি উঠতে শুরু করবে।

নদীতে পড়া থেকে বাঁচার জন্যে নৌকার কিনার আঁকড়ে ধরল রবিন। নৌকাটা আবার সোজা হতেই কিনার ছেড়ে দিল। মরিয়া হয়ে দাঁড় তুলে বাড়ি মারল। ঝট করে মাথা সরিয়ে ফেলল টনি। আবার ধরার চেষ্টা করল রবিনকে।

উঠে দাঁড়াল রবিন। ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে শরীরটাকে বাঁকা করে রেখেছে। বাড়ি মারল আবার।

এড়াতে পারল না আর টনি। মাথায় লাগল বাড়ি।

একটা মুহূর্তের জন্যে হাঁ হয়ে গেল টনির মুখটা। চিৎকার বেরোল কিনা পানির গর্জনে শোনা গেল না। পড়ে গেল নৌকার পাটাতনে।

এতটাই হতবাক হয়ে গেছে রবিন, কি করবে এখন সেটাও যেন ঠিক করতে পারছে না। দাঁড় দিয়ে খোঁচা মারল টনির গায়ে। নড়ল না টনি।

মেরে ফেলল নাকি?

দিশেহারা হয়ে পড়ল রবিন। অসুস্থ বোধ করছে। সামলাল নিজেকে। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। মনকে বোঝাল, প্রথম কাজ এখন নৌকাটাকে নদীপ্রপাত থেকে বের করে আনা। তারপর ভাববে কি করে ক্যাম্পে ফেরা যায়।

স্রোতের গতি বেড়েই চলেছে। সাবধানে আগের জায়গায় বসে পড়ল সে। পাথরে বাড়ি খেল নৌকা। একবার। দু'বার…

নিজের অজান্তেই চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে।

টের পেল, উড়ে চলে যাচ্ছে। ঝপাং করে পড়ল পানিতে। নাকেমুখে পানি ঢুকে গেল। দম আটকে যাচ্ছে। মরিয়া হয়ে থাবা মারতে লাগল নৌকাটাকে ধরার জন্যে। ধরল, কিন্তু ধরে রাখতে পারল না। নখ ভেঙে রক্ত বেরিয়ে এল। তীব্র স্রোত সরিয়ে নিল নৌকাটাকে।

ঘূর্ণায়মান স্রোতের মধ্যে ভেসে থাকাই কঠিন। কোনমতে মাথা উঁচু করে দেখল ভাটির দিকে চলে যাচ্ছে নৌকা।

চারপাশে তাকাল সে। চোখে পড়ল শুধু সাদা ফেনা। নদীর পাড়টাকে মনে হচ্ছে বহুদূরে; এত বেশি, কোনদিন ওখানে পৌঁছাতে পারবে না।

মনের মধ্যে তরল আতঙ্ক যেন চুঁইয়ে ঢুকতে শুরু করল।

শান্ত হও, আদেশ দিল মনকে। অত চিন্তা নেই তোমার। সাঁতার জানো। এই তো ভেসে রয়েছ, ডুবছ না। তাহলে ভাবনা কি? মাথাটাকে ভাসিয়ে রেখে তীরের দিকে এগোনো শুরু করো।

ভারী দম নিয়ে সাঁতার কাটতে শুরু করল সে। সে এগোতে চায়, স্রোত

তাকে টেনে নিয়ে আসতে চায় নদীর মাঝখানে। কোনমতেই দূরত্ব আর অতিক্রম করতে পারছে না।

শান্ত থাকো–বার বার একই কথা বলতে লাগল নিজেকে। সেই সঙ্গে তীরে পৌঁছানোর চেষ্টা চালিয়ে গেল। সরাসরি স্রোতের বিরুদ্ধে না গিয়ে কোনাকুনি এগোল।

শ্বাস টানতে গেলে মুখে পানি ঢুকে যায়। হাঁসফাঁস করতে করতে সাঁতরে চলল সে। অগ্রগতি খুবই সামান্য। তিন ফুট এগোলে দুই ফুট পিছায়।

নদীর মাঝখানে স্রোতের তীব্রতা যতটা, কিনারে ততটা নয়, কম। ধীরে ধীরে সেই কম স্রোতের মধ্যে ঢুকে পড়ল সে।

আরও কিছুটা এগিয়ে সাঁতরানো বন্ধ করল, দম নেয়ার জন্যে।

উজানের দিকে চোখ পড়তেই মোচড় মারল পেটের মধ্যে।

উপড়ে পড়া বিশাল একটা গাছ ফেনায়মান পানিতে লুকোচুরি খেলতে খেলতে ছুটে আসছে তার দিকে।

আটাশ

আবার চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। হাঁ করা মুখে পানি ঢুকে দম আটকে দিতে চাইল।

মাত্র দুই ফুট দূরে আছে আর গাছটা।

ভাবার সময় নেই, যা করার করে ফেলতে হবে।

বুক ভরে দম নিয়ে ডুব মারল। যতটা নিচে নামা সম্ভব নেমে গেল।

বুকের মধ্যে যেন আগুন ধরে গেছে। ফেটে যাবে ফুসফুস।

না, ওঠা চলবে না–বোঝাল নিজেকে। গাছটা নিশ্চয় পেরোয়নি এখনও। সহ্য করতে হবে।

চোখের সামনে কোটি কোটি তারা নাচছে।

গাছের ডালের ঘষা লাগল গায়ে। সরে গেল ওটা।

ভেসে উঠল সে। আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে গেছে মাথা। ভয় লাগছে না আর। মাথায় একটা ভাবনাই ঘুরপাক খাচ্ছে–বাঁচতে হবে এখন, বাঁচতে হবে তাকে। তাকিয়ে দেখল, ভাটির দিকে চলে যাচ্ছে গাছটা।

গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে সাঁতরাতে শুরু করল আবার সে। হাত লম্বা করে থাবা মারছে পানিতে, পা দিয়ে লাথি।

দেহের প্রতিটি পেশীতে ব্যথা শুরু হয়েছে। কিন্তু দমল না। এগিয়েই চলল। কল্পনাই করতে পারেনি এতটা শক্তি রয়েছে তার শরীরে, এত ক্ষমতা।

শেষে, যখন মনে হলো আর একটিবারের জন্যেও হাত বাড়াতে পারবে না, সাঁতারের ক্ষমতা শেষ, ঠিক তখনই পায়ে ঠেকল পাথুরে তলা। কাঁপতে কাঁপতে হেঁটে চলল ডাঙায় ওঠার জন্যে।

একটা গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে বসে পড়ল। এক বিন্দু শক্তি নেই আর শরীরে। হাঁপাচ্ছে। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে।

কিছুটা সুস্থির হতেই চালু হয়ে গেল ভাবনা। সত্যি কি ঘটছে এ সব? নাকি দুঃস্বপ্ন?

টনি! ভদ্র, শান্ত টনি ওকে নিয়ে এসেছিল নদীর সৌন্দর্য দেখাতে।

ভাইয়ের মৃত্যুতে প্রচণ্ড শক পেয়েছে ও। সহ্য করতে পারেনি। পাগল হয়ে গেছে। ওর চাহনি, মুখের ভঙ্গি, কথা বলার ধরনই বুঝিয়ে দিয়েছে ওর মাথার ঠিক নেই। স্টিভকে খুন করার কথা কি রকম হাসিমুখে বলল!

কোথায় এখন টনি? ক্যানুতেই রয়েছে? বাড়ি খেয়ে আর নড়েনি। মরার মত পড়ে ছিল ক্যানুর তলায়। ক্যানুটা চলে গেছে প্রপাতের তীব্রতম স্রোতের দিকে। কতদূর গিয়ে শেষ হয়েছে প্রপাতটা, জানে না রবিন। মারা গিয়ে থাকলে টনির লাশ ভেসে উঠবে নদীর কয়েক মাইল ভাটিতে।

ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তার। মানুষ খুন করেছে! ভাবতে চাইল না আর। একটা কাজই করার আছে এখন, যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি ক্যাম্পে ফিরে যাওয়া এবং সাহায্য নিয়ে ফিরে আসা। বেঁচে থাকলে টনিকে উদ্ধার করতে হবে।

কিন্তু যাবে কি করে? বহুদূরে রয়েছে ক্যাম্প।

যেতে হবে বনের মধ্যে দিয়ে। একা।

বসে থাকাটাও কষ্টকর হয়ে উঠছে। কনকনে ঠাণ্ডা পানিতে ভিজেছে, শীত লাগছে এখন, বরফের মত জমে যেতে চাইছে শরীর। দমকা বাতাসে পাতায় শিহরণ তোলার মত কাঁপুনি বয়ে গেল দেহের পরতে পরতে। বাঁচতে চাইলে হাঁটতে হবে। গা গরম করতে হবে।

সবে সকাল হয়েছে। হাতে পুরো দিনটাই বাকি। পারব আমি–ভরসা জোগাল মনকে–পারতেই হবে। ক্যাম্পে যদি পৌঁছতে পারে কোনমতে, কি ঘটেছে বলতে পারে, ল্যানি, ডবি এমনকি টেরিও শত্রুতা ভুলে গিয়ে ওকে সাহায্য করবে। ছুটে আসবে এখানে।

বনের মধ্যে জন্তু-জানোয়ার চলার পথ নিশ্চয় আছে। তবে সে-পথে যাওয়া উচিত হবে না। বুনো হিংস্র জানোয়ারের সামনে পড়ে যাওয়ার ভয় তো আছেই, পথ হারানোর সম্ভাবনাও ষোলো আনা। তারচেয়ে, সহজ উপায়টা হলো, নদীর পাড় ধরে ধরে যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে ফিরে যাওয়া।

হাঁটতে শুরু করল সে। যতটা সহজ ভেবেছিল, তত সহজ হলো না চলা। জুতোর মধ্যে কাদাপানি ঢুকে গিয়ে ফচফচ করছে। আটকে দিচ্ছে গতি। নদীর কিনারে গাছপালা খুব ঘন। এগুলোর ভেতর দিয়ে এগোনোটা হচ্ছে আরেক মুশকিল।

সামনে খচমচ শব্দ হতেই চমকে উঠে থেমে গেল সে। বড় কোন জানোয়ার এগিয়ে চলেছে নদীর দিকে।

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা হরিণী। পেছনে তার বাচ্চা। খুদে সরু সরু পায়ে তিড়িং-বিড়িং করতে করতে চলেছে।

হেসে ফেলল রবিন। আটকে রাখা নিঃশ্বাসটা বেরিয়ে গেল। কোথায় যেন কাঁপা গলায় ডেকে উঠল একটা মকিংবার্ড। তারপর হঠাৎ করেই ডাকাডাকি, খসখস আর বনের স্বাভাবিক যত শব্দ শুরু হয়ে গেল। জীবজন্তু আর পাখিরা মিলে জ্যান্ত করে তুলল বনটা। আসলে, শব্দগুলো আগেও ছিল। ও এতক্ষণ বনের বাইরে ছিল বলেই তেমন করে শুনতে পায়নি। ভেতরে ঢোকায় কানে আসছে।

মনের ভার কেটে গেল অনেকখানি। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। সামনে একপাশে মাথা তুলছে একটা ছোট পাহাড়। নদীর কিনারের রাস্তাটাকে চেপে সরু করে দিয়েছে। খুবই সুন্দর জায়গা। সবুজে সবুজে ভরা। স্রোতের জোরাল গর্জনের মধ্যেও এক ধরনের ছন্দ আছে। একনাগাড়ে বেশিক্ষণ কান পেতে শুনলে কেমন ঘোর লেগে যায়।

ক্রমেই হাঁটার গতি বাড়ছে ওর। ভাবনাগুলো আর জাঁকিয়ে বসতে পারছে না মাথায়।

আবার খড়মড় শব্দ শোনা গেল। এবার পেছনে। তাকালেই হয়তো আবার একটা হরিণ দেখতে পাবে।

কিন্তু খচমচটা থপ থপ-এ রূপ নিল। স্পষ্ট হলো। দুপদাপ। ছুটন্ত পদশব্দ।

ফিরে তাকাল রবিন।

স্থির হয়ে গেল।

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একজন মানুষ।

টনি!

ঊনত্রিশ

বোবা হয়ে তাকিয়ে আছে রবিন। চিৎকার করার কথাও যেন ভুলে গেছে।

দাঁড়িয়ে আছে টনি। মুখে মৃদু হাসি।

'কি হলো, রবিন? ভূত দেখেছ মনে হচ্ছে?'

'কিন্তু তুমি...তুমি তো ক্যানুতে...' কথা আটকে যাচ্ছে রবিনের। 'আমি ভেবেছি তুমি...'

'মরে গেছি, তাই তো? ভূত হয়ে উঠে এসেছি তোমাকে তাড়িয়ে বেড়ানোর জন্যে?'

চুপ করে আছে রবিন। তাকিয়ে আছে টনির দিকে।

'আমি ভূত নই, বেঁচেই আছি,' টনি বলল। মাথায় আঙুল ডলল, দাঁড়ের বাড়ি খেয়েছিল যেখানে। 'তোমার জন্যে মোটেও সুখবর নয়। আমি ভূত হয়ে গেলেই হয়তো ভাল হত। তুমি আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছ, রবিন।'

'না!' প্রতিবাদ করল রবিন। 'আমি তোমাকে খুন করতে চাইনি!'

এক পা পিছিয়ে গেল সে।

'তোমার কথা বিশ্বাস করলাম আমি, রবিন,' টনি বলল। 'তুমি আসলেই ভাল ছেলে। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে দেয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি।'

'তুমি ফিরে এলে কি করে?' গলার কাঁপুনি চেপে রাখার চেষ্টা করল রবিন।

'তোমার বাড়িটা তেমন জোরে লাগেনি, কয়েক মিনিটের জন্যে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলাম। তোমার দাঁড়টা দিয়ে ক্যানুটাকে নদীর কিনারে নিয়ে গেলাম, যেখানে স্রোত নেই, তারপর উল্টোদিকে বাইতে শুরু করলাম। তোমার কি হয়েছে দেখার জন্যে।'

বলার মত কিছু খুঁজে পেল না রবিন। এক পা পিছিয়ে এল।

এক পা এগিয়ে এল টনি।

'তুমি যা যা করেছ, সবই দেখেছি আমি,' টনি বলল। 'স্রোতের সঙ্গে লড়াই করেছ। ভেবেছি, ডুবে মরবে, তোমাকে নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না আমাকে।'

চুপ করে আছে রবিন।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ছে টনি। ঠোঁটে মৃদু হাসি। 'কিন্তু তুমি মরলে না। ঠিকই বেঁচে ডাঙায় উঠে গেলে। তবে শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পারবে না। ক্যাম্পে গিয়ে সবাইকে বলব, আরেকটা নৌকা দুর্ঘটনা ঘটেছে। আরেকটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, গত বছরের মত।'

চুপ করে আছে রবিন।

'সবাই বিশ্বাস করবে আমার কথা,' টনি বলল। 'তারপর জানাজানি হয়ে যাবে খবরটা। কেউ আর গোল্ডেন ড্রীমের ছায়া মাড়াবে না। ক্যাম্প শেষ, আমারও কাজ শেষ।'

চুপ করে আছে রবিন।

আরেক পা এগোল টনি। নিচু হয়ে একটা মোটা শুকনো ডাল তুলে নিল।

চুপ করে আছে রবিন। সম্মোহিতের মত তাকিয়ে দেখছে, ডালটা তুলল টনি। বাড়ি মারার ভঙ্গিতে পেছন দিকে নিয়ে গেল। এগিয়ে আসতে শুরু করল।

নড়ে উঠল রবিন। আচমকা লাফিয়ে উঠে দৌড় মারল।

ডাল হাতে পেছনে ছুটল টনি।

ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ কানে আসছে রবিনের। একটাই লক্ষ্য, ঘন বনে ঢুকে যাওয়া। গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে পড়া। পায়ের নিচে পাথর পড়ছে। শেকড়ে বাধছে। কোন কিছুকেই পরোয়া করল না সে। বনে ঢুকেও ছুটতে থাকল। গালে, মুখে বাড়ি মারছে গাছের নিচু ডাল, গায়ে লেগে হুস হুস করে সরে যাচ্ছে। কোন কিছুই থামাতে পারল না ওকে।

দৌড়! দৌড়! দৌড়! পেছনে দুপদাপ করে ছুটে আসা পায়ের শব্দকে কানেই তুলল না।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল একবার। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে পড়ল। টনির হাসির শব্দ শুনল মনে হলো।

হাঁপাচ্ছে। পরিশ্রমে ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরোতে শুরু করেছে গলার ভেতর থেকে। বুঝতে পারছে, আর বেশিক্ষণ এ ভাবে ছুটতে পারবে না। পাহাড়টার দিকে তাকাল। খাড়া ঢাল। গাছপালা নেই। ওটা বেয়ে যদি ওপাশে চলে যেতে পারে···

কিন্তু ভোরের শিশিরে পিচ্ছিল হয়ে আছে পাথরগুলো। ওগুলো বেয়েই উঠতে শুরু করল। পাহাড়ে চড়ার ওস্তাদ সে। প্রাণ বাঁচাতে কাজে লাগল এখন ওস্তাদীটা। অর্ধেক উঠেই শুনতে পেল টনির হাসি। ঠিক পেছনে। সে-ও কম নয়। কোন ফাঁকে কাছে চলে এসেছে।

বাঁ পায়ে বাড়ি পড়ল রবিনের। ভালমত লাগলে হাড় ভেঙে যেত। তীক্ষ্ণ ব্যথা যেন তরল কোন জিনিসের মত উঠে আসতে লাগল পা বেয়ে ওপরের দিকে।

অসাড় হয়ে গেল হাঁটুর নিচেটা।

থামল না রবিন। দুই হাতে পাথর খামচে ধরে উঠে যেতে থাকল। কিছুদূর উঠে ফিরে তাকিয়ে দেখল, ডাল হাতে উঠে আসছে টনিও। তবে পেছনে পড়ে গেছে।

মরিয়া হয়ে ওপরের দিকে তাকাল রবিন। কয়েক ফুট ওপরে একটা গুহামুখ দেখা যাচ্ছে। ওটাতে ঢুকে পড়তে পারলে টনির সঙ্গে একটা ফাইট দিতে পারবে। গর্তে থাকলে খোলা ঢালে থাকা টনির চেয়ে শক্তি বেশি পাবে সে। ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দিতে পারবে।

শরীরের শেষ শক্তিটুকু একত্রিত করে উঠে চলল সে। গুহার কাছাকাছি এসে হাত বাড়িয়ে দিল ওপরে। ধরে ফেলল কিনারটা। টেনে তুলল নিজেকে। শরীর মুচড়ে মুচড়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

কিন্তু পুরো শরীর ঢোকানোর আগেই থেমে যেতে হলো।

সামনে ফোঁস-ফোঁস করছে অনেকগুলো সাপ। কোনটা কুণ্ডলী পাকিয়ে রেখেছে; কিছু আছে জড়াজড়ি করছে একটা আরেকটার সঙ্গে, জট পাকিয়ে রেখেছে।

গুহার মধ্যে সাপের বাসা।

ত্রিশ

ওকে দেখেই পাক খুলতে শুরু করল কুণ্ডলী পাকানো সাপগুলো। ফোঁসফোঁসানি বেড়ে গেল।

আতঙ্কিত, স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে রবিন।

নিচে টনির উঠে আসার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

সাপগুলো না থাকলেও গুহাটাতে পুরো ঢুকতে পারত না সে, জায়গা হত না। যে প্ল্যান করেছিল, সেটা সম্ভব হত না। একটা মুহূর্তের জন্যে হাল ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবল রবিন। ভাবল, যা হয় হোক। মরলে মরবে। আর কিছু করতে পারবে না।

না! পরক্ষণেই তাগিদ এল ভেতর থেকে। না! হাল ছেড়ো না। মনের ধোঁয়াটে হয়ে আসা অংশটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ঠেলে সরিয়ে দিল আতঙ্ক। একটা সুযোগ এখনও আছে। মাত্র একটা। যদি করতে পারো।

কিন্তু পারবে তো? এগিয়ে আসতে শুরু করেছে দু'তিনটে সাপ। ফোঁস-ফোঁস করছে। চেরা জিভগুলো লকলক করে বেরোচ্ছে আর ঢুকছে।

ওর গোড়ালি চেপে ধরল কঠিন কয়েকটা আঙুল। বাড়ি লাগা পা'টাতে। তীক্ষ্ণ ব্যথা ছড়িয়ে গেল আবার সারা পায়ে।

করো! করে ফেলো রবিন! নিজেকে আদেশ দিল সে।

হাত বাড়িয়ে দিল। দ্বিধা করল না আর। সামনের সাপটাকে খপ করে ধরেই ফিরল, ছুঁড়ে দিল টনির মুখে।

চমকে গেল টনি। চিৎকার করে উঠল।

ফসকে গেল পা।

এক হাতে ডাল। আরেক হাত দিয়ে পিচ্ছিল পাথর আঁকড়ে থাকতে পারল না। পড়তে শুরু করল। পতন ঠেকানোর চেষ্টায় হাত-পা নাড়াচ্ছে অনবরত।

সোজা নিচে গিয়ে পড়ল। গড়াতে লাগল ঢালু উপত্যকায়। একেবারে গোড়ায় গিয়ে ঠেকল তার দেহটা। নিসাড় পড়ে রইল। নড়ছে না আর।

থরথর করে কাঁপছে রবিন। গর্ত থেকে মুখ বের করে তাকিয়ে আছে নিচের দিকে। আবার কি কোন চালাকি করছে টনি?

মনে হয় না!

মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাসে। একটা হাত বেকায়দা ভঙ্গিতে বেঁকে গিয়ে চাপা পড়েছে দেহের নিচে।

ওপারে যাওয়ার আর দরকার নেই। নামতে শুরু করল রবিন। বাঁ পা'টায় শক্তি পাচ্ছে না। চাপ পড়লেই ব্যথা করে ওঠে।

নিচে নেমে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে, সাবধানে এসে দাঁড়াল টনির কাছে। বুকের ওঠানামা দেখে বুঝতে পারল, বেঁচে আছে। কপাল কেটে রক্ত পড়ছে।

কতক্ষণ একভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল রবিন, বলতে পারবে না। হঠাৎ করেই যেন সংবিৎ ফিরে পেল। মনে পড়ল, ক্যাম্পে ফিরে যেতে হবে তাকে। সাহায্য নিয়ে আসতে হবে। সারা গা কাঁপছে। খুব ঠাণ্ডা লাগছে।

অত দূরে আর নেই ক্যাম্পটা। যেতে পারলে ফিরে আসারও যথেষ্ট সময় পাবে।

দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল সে। ফিরে এল নদীর পাড়ে।

আবার থমকে দাঁড়িয়ে চোখ বড় বড় করে দেখল, গাছের ডাল ফাঁক হয়ে যাচ্ছে।

সামনে এসে দাঁড়াল রোজার। মলির সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারটা জেনে

যাওয়ায় মুখ বন্ধ রাখার জন্যে নিশ্চয় খুন করতে এসেছে।

নাহ্, আর কোন আশা নেই! হাল ছেড়ে দিল রবিন। টনির হাত থেকে বেঁচেছে। রোজারের হাত থেকে আর পারবে না। শক্তি, সামর্থ্য, কোনটাই নেই আর।

'রবিন! কি হয়েছে? কথা বলছ না কেন? রবিন?'

নিজের নামটা যেন বহুদূর থেকে কানে এসে বাজল। চমকের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যেতে ভাল করে তাকাল রোজারের দিকে।

রোজারের মুখেও তার মতই বিস্ময়ের চমক। তাকে খুন করতে আসেনি সে। কি ঘটেছে, জানেই না।

হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল রবিনের। দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না আর। দলা-মোচড়া হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

*

অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন সরে যাচ্ছে দূরে। টনিকে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। ক্যাম্প থেকে দূরে। গত সপ্তাহের সমস্ত আতঙ্ক থেকে দূরে।

খোয়া বিছানো রাস্তা ধরে চলে যাওয়া গাড়ির টেল লাইটের অপসৃয়মান লাল আলোটার দিকে তাকিয়ে গায়ে কাঁটা দিল রবিনের। বাসের মধ্যে কম্বল জড়িয়ে বসে আছে সে, রোজারের পাশে। ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢেলে, তাতে খানিকটা ব্র্যান্ডি মিশিয়ে রবিনের হাতে তুলে দিল রোজার। চুমুক দিল রবিন। আহ্, এ জিনিসটাই এ মুহূর্তে দরকার ছিল তার।

পাহাড়ের গোড়ায় দাঁড়িয়ে টনির অপকর্মের কথা রোজারকে সব বলেছিল সে। দুজনে মিলে অজ্ঞান টনির ভারী দেহটাকে কিছুটা বয়ে কিছুটা টেনে-হিঁচড়ে এনে তুলেছিল ক্যানুতে। এতটাই পরিশ্রান্ত তখন রবিন, বসে থাকতেও কষ্ট হচ্ছিল। তার পরেও দাঁড় তুলে নিয়েছিল। দুজনে মিলে নৌকাটাকে বেয়ে নিয়ে গিয়েছিল ক্যাম্পে। সেখান থেকে দলবল নিয়ে চলে এসেছে ঝরঝরে বাসটার যেখানে এসে ওদের জন্যে অপেক্ষা করার কথা, সেখানে। অ্যাম্বুলেন্সের জন্যে ফোন করেছে ওই জায়গা থেকেই।

কম্বলটা আরও ভাল করে গায়ে জড়াল সে। টেনেটুনে দিল। কোনমতেই শীত যাচ্ছে না।

'তোমার কি খারাপ লাগছে এখনও?' জিজ্ঞেস করল রোজার।

মাথা নাড়ল রবিন। গরম কফিতে চুমুক দিতে লাগল ঘন ঘন। গরম হয়ে আসছে শরীর। 'একটা কথা বুঝতে পারছি না,' অবশেষে গলা কাঁপা থেমেছে ওর, 'আমাদের খুঁজে পেলে কি করে তুমি?'

'ভোরবেলা তোমরা জাগার আগেই মলির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম,' নিচের দিকে চোখ নামাল রোজার। 'তোমাকে আর টনিকে নদীর দিকে যেতে দেখলাম। চোরের মন পুলিশ পুলিশ—আমি ভাবলাম, মলির সঙ্গে আমাকে দেখে ফেলেছে টনি; গোপনে তোমাকে বলার জন্যে ক্যাম্প থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে। তারপর যখন নৌকায় উঠলে, ভীষণ কৌতূহল হলো। এত ভোরে কোথায় যাচ্ছ, ভেবে অবাক লাগল। পিছু নিলাম।'

'তারমানে সারাটা পথ আমাদের পেছনেই ছিলে তুমি?'

'ঠিক পেছনে থাকতে পারিনি, অত ভাল নৌকা বাইতে পারি না আমি। তবে আন্দাজে অনুসরণ করছিলাম। অনেক পেছনে পড়ে গিয়েছিলাম। এক সময় হারিয়ে ফেললাম তোমাদের ক্যানুটাকে। ফিরে যাব ভাবছি, এই সময় তীরের কাছে বাঁধা দেখলাম ওটাকে। কাছে গেলাম। আমার নৌকাটাও বেঁধে রেখে তীরে নামলাম। বনে ঢুকেই পেয়ে গেলাম তোমাকে।'

'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, রোজার। পিছু নিয়ে খুব ভাল কাজ করেছিলে।'

*

গোল্ডেন ড্রীমে বাস থামতেই দৌড়ে এলেন আঙ্কেল জেড। খবর পেয়ে গেছেন। রবিন নামতেই তাকে জড়িয়ে ধরলেন। দশ বছর বয়েস যেন বেড়ে গেছে তাঁর।

'কেমন আছিস, প্রিন্স!' গলা কাঁপছে উদ্বেগে।

'আমি ভালই আছি,' রবিন বলল। 'টনির খবর কি?'

'হাসপাতালে, চিকিৎসা হচ্ছে,' বিষণ্ণ কণ্ঠে জানালেন আঙ্কেল জেড। 'কল্পনাই করতে পারিনি ও এ কাজ করবে! স্টিভকে কিভাবে খুন করেছে জানিস? গলার চেনটা দিয়ে, শ্বাসরুদ্ধ করে। গত বছর যে ছেলেটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছিল—শেফ, ও ছিল টনির ভাই, সৎভাই। বাবার নামে মেলে না। কি করে জানব ওরা দুজনে ভাই ছিল?'

'এতে তোমার কোন দোষ নেই,' সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে বলল রবিন। 'কারোরই নেই। অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাক্সিডেন্টই। কেউ তো আর ইচ্ছে করে ওকে ডুবিয়ে মারেনি। আর কি খবর? পুলিশ এসেছে?'

মাথা ঝাঁকালেন আঙ্কেল জেড। 'একটু আগে টনির ঘরে এক বান্ডিল চিঠি পেয়েছে পুলিশ। সব শেফকে সম্বোধন করে লেখা। তাতেই জানা গেছে শেফের আরেকটা ডাকনাম ছিল রনি।'

'লাল পালক কোথায় পেত টনি? জেনেছে পুলিশ?'

'ওর ঘরেই পেয়েছে। এত এত! বাক্সে ভরে বিছানার নিচে লুকিয়ে রেখেছিল। তোর ধারণাই ঠিক ছিল, আমিই ভুল করেছি।'

'সব তাহলে ভালয় ভালয়ই শেষ হলো,' শান্তকণ্ঠে বলল রবিন।

'হ্যাঁ, তবে আরও আগে তোর কথা বিশ্বাস করলে বেচারা স্টিভকে জীবন দিতে হত না...' একটা মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন আঙ্কেল জেড। 'যাকগে, যা হবার তো হয়ে গেছে। এখন আর ভেবে লাভ নেই।...মস্ত একটা ফাঁড়া কাটল গোল্ডেন ড্রীমের। এবার হয়তো পুরোদমে চালু করা যাবে।'

বিশ্রাম দরকার। তার আগে দরকার গোসল আর পোশাক পাল্টানো। নিজের কেবিনের দিকে রওনা হলো রবিন।

পা বাড়াতেই পেছন থেকে ডাক শোনা গেল, 'রবিন, রবিন, দাঁড়াও!'

ফিরে তাকাল রবিন। ল্যানি ছুটে আসছে। কাছে এসে ওর হাত জড়িয়ে ধরল। 'আমাকে মাপ করে দাও, ভাই। শুঁটকির কথা শুনে তোমাকে অনেক

জ্বালান জ্বালিয়েছি। ভুল বুঝিয়ে বুঝিয়ে তোমার ওপর আমাদের খেপিয়ে তুলেছিল সে। আমরা ওকে বয়কট করেছি এখন। সবাই মিলে আঙ্কেল জেডকে বলে ওকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করব...'

'না না, এ কাজ কোরো না। আঙ্কেল জেডের কাউন্সেলর দরকার...'

'যতই দরকার হোক, তাই বলে টনির মত খুনী আর শুঁটকির মত শয়তানকে থাকতে দেয়া যায় না। গত একটা হপ্তা ধরে কি ভোগানটাই না ভোগাল আমাদের। কাউন্সেলরের অভাব হবে না। অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে আমাদের, এখানে কাজ করতে পারলে বর্তে যাবে।...বলো, মাপ করেছ?'

হাসি ফুটল রবিনের মুখে। ধীরে ধীরে চওড়া হলো হাসিটা। হাত বাড়িয়ে দিল ল্যানির দিকে।

চেপে ধরল ল্যানি। জোরে এক ঝাঁকি দিল। 'আজ থেকে আমরা শপথ নেব, গোল্ডেন ড্রীমের কোন ক্ষতি কেউ করব না; এর যাতে সব রকম উন্নতি হয় সেদিকে খেয়াল রাখব; কেউ কাউকে শত্রু মনে করব না...'

'অতিরিক্ত ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছ তুমি, ল্যানি।'

'না, এটাই ঠিক...আজই সব কথা জানিয়ে মাকে চিঠি লিখে দেব।'

রবিনকে এগিয়ে দিয়ে আসতে চলল সে। হঠাৎ গাছের ওপর থেকে লাফ দিয়ে পড়ল একটা গরিলা। শরীরটা মানুষের। মুখটা গরিলার। গোঁ গোঁ করল। গোটা দুই ডিগবাজি খেল। সোজা হয়ে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'হেই রবিন, গরিলার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে?'

ডবির ভাঁড়ামি এখন খারাপ লাগল না রবিনের। হেসে হাতটা বাড়িয়ে দিল। বুঝতে পারছে, গোল্ডেন ড্রীমের আগামী দিনগুলো সোনালি স্বপ্নের মতই কাটবে।

***

ভলিউম ৩৬

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

হালো, কিশোর বন্ধুরা-
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে।

জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম
তিন গোয়েন্দা।
আমি বাঙালি। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্করের জঞ্জালের নিচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি-
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০